শতবার্ষিকী সংস্করণ

আচার্য্যের প্রার্থনা

চতুর্থ ভাগ

(৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮৩—১লা জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ)

ও পরিশিষ্ট

কমলকুটীর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, হিমাচল, আম্বালা, দিল্লী, কাণপুর, কলুটোলা, মঙ্গলবাড়ী, বিডন্ পার্ক, মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীমদ্‌-আচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"

৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডিসেম্বর, ১৯৪১

আচার্য্যের প্রার্থনা

নববিধানপ্রবক্তা প্রতাপচন্দ্রের নিবেদন

"Keshub's life-scenes presented a garden of real romance. Every morning they were blooming, fragrant, fresh; his *words*, his *works*, his *prayers*, all alike."

—*The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*
Preface to the first edition

"Keshub had a wonderful faith in the efficacy of prayer. A dogged persistency in prayerfulness characterised him at all times. With him it was an instinct. He had never reasoned about it, never had any doubt occurred to him, he always clung to prayer with a simple childlike tenacity. He was exceedingly realistic in his prayers, seldom cared to indulge in art or imagination, but prayed outright for every need he felt. "The first lesson of the scriptures of my life," says he "is prayer. In the twilight of my religious career, the voice rose in my heart saying 'Pray. always pray, there is no other way than

prayer.'" In those days he had neither the flow of language, nor the power of emotion, but still he prayed on, and tried to live purely. Latterly as he gained in wisdom and matured in piety, he discovered in prayer the inviolable and essential law of spiritual progress. He never believed that the nature of God could be at any time changed by our devotions, the Divine was immutable. But he held that the law of grace, and growth of religious life demanded faithful prayer on our part. Hearty prayer changes a man's mental constitution, and reveals all things to him from a new point of view. Constant prayer renews a man's life entirely. He gains new wisdom, new insight, fresh flow of heart and force of will, derived from a knowledge of the purposes and secrets of God. The more a man prays, the more divine he becomes in every relation of life "If I asked," says he "what religion I should adopt, prayer answered the question. If I wanted to know whether or not I should give up my worldly prospects and become a missionary, prayer brought me the answer. Prayer determined what relations I should bear to my wife, and it was prayer that regulated my conduct in pecuniary concerns." When his

friends quarrelled among themselves, he enjoined upon them to go and pray together. When one of his servants, a mere boy, committed a theft in his house, he knelt down, and prayed by the side of the culprit. One peculiarity of his prayerfulness was that he not only prayed but wanted and waited for an answer to his supplications In all his devotional exercises therefore the doctrine of inspiration and divine commandment actuated him very deeply. Whatever response he obtained in this way was always the guiding principle of his life. This he called by the much disputed name of *Adesh* (divine command). In the smallest matters of daily life, whenever he was in difficulty he walked by the light of this *Adesh.* In every social reform that he ever undertook, this response to prayer was his only guide. In the management of the *Bharat Asram,* in every important affair that related to the inmates of that institution, he insisted on the command of God being sought, an idea which not a few of his friends secretly ridiculed. When in the marriage of his daughter to the Maharajah of Cuch Behar he pleaded that he had been led by the Spirit of God to give his sanction to the marriage, his enemies,

nay the whole world grew furious. Yet Keshub in this instance said nothing which he had not habitually said during the whole course of his spiritual life. In a letter to Prof. Max Muller in the last year of his life, he reviews the past thus, "These twenty-five years the Holy Ghost has been to me not only Teacher and Guide, but also my Guardian and Protector. He has given me the bread of inspiration, and to his directions too I owe my daily bread. I never knew any *guru* or priest, but in all matters affecting the higher life I have always sought and found light in the direct counsels of the Holy Spirit. Nor could I ever count upon a definite income for my large family, and yet through darkness and uncertainty the Holy Ghost has led me on, feeding me, my wife, ten children, and even giving us the comforts of life. From how many perils, dangers, and temptations has He delivered me ! How many times has He shown me the light of heaven ! or I would have perished To so good a Spirit I look as to a personal Friend and daily Companion, and I have made up my mind never to turn away from Him to whom I owe all that I prize in my temporal and my spiritual life." To Keshub Chunder Sen prayer was the only

medium of communication between God and man, the only unfailing law of light and guidance His whole life as a devotee developed out of that.

"The forms of his prayer were utterly unconventional. A perfect master of his mother tongue, he poured forth his aspirations in a stream of chaste pellucid poetry to which it was a delight to listen. Now and again he descended to the homeliest, simplest, most familiar vernacular, far away indeed from the language of the Scribes and Pharisees, whose notions of respectability and reverence were shocked thereby, but anon he ascended to flight of expression and sentiment which nothing in the religious literature of any country could excel. His face assumed a strange beauty when he was in the rapture of devotional excitement; an unconscious smile played upon his noble handsome features; tall and athletic as he was, his whole attitude was erect and full of light; many among the congregation gazed upon his face with wonder. Strange to relate, after the fierce agonies of his last moments, as soon as all hushed in death, the same wonted well-known smile returned, and lighted up, and glorified his countenance!

The thousands that came to pay their last honours to him marvelled. They kept his sweet face uncovered till the funeral pyre was set fire to. Here then was a man who, upon the small beginnings of a simple spontaneous prayerfulness, gradually laid the structure of a spiritual life, the colossal proportions of which overshadowed the whole land. Keshub Chunder Sen bears undoubted testimony to the efficacy of prayer, the grand testimony of spiritual heroism, and noble perfection achieved through the easy natural means within everybody's power. of asking for light and guidance from God."

—*The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*
Chapt. IX

* * *

"My son, let thy devotions be to thee a draught of holy intoxication, seek it, crave for it, indulge in it whenever thy spirits are low. * * * Refresh thy tired nature in the pure streams of God's worship, that flow in the sentiments and examples of the great masters of mankind. The psalms of David, the beatitudes of Christ, the utterances of Paul, the raptures of Hafez, the precepts of the Gita,

the hymns of Nanak, and other Vaishnava devotees are all open to thee The scriptures ever aid our devotions. Why dost thou not read the devout prayers of thine own Minister Keshub ?"

—*The Silent Pastor*—"*on the Devotional Spirit*"

সাধু অঘোরনাথের নিবেদন

প্রার্থনা— "জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যখন যে অভাবটী আমাদিগের অত্যন্ত দুঃখদায়ক হয় ও যে পাপটী হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলে, তখনই তজ্জন্য আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি। প্রার্থনার এই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু এরূপ প্রার্থনা সাময়িক,—স্থায়ী ও সাধারণ নহে। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

"প্রার্থনা দুইভাবে হয়—প্রথমতঃ নিষেধাত্মক অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল কণ্টক, তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য, দ্বিতীয়তঃ ভাবাত্মক অর্থাৎ কিছু বিধি লাভ করিবার জন্য। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা—বিধিপ্রার্থনা। নিষেধ প্রার্থনা কেবল ভাবাত্মক প্রার্থনার জন্য, এ নিমিত্ত ভাবাত্মক বিধি প্রার্থনাই প্রকৃত প্রার্থনা। উহা ব্যক্তিবিশেষের অবস্থার উপর বা সময়ের উপর নির্ভর করে না। সকল সময়ে সকল ব্যক্তির মধ্যেই হইতে পারে।"

প্রার্থনা — “অনেক সময় দেখা যায়, প্রার্থনা সাময়িক হয়। দুই দিন বা দুই ঘণ্টার জন্য যে প্রার্থনা, বাস্তবিক তাহাকে প্রার্থনা বলে না। যথার্থ প্রার্থনা ঈশ্বরকে চাওয়া। কিন্তু সে কি হৃদয়ের সাময়িক ভাব? তাহা নহে, প্রকৃত প্রার্থনা জীবনের স্থায়ী স্রোত বিশেষ। তাহা চিরকাল হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। মহর্ষি ঈশা যে বলিয়াছিলেন, ‘অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর’, তাহার প্রকৃত ভাব এই। ইহা যেমন প্রার্থীর সম্বন্ধে, তেমনি প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে।

“সচরাচর প্রার্থিত বিষয় সাময়িক হয়। যখন শুষ্কতা কি কোন অভাব বোধ হইল, তখন সেই বিষয়টীর জন্য প্রার্থনা হয়। অন্য সময় নহে। কিন্তু যথার্থ প্রার্থিত বিষয় অনন্তকালের জন্য। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা প্রভৃতি অনন্তকাল জীবনের প্রার্থয়িতব্য হইবে। এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার দুইটী অবস্থা আছে।

“প্রথমতঃ যাহা চাহিব, তাহার জন্য যদি হৃদয়ে সংগ্রাম না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে, উহা আমরা চাহি না। জ্ঞানে অভাব চিন্তা করিয়া যে প্রার্থনা, তাহা প্রকৃত প্রার্থনা নহে। অতএব যখন যে বিষয়টীর জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত সংগ্রাম হয়, তখন সেইটী লইয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা বিধেয়। কোন বিষয় হৃদয় অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, উপাসনাদি কোন কার্য্যে কিছুমাত্র সুখানুভব হয় না। সকল অবস্থাতে কিসে সেই বিষয়টী লাভ হইবে, তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলতা থাকে।

"কেবল যে সংগ্রাম হইলেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তাহা নহে। বিশ্বাস ও আশার পরিমাণানুসারে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। যে পরিমাণে বিশ্বাস ও আশা, সেই পরিমাণে প্রার্থনার সফলতা; কারণ বিশ্বাস ও আশার মধ্য দিয়া প্রার্থনার ফল আসিয়া থাকে এবং বিশ্বাস ও আশাদ্বারা প্রার্থী ব্যক্তিও প্রার্থনার ফল উপলব্ধি করিতে পারে। আমি যে জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাহা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে, কখনও বঞ্চিত হইব না, এরূপ বিশ্বাস ও আশা চাই।

"পরন্তু যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার দর্শন আবশ্যক, তাহা না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের পাপ-জীবনে কি প্রতিদিন তাঁহার দর্শন-লাভ সম্ভব? দর্শন না পাইলেও তিনি শুনিতেছেন, এই বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা করিলেই হৃদয় কৃতার্থ হইবে।

"সর্ব্বোপরি জানা চাই, প্রকৃত প্রার্থনা হইয়াছে কি না। তাহা কি দিয়া জানা যায়? জীবনে পবিত্রতা শান্তি লাভ হইল কি না, তাহা দ্বারা জানা যায়।"

—"ধর্ম্মসোপান"

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের নিবেদন

প্রার্থনা— "ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্যের চিন্তায় যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা কৃচ্ছ্রসাধন নহে, উপাসনাসাধন।

যে ব্যক্তি নূতন অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সমগ্র অঙ্গের উপাসনা সম্ভব নহে। এমন কোন একটি অঙ্গ তাহার জীবনের তখন উপযোগী, যেটিতে সিদ্ধ হইলে অন্যান্য অঙ্গের সাধন তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। এ অঙ্গটি প্রার্থনা। * * * অধ্যাত্মজীবনারম্ভে প্রার্থনার বিশেষ উপযোগিতা এই জন্য যে, সে সময়ে শারীরিক জীবনের প্রাবল্য রহিয়াছে। শরীরের স্পৃহণীয় বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইয়া, আত্মার বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করা এ সময়ে সাধনার্থীর পক্ষে বড়ই কঠিন। দুই মিনিট মন স্থির রাখা যে অবস্থায় অসম্ভব, সে অবস্থায় উপাসনার উচ্চ অঙ্গে প্রবেশ কি প্রকারে ঘটিবে? মন স্থির করিবার জন্য শারীরিক বিষয়ের স্পৃহা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। বিষয়স্পৃহা নিবারণ করিতে হইলে মনের বলের আবশ্যক। সে বল সাধনার্থী ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে পাইতে পারে না। * * * সুতরাং এস্থলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ভিন্ন আর সাধনার্থীর গত্যন্তর নাই।

"প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দন। * * আধ্যাত্মিক অন্নের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলেই তল্লাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দন কখন বিফল হইতে পারে না, কেন না ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্ন পান যোগাইতে ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রস্তুত। আত্মার

ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্ন পান তিনি স্বয়ং, সুতরাং তিনি বল হইয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে ক্রমে যে বলসঞ্চার হইতে থাকে, সেই বলে শারীরিক স্পৃহা সকল নির্জ্জিত হইয়া অধ্যাত্মবিষয়ে চিত্তস্থাপনে মনের সামর্থ্য জন্মে।"

আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ— "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং প্রার্থনা না করিয়া কেহ কেহ প্রতিদিন কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা পাঠ করা উপাসনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন কেন? ইহাতে কি নিজের কিছু প্রার্থনা করিবার নাই, ইহাই বুঝায় না?

"কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠ তাঁহাদের পক্ষে কোন কালে উচিত নয়, যাঁহাদের সেই প্রার্থনাপাঠে প্রার্থনার স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া না যায়, অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন তত্ত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রতিভাত না হয়, তাঁহাদের পক্ষে প্রার্থনা-পাঠ নিষিদ্ধ। প্রার্থনাপাঠে আত্মা উচ্চভূমিতে উত্থান করে, জীবনে কোথায় কি লুকাইয়া আছে প্রকাশ পায়, এবং এইরূপে লুক্কায়িত বিষয়গুলি দেখিতে পাইয়া হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা উত্থিত হয়, সে প্রার্থনায় আত্মার অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তিতে এরূপ

ঘটে না, তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ সাধকগণের প্রার্থনা পাঠ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে।

"হৃদয়কে উচ্চ ভূমিতে তুলিবার জন্য কেবল প্রার্থনা পঠিত হয় কেন? উপদেশাদি পড়িলে কি সে কাজ হয় না?

"প্রার্থনাকালে সাধকের আত্মার সমগ্রভাব প্রকাশ পায়, ভাবান্তরের সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না, বক্তব্য বিষয়টি বিবৃত করিবার জন্য অবান্তর বিষয় আসিয়া জোটে না; সুতরাং হৃদয়কে তদ্ভাবাপন্ন করিয়া লইতে হইলে, প্রার্থনাই তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী।

"এরূপ ভাবে কোন ব্যক্তির প্রার্থনা পাঠ করিলে কি তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করা হয় না?

"যাঁহারা প্রার্থনাপাঠেই সকল হইল, আর কিছু করিবার নাই মনে করেন, তাঁহাদের এ দোষ ঘটে। কিন্তু পাঠে পূর্ব্ব সঙ্কল্প উদ্দীপন, এবং সে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সাধন ও প্রযত্ন, পূর্ব্বে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত তত্ত্বের পরিগ্রহ, এই সকল যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা আর প্রার্থয়িতাকে মধ্যবর্ত্তী করিলেন কোথায়?"

—"ধর্ম্মতত্ত্ব"

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

(সামাজিক ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা)

প্রার্থনা

প্রেমরাজ্য

(কমলকুটীর, রবিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হরি, যে প্রেম তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিতে চাও, তাহা এই দলের মধ্যে দাও। যথার্থ স্বর্গীয় প্রেম, যাহা তুমি বিস্তার করিতে চাও, এই দলকে দাও। অশান্তির আগুন চারিদিকে জ্বলিতে চলিল। শান্তি-দাতা, এই সময় শান্তি-বারি ঢাল। এমন একটা দল অন্ততঃ দাও, যাদের মুখ দেখিলে পৃথিবীর আশা হ'বে। তোমার প্রেরিত সুসন্তান ব'লে গিয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সার বাপকে ভালবাসা, আর ভাইকে ভালবাসা। বাস্তবিক ইহাই সার ধর্ম্ম, তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদিগকেও তাই করিতে দাও। মা, তোমার আদেশে নববিধান আমরা দেশবিদেশে প্রচার করিতেছি ; কেন না তোমার এই শান্তিদায়ক ধর্ম্মের প্রসাদে পূর্ব্ব পশ্চিম এক হ'বে, ইয়ুরোপ এসিয়া এক হ'বে। কেমন ক'রে হ'বে? মা, তোমার ধর্ম্ম ভিন্ন অশান্তি যাইবার উপায় নাই। তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন গতি নাই। মানুষ প্রেমের ধর্ম্মকে কাটে। শান্তির রাজ্য আসিতে দিবে না সে। মা, চারিদিকে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তা নিবাইবার উপায় কি? কেউ বলে, রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপার, মা করিবেন ; কিন্তু এই সব ব্যাপার দেখে দেখে তোমার প্রাণ যে কেঁদে উঠে। তোমার নববিধানের ধর্ম্ম যে আস্‌চে, তুমি চাও যে, প্রেমের প্রতিমা পৃথিবীতে বসিবেন। মা, লোকে বলিবে কি? এই ক'টি লোকের কি ক্ষমতা যে, অশান্তি দূর

করিবে? হে ঈশ্বর, ক্ষমতা আছে বৈ কি। সত্যের ক্ষমতা, প্রেমের ক্ষমতা আছে বৈ কি। পাঁচটা সাহেব কি করিবে? প্রার্থনার বলে সমস্ত পৃথিবীর অপ্রেম চূর্ণ হ'য়ে যাবে।·· বিরোধীদের কামানের উপর আমাদের এই গোলা গিয়া পড়িবে। প্রেম চাই আর শান্তি চাই, ক্ষমা চাই আর কুশল চাই। দাও প্রেম, মা, আমরা সকলে মিলে আনন্দের নিশান ধ'রে, প্রেমের পথে যাই। ভারতে নববিধানের রাজ্য স্থাপন কর। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মিলন কর। পৃথিবী এই সকল অপ্রেমের ব্যাপার দেখে, অনেক চক্ষের জল ফেলেছে, ঢের দিন কেঁদেছে। আর কাঁদিতে দিও না। আবার পূর্ব্ব পশ্চিমে কলহ হইতে চলিল। এবার নিজ হাত পৃথিবীর মাথায় দিয়া 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বল। সমুদয় পৃথিবীতে প্রেমের কথা, শান্তির কথা হউক, আর অপ্রেম থাকিতে দিও না। দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার অপ্রেমের আগুন নিবাইয়া দিয়া, প্রেমিক হইয়া, প্রেমের ধর্ম্ম, শান্তির ধর্ম্ম, কুশলের ধর্ম্ম জগতে দিন দিন বিস্তার করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবন্ত হরির পূজা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

প্রেমময় হরি, জীবন্ত দেবতার পূজা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। 'দেবতা দেবতা' সকলে করে; কিন্তু সকলের পক্ষে তুমি কি ঠিক জীবন্ত দেবতা? ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তুমিই কি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে ঠিক দেবতা? মিলাইয়া লই। হে হরি, আমি সাক্ষাৎ দেবতা, জাগ্রত ঈশ্বর

তাঁকে বলি, যে দেবতা কাজ করেন, বলেন ; ঠিক মানুষের মত, অথচ মানুষ নয়। যেমন মরা মানুষ আর জীবন্ত মানুষ,—যে মানুষ বেঁচে আছে, বেড়াচ্চে, কথা কচ্চে, জগতের মঙ্গলকার্য্য সাধন কচ্চে, একে বলি জীবন্ত ; আর ওটার হাতও আছে, পাও আছে, অথচ কিছুই করিতে পারে না, সে মৃত। জীবন্ত আর মৃত দেবতার এত তফাৎ! আমার মেয়েটি চুল আঁচড়াচ্চে, দেখিব, তোমার হাতে চিরুনী। আমার মেয়ে জীবন্ত, আর তুমি মৃত? মৃত দুর্গন্ধ দেবি, পালিয়ে যাও তুমি জীবনের রাজ্য থেকে। আমার সোণার দেবী তুমি, তুমি এস। নাস্তিক বলে—মানুষ টাকা আনে, মানুষ সংসার করে, মানুষ সব করে। আস্তিক বলে—মানুষ কিছুই করে না। সকলে বলে—বামুন রেঁধে দেয়, আমিও তাই বলি, কিন্তু সব তুমি কর। মাটীর যে ভগবান্, কাঠের যে দেবতা, দূর হও। ঠেলে দিলাম, আর পড়ে গেল। ভগবতি, যে সংসারের সকল কাজ তুমি কর, সে সংসারে আমার থাকিবার ইচ্ছা। নাস্তিকের চোখ এ শরীরে ধারণ ক'রে কোন উপকার নাই, যদি দেখিতে পাই, কোন পয়সা আস্চে, যা তুমি দিচ্চ না, যদি দেখ্তে পাই, আর কারো অন্ন খাই, তা হ'লে অধিক দিন বাঁচিব না। সব তুমি করিতেছ, তুমি দিতেছ, এ যে দেখিতে না পায়, সে নাস্তিক, সে হতভাগা। আমি উপাসনার সময় দু'ঘণ্টা ব'কে মরি, আর নিৰ্জ্জীব দেবতা যে, সে পড়ে আছে, কথাও কয় না। তবে আমি সে দেবতার চেয়ে বড়। সে মাটির দেবতা, লোহার দেবতা। যেখানে দেবতা কথা কয় না, সেখানে দেবতা নাই। প্রত্যাদেশ বিনা দেবতা নাই। আমার প্রাণের ঈশ্বর, তুমি এস ; সোণার লক্ষ্মি, তুমি এস। কি, আমরা আপনারা সংসার চালাচ্চি, দাসদাসীরা আপনারা কাজ কচ্চে? নাস্তিক মুখ, চুপ কর্। তোর ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। মা খাবার মুখে তুলে দিচ্চেন, এমনি ক'রে বিশ্বাস

করিতে দাও। মা, তুমি লক্ষ্মী, তোমার সব চাল, যজ্ঞের রান্না সব তোমার। নববিধানবিশ্বাসীর বাড়ীর সব তোমার। বিশ্বাস করিলে আরও বিশ্বাস বাড়ে, ভক্তি বাড়ে। সোণার লক্ষ্মি, সোণার সংসার আমাদের মধ্যে সৃজন কর। টাকাকড়ি, অন্ন, সব লক্ষ্মীর ছোঁয়া জিনিষ; আস্তিকের সংসারে রাখ, যেখানে লক্ষ্মীর মুখ দশ দিকে। লক্ষ্মীর দেওয়া খাবার, লক্ষ্মীর বাড়ীর কাপড়। লক্ষ্মী এসে রোজ সংসারে কাজ করেন, সকলকে খাওয়ান, তার পর সমস্ত রাত সকলকে আগলে বেড়ান। এই বিশ্বাস যদি দিতে পার, তবে ভক্তি দিব, প্রাণ দিব, শরীর দিব। নাথ হে, যথার্থ বিশ্বাসী কর। নাস্তিকতার আগুন হইতে বাঁচাও। হে করুণাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা নাস্তিক সংসার ত্যাগ করি, লক্ষ্মীর সংসারে থাকি, যেখানে লক্ষ্মী স্বহস্তে সব করেন এবং লক্ষ্মীর পদ সাধনা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক;
৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, সুগভীর আনন্দ, আমাদের দেবতা অতি চমৎকার দেবতা, অতি সুন্দর দেবতা, আহ্লাদে মন পূর্ণ। যাচাই করিয়া লইলাম, ঠিক, অত্যন্ত ঠিক; এ যে খাঁটি সোণা আমার ঠাকুর। এ কি কম সৌভাগ্য, যে বলা যায়, "হে বিশ্ব, এই যে ঠাকুর দেখিতেছ, ইনি খাঁটি, অত্যন্ত সত্য।" তোমাতে সুখ সকলেরই হইয়া আসিতেছে। অল্পবিশ্বাসী,

অধিক বিশ্বাসী, সকলেই আপন আপন দেবতাসম্বন্ধে আনন্দ পায়। লক্ষ কুসংস্কারাপন্ন লোকেরও তো আনন্দ হয় আপন আপন দেবপূজায়। তা'হলে হইল না, তোমাতে আনন্দ হইলেই, তুমি যে খাঁটি দেবতা হইলে, তা নয়। আমার প্রমাণ সকলের মানিতে হইবে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, বৃক্ষ জানা যায় ফলের দ্বারা। আমার দেবতাকে ডাকিতে ডাকিতে, যদি আমার ক্রোধ অপ্রেম একেবারে দূর হয়ে যায়, তবেই প্রমাণ হইল, আমার দেবতা খাঁটি। সুখ হয় ব'লে, তোমাকে খাঁটী ব'লে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু কি প্রমাণ? তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে শরীর মন প্রাণ শুদ্ধ হ'য়ে যায়। এক হুঙ্কার, সে এক গভীর উচ্ছ্বাস, সমুদয় বিশ্ব পূর্ণ হ'য়ে যায়। আমি আমাতে এবং আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে দেখিতে চাই যে, লোকে বলিবে—এমন দয়া, এমন ন্যায়পরতা, এমন পুণ্যের তেজ, এমন নরম প্রেমিক ভক্ত, এমন বিনয়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। দয়াময়ি, তুমি যদি জীবন্ত ঈশ্বর হও, তবে তোমার দলের মধ্যে তুমি প্রমাণিত হও, এই প্রার্থনা তোমার চরণে। কল্পতরু হ'য়ে এমন ফল ফলাও, যাতে তুমি প্রমাণিত হইবে। কেবল হাসিলেই হয় না। উপাসনার হাসি যার, সে যে ক্রমাগত দৌড়িতেছে শান্তিনিকেতনের দিকে। হরি, তোমার কাছে প্রাণের গুপ্ত কথা বলিতেছি,—এইটি সংশয় হয়. কষ্ট হয় যে, আমার ভাই আজ দয়া করিলেন, পরের উপকার করিলেন, শত্রুকে ক্ষমা করিলেন, কাল সৎপ্রসঙ্গ করিলেন না, প্রেম দয়া করিলেন না, অথচ সন্ধ্যার সময় তাঁর মুখে হাসি, খুব সুন্দর হাসি ; ভক্তের হাসির সঙ্গে তার কিছু তফাৎ দেখিলাম না, দেখে প্রাণ বিষাদে জ্ব'লে গেল। সাত্ত্বিক হ'য়ে যে হাসি, অসাত্ত্বিক হয়েও ঠিক সেই হাসি! পরমেশ্বর, তোমাকে প্রমাণ করিতে আমরা পারিতেছি না। বিধাতঃ, তোমার শ্রীচরণতলে কিঙ্করের এই প্রার্থনা, তুমি এই দলকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন কর, নতুবা কিছুতেই আমার

বিশ্বাস হইবে না। এখানে কেহ হয় তো খুব দয়া সাধন করিলেন, কেহ আদপে দয়া করেন না। দয়াময়, ধর্ম্ম করিলেও সুখ, না করিলেও সুখ? তোমাকে ডাকিলেও সুখ, না ডাকিলেও সুখ? প্রেমময়ি, বল তোমার সঙ্গে নিত্য কালের খাঁটি সম্বন্ধ স্থাপন হচ্চে। এইটি প্রমাণ ক'রে দাও জীবনে। এইটি কর, মা, তোমার প্রত্যেক ভক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন হচ্চেন; যেমন শান্তি, তেমনি পুণ্য। হে শ্রীহরি, প্রেমের আকর, মনের ভিতর যথার্থ আনন্দ দাও; পাপেতে আনন্দিত হই না যেন কখন। আমি পৃথিবীর পাপবৃক্ষের অসার আনন্দের ফল নেব না, ছোঁব না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মদানে, হে শ্রীহরি, গরিব আশ্রিতদিগকে সুখী কর। যেমন প্রত্যাদেশের ছটা বাহির হইবে, তেমনি পুণ্য, ধর্ম্ম, ভক্তি, কর্ত্তব্যপালন, সব তার সঙ্গে থাকিবে। সকল ফুল, সকল ফল আমাদের বাগানে থাকিবে। হে কৃপাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর. যেন আমরা, যিনি ঠিক খাঁটি দেবদেবী, তাঁর পূজা করি, এইটি জীবনে ও কার্য্যে রোজ রোজ প্রমাণিত করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একটি পিতা, একটি ভ্রাতা

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৪শে ফাল্গুন ১৮০৪ শক;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীননাথ, নববিধানের দয়াময় দেবতা, তোমার কাছে এত দিন কি পাইলাম, বিশেষ কি কার্য্য করিলাম পৃথিবীতে? কিছুই কি পাই নাই তোমার নিকটে? কি পাই নাই তোমার নিকটে? এক সুখের হরি পাইয়াছি, দিয়াছি; নিজস্ব ধন করিয়াছি মণ্ডলীকে দিয়াছি। দুঃখ

হইলে যাঁর কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এমন এক পিতা মাতাকে দেখিয়াছি, দেখায়েছি পৃথিবীকে। একটি প্রেমময় আনন্দময় দেবতাকে পাইয়াছি, জন কতক লোক সেই দেবতাকে লইয়া খুব আনন্দে আছে। এইটি তুমি বঙ্গদেশে স্থাপন করেছ। শ্রীস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ, প্রেমময়, গতিনাথ, একজনকে ইঁহারা পাইয়াছেন। দুঃখ মোচন হয়, এমন এক ধন পাইয়াছেন। আমরা তোমাকে ডাকি, তোমাকে দেখি। সে জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব, খুব পরিষ্কাররূপে পৃথিবী লিখিবে, এক দল মরুভূমিতে, বনে কল্পতরু বাহির করিয়াছিল। এই সমুদয় দলটি, কম বেশী প্রত্যেকে, জীবন্ত জাগ্রত তুমি, তোমাকে পূজা করে। একটা স্ত্রী একটা স্বামীকে ভালবাসে, একটা ভাই একটা ভগিনীকে ভালবাসে, একটা পুত্র একটা পিতাকে ভক্তি করে, একটা কন্যা একটা মাতাকে শ্রদ্ধা করে, এ যদি আমাদের মধ্যে হয়, তবে প্রমাণ হয় যে, তোমাকে পাইয়াছি। একটা না হ'লে, কেমন ক'রে বনেদ গাঁথা হ'বে। হে ঈশ্বর, এতগুলি সাধু লোককে এনেছ, কিন্তু কোন দু'টি মিশ খাবে না, জোড়া লাগিবে না? জোড়বার মালও চাই। পিতার মন্দির তৈয়ার হয়ে উঠিল, ভাইয়ের মন্দিরের বনেদ গাঁথাও হলো না। আমরা ভাই ভগিনীসম্বন্ধে মন্দির গেঁথে রেখে যেতে পারিলাম না, তবে একটু খানি বনেদ যেন গেঁথে রেখে যেতে পারি। যখন প্রাণের সহিত সরস অন্তরে এত দিন তোমার চরণ সাধন করিলাম, তখন এ দু'টি হ'তেই হ'বে। একটি প্রেমময় পিতা, আর একটি প্রেমময় ভ্রাতা; একটি প্রেমময় পিতা হৃদয়ে, আর একটি সুখের পরিবার, সুখের মণ্ডলী। নববিধানের সুখের পরিবার হ'য়ে, শুদ্ধ হ'য়ে আমরা তোমার ভজনা করিব। এই দুয়ের মিলন হ'তেই হ'বে। একটা দেখে গেলাম, আর একটির আশা ক'রে গেলাম;

তোমার কৃপা যদি হয়, দু'টিই দেখে যাব। বাপকেও দেখিব, ভাইকেও দেখিয়া যাইব। দুইটির বীজ পোঁতা হয়েছে। যদি দু'টি ফলই তুলে দাও, সুখী হই। হে দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রসাদে দুই বৃক্ষেরই ফল দেখিয়া, আমরা সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দলযন্ত্রে শব্দ-শ্রবণ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে জীবের প্রতিপালক, হে কৃপাসিন্ধো, তোমারই আশ্চর্য্য শব্দ তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া, সন্তানের আকার, ভক্তের আকার, বিশ্বাসীর আকার ধারণ করে। সেই বিশ্বাসীকে চিনিতে পারে, যে তোমার শব্দ বলিয়া বুঝিতে পারে। কার সাধ্য, হে পিতঃ, নববিধান ঘোষণা করে ? সেই যে তোমার বিধি হইল ; বিধি অর্থ বিধান, বিধান অর্থ শব্দ, শব্দ অর্থ সন্তান, ভক্ত। তোমার শব্দ মনুষ্যজীবনের আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিল। গম্ভীর আকাশে গম্ভীর বাণী তব মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া, চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে ; কিন্তু তোমার শব্দ পৃথিবীতে আসা অর্থ মানুষের জীবন, বিধান, নীতি। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে শব্দ এয়েচে, ভয়ানক শব্দ হইতেছে, সেই শব্দ মানুষের আকারে একটা দলের ভিতর প্রবেশ করেছে। শোচনীয় তাদের অবস্থা, যারা সেই শব্দ, সেই বিধি শুনিল না। ঠাকুর, আমরা যে আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে চলিব, খানিকটা আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি

লইব, খানিকটা তোমায় দেব, তাহা হইবে না। শব্দ অর্থ বিধান, শব্দ অর্থ বিশ্বাস, শব্দ অর্থ ভক্তি। সে শব্দ এয়েচে, নতুবা নববিধান এই কথা আসিল কেন? সে শব্দ কি?—"এই রূপে চল।" সে শব্দ কি?—"তোমার রুচি ইচ্ছা সমুদয় এই বিধিতে ঢালিয়া দাও।" সে শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ঘুরিতেছে, তাহাতে ঘূর্ণিবায়ু হইতেছে। হে প্রেমসিন্ধো, শব্দ মানিতেই হইবে ষোল আনা, নতুবা আমাদের পরিত্রাণ হইবে না। এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না, এই মণ্ডলী নববিধান আসিবার প্রণালী, এই ঘর তবে কাশী শ্রীবৃন্দাবন জেরুজেলেম অপেক্ষা বড়। এই ঘরের নাম ঊনবিংশতি শতাব্দীর স্বর্গগমন। এই ঘরের প্রাচীরের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, পৃথিবী মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এখন। এই ঘরের ছাদ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায়, স্বর্গে কি হইতেছে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ যোগী ঋষিরা কি করিতেছেন। ভারি আশ্চর্য্য এই ঘর। এই দল, এই ক'টা লোক, সেই দূরবীণ। এই দল একখানা, শব্দ শুনিবার একটি যন্ত্র, একটা দূরবীক্ষণ, এই ক'টা লোক একজন লোক। সমস্ত তীর্থের মূলতীর্থ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘর। এই ঘরে আমরা বসি; পূর্ণ বিশ্বাসীরা এই ঘরে ব'সে, একটি একটি করিয়া সমস্ত শব্দ শুনেন। শব্দ সুধা, আদেশ অমৃত, প্রত্যাদেশের মধু এই ঘরে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর, পৃথিবীর রাজ্য হইতে দৌড়ে এয়েছি এই ঘরে, শব্দ শুনিবার জন্য; প্রাণ খুব ভাল ক'রে দাও, খুব শব্দ শুনি। শব্দ শুনিবার ঢের বাকি, এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। আমাদের এখন সব কাজ শব্দেতে হ'বে, ধর্ম্ম থেকে সংসারের অবধি সব কাজ এতে হ'বে। এই ঘরে ব্রহ্মশব্দ-শ্রবণ, ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ হ'বে। প্রেমসিন্ধো, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ষোল আনা সেই মতে চলিয়া, দিন দিন শুদ্ধ হই। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

না বুঝে বিশ্বাস

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
৯ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে দুঃখী পাপীর পরিত্রাতা, দেখিয়া বিশ্বাস করিব, বুঝিয়া বিশ্বাস করিব—মানুষের এই কথা। এই কথার পূর্ণতা নাস্তিকদিগের মধ্যে, এই কথার অল্পতা আস্তিকদিগের মধ্যে। দুর্ব্বলবুদ্ধি নাস্তিক বুঝিতে না পারিয়া, পরলোক মানিলেন না, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলেন না। এই নাস্তিকের ভাই আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। অল্প অধিক অবিশ্বাসের কারণ এই, 'বুঝিতে পারি না আমরা।' বোঝার উপর আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস নির্ভর করে। ভগবান্, সকলের ভিতরই এই ভাব দেখা যায় যে, বুঝে লই, তার পর সেই রূপে চলিব। বুদ্ধি যেটুকু বুঝিয়ে দিলে, সেইটুকু অবলম্বন করিয়া, ভাই বন্ধুরা স্বর্গ সাধন করেন। বুদ্ধি যাঁহাদের উপায়, তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া পরিগণিত। তুমি বিশেষরূপে আশীর্ব্বাদ কর তাঁদের, যাঁরা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিলেন, না বুঝিয়াও বিশ্বাস করিলেন। না দেখে বিশ্বাস করিলে, তুমি আমার মাথায় হীরের মুকুট দিবে, আর দেখে বিশ্বাস করিলে, তুমি আমার মাথায় খড়ের মুকুট দিবে। ভগবান্ যদি কষ্টে ফেলেন, দেখিতে পাই, তবু বিশ্বাস করিব। না বু'ঝে যদি বিশ্বাস করি, ভালবাসি, তবে পরিত্রাণ পাব। আমরা না বু'ঝে কেমন ক'রে তোমায় বিশ্বাস করিব ? করি, যা করিতে বল, তাই করিব, খুব সাধন ভজন করিব ? কিন্তু বুঝিয়ে না দিলে, করি না। তাই বুঝিলাম আমরা, ঠিক জায়গায় পৌঁছি নাই। পিতঃ, বু'ঝে চলে কারা ? যারা বোকা ; না বু'ঝে চলে কারা ? ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মুষা ইঁহারা। দয়াময়, এই প্রচারকমণ্ডলী

যদি না বু'ঝে দু'দিন চলেন, অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। কত শান্তি, কত ধন, কত পুণ্য মঙ্গলপাড়ায় হয়। বু'ঝে চলিলে পরে নাস্তিকের নরক হ'বে, না বু'ঝে চলে যে, তার আস্তিকের স্বর্গ হ'বে। দয়াময়, বুঝিতে চাই না, কেবল গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাও। মার কাছে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে থাকিলে কত কি হয়; অতএব, মা, আর কিছু চাই না, বিশ্বাস পরম ধন, তাই দাও। খুব বিশ্বাস করিব, তার পরে দেখিব, শান্তিরাজ্য এয়েচে। খুব সাদা একটি ছোট ডিম, তার ভিতর থেকে কেমন সুন্দর পাখী বাহির হয়। কিরূপে হইল, বুঝিতে পারি না। এই এত দিনের পর নববিধান কিরূপে আসিল, জানি না। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বুঝিতে পারি, আর না পারি, ষোল আনা তোমার আজ্ঞা পালন করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ঈশ্বর গুরু

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
১০ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে অনাথশরণ, তোমার সঙ্গে যেমন আমাদের অন্য দশটি সম্বন্ধ আছে, তেমনি, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের গুরু। যাহা অন্য লোকে বুঝাইতে পারে না, যাহা অন্য লোকে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, তুমি আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে। পণ্ডিত অপেক্ষা পণ্ডিত তুমি, যখন তোমার কাছে যাই, তখনই শিখিতে পারি। এমন গুরু আর কোথায় আছে? মানুষ খুঁজিয়া পায় না। তোমার কাছে আসিলেই, তুমি বল, আমি যে ঘরে গুরু হইয়া বসিয়া আছি, অন্য জায়গায় কেন

গুরুর অন্বেষণ করিবে? অন্নদায়িনী হইয়া অন্ন দিলে, আবার জ্ঞানদায়িনী হইয়া জ্ঞান দিলে। এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ আর কার সঙ্গে? অন্ন দিয়া শরীর রক্ষা করিলে, আবার জ্ঞান দিয়া আত্মাকে রক্ষা করিতেছ। হে মাতঃ, দিন দিন আমাদিগকে শিক্ষিত কর। পরমেশ্বর, যে তোমার হয়, সে বুদ্ধিও পায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করে, তারও বুদ্ধিও জুগিয়ে যায়। মা, তুমি যে সরল ভাষায় সহজ সহজ ক'রে তোমার সত্যগুলি বুঝিয়ে দাও, তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারি। তোমার ঈশা মুষা জ্ঞান কোথায় লাভ করিতেন? তাঁরা যে তোমার কাছে সব জ্ঞান লাভ করিতেন। হরির বিদ্যালয়ে যেন আমরা পড়ি। হাত যোড় করিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, রক্ষাকর্ত্তা, সন্দেহ অবিশ্বাস অবিদ্যা অজ্ঞান অন্ধকারে সন্তানদের রক্ষা কর। দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কাছে শিখি, আর কোথাও যেন না শিখি; পিতার কাছে, মার কাছে শিখি। দয়াসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, তুমি যে জ্বলন্ত জীবন্ত দেবতা গুরু ঘরে বসিয়া রহিয়াছ, যেন তোমার মুখের উপদেশ শ্রবণ করি, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্থির বিশ্বাস

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে স্নেহময়, হে অপার প্রেমের আকর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, যেরূপে এত দিন কাটাইলাম, জীবনের শেষ ভাগেও যেন এই ভাবে তোমারই হইয়া কাটাই। অনেকে এই প্রকার আছে, যাহারা শেষে

সংসারের শীতল জলে ধর্ম্মের আগুন নিবাইয়া ফেলে। যৌবনে তোমার, বার্দ্ধক্যে আমার, এরূপ যেন আমি না হই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যবৃদ্ধি, ভক্তিবৃদ্ধি যেন হয়। হে জগদীশ, চিরদিন মানুষ যদি সমান-ভাবে তোমার হ'য়ে না থাকে, তবে যে জীবন বৃথা। আমরা বৃদ্ধ বয়সের তিক্তরস যেন কিছুতেই পান না করি। তোমার পদারবিন্দলাভে দিন দিন আমাদের শান্তি আরও বাড়িবে। আমরা হাসিতেছি, আরও হাসিব। আমাদের শান্তি কেন কমিবে? আমরা যে তোমার আরও ভক্ত হইব। যত দিন যায়, যেন দেখি, আরও ভক্ত, আরও বিশ্বাসী হইতেছি। ঘর বাড়ী সমুদয় তোমারই রাজ্যের মধ্যে সম্বদ্ধ হইতেছে। এ বয়সে একমাত্র অবলম্বন তুমি, বৃদ্ধ বয়সে শান্তি দিবার আর কেহ নাই। হে দীননাথ, হৃদয়ের মধ্যে খুব শান্তি ঢালিয়া দাও। যত এ দিকের স্ফূর্ত্তি সুখ বল কমিবে, তত তোমাতে সুখ বল স্ফূর্ত্তি বাড়িবে। হে দীননাথ, দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগ বৃদ্ধি হয়; এ বয়সে অনন্যগতি হইয়া, তোমার আশ্রিত হইয়া, তোমার পাদপদ্মে যেন পড়িয়া থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রাজ্য-স্থাপন *

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক;
১২ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, আমরা যে মিথ্যা মানি না, সত্য মানি, এই আমাদের গৌরব। ধর্ম্মটা অভ্রান্ত সত্য, এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়?

* ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রার প্রাক্কালে প্রার্থনা।

সত্যের শ্বেত প্রস্তরের উপর বরাবর সত্যের নিশান রক্ষা করিলাম ; জয় জয় সত্যের জয়, জয় জয় ব্রহ্মের জয়! ব্রহ্মই সত্য, তুমি সত্য, হে ঠাকুর। পরমেশ্বর, এ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম তুমি। প্রত্যাদেশের আগুনে আমরা সত্যবাদী হইলাম। একটা অন্যায় মত প্রচার হ'লো না, একটা অন্যায় কথা বলিলাম না, এ কি কম! এ কি মানুষে পারে? ধন্য ধন্য, ব্রহ্ম! সত্যের ক্ষমতা এমন যে, কলিযুগের মধ্যেও কালবাঙ্গালীকে সত্যের মধ্যে রাখে। মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, তোমাকে সাক্ষী করিয়া চলিতেছে, নববিধান প্রচার করিতেছে। বিশ্বাস করি যে, এ কিঙ্কর তোমারই, এ কিঙ্কর তোমারই। যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে অনন্ত কাল তোমারই মানুষ ; পঁচিশ বৎসর পরীক্ষিত হইয়া, তোমার নবধর্ম্ম পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। এই অভ্রান্ত সত্য যেন পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। যে শান্তির সমাচার আমরা পাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছি, সেই সমাচার যেন পৃথিবী পাইয়া, সকল মানুস পাইয়া, তাঁদের অশান্ত বক্ষ শান্ত করেন, ইহার উপায় কর, অভ্রান্ত প্রবঞ্চনাশূন্য সত্যকে সর্ব্বত্র বিস্তার কর। আমরা সাক্ষী হইয়া ইহার প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণ করি। আমরা তো বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাস্ত্র তোমার মুখে। আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত তোমার মুখের কথা। একটা কথা ভাঙ্গে, এমন কারো সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা বড়, তাহা কখন মাটীতে পড়ে না। অতএব এই যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের সমন্বয়, ইহা আর কিছু নয়, ইহা কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে লইয়া একটি বিস্তীর্ণ পরিবার। এই ধর্ম্ম অভ্রান্ত। এই অভ্রান্ত সত্য পরিষ্কৃতরূপে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত হয় যদি জগতে, পৃথিবী জানিবে, কলির জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, আজও নূতন বেদ ছাপা হয়। মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যে সত্য স্থাপন করেছ, তাহা

যেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা সব আমাদের দলের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে, ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকলেই এক বাড়ী ক'রে নিয়ে এক পরিবার হ'বে, এটা যেন অনুমান না হয়। হরি বলেছেন, নববিধান ঠিক। যদি ঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য প্রচারিত হউক। হে দীনশরণ, তুমি এই অভ্রান্ত সত্য জগতে প্রচারিত কর। যেখানে যাওয়া হ'বে, কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, বিদেশী নয়। আমেরিকা চীন বিলাত, এরা সকল কে, ঠাকুর? এরা আমাদের কুটুম্ব। বড় বড় রাজারা এখন আমাদের আত্মীয়। পিতার প্রেমরাজ্য আসিবে, রাজসূয়-যজ্ঞ হ'বে, সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে। সুখের উৎসব, সুখের যাত্রা, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে। পিতঃ, পৃথিবীকে বুকে করি। পৃথিবী ঘুরে আসা, এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ এই চারিটির মুখে অমৃত দেওয়া, ইহাদের সেবা করা একই। তবে আর দূর থাক কেন? বিদেশ, স্বদেশ হও। আমাদের বন্ধুকে গ্রহণ কর, আত্মীয় হ'য়ে কুশলে রক্ষা কর। পরমেশ্বর, আমরা বিজয়ী হ'ব, প্রবল হ'ব; আর ভয় কি? হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ধর্ম্মামৃত, তোমার পূর্ণ সত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তোমার প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঋণ-শোধ

(কমলকুটীর, বুধবার, ১লা চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হরি, দোকান বন্ধ করিবার সময় যখন হয়, তখন লোকে খাতা লইয়া হিসাব লিখিতে নিযুক্ত হয়। সেইরূপ, হে হরি, আমাদের যত জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, জীবনের কার্য্যের হিসাব লিখিতে আরম্ভ করি। দোকানীর পক্ষে এ নিয়মটি ভাল। আমরাও না কি সংসারে দোকানী, দোকান বন্ধ করিবার সময় যত নিকট হইতেছে, হিসাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাওনা দেনার হিসাব চুকাইলে, দেনাটাই যদি দাঁড়িয়ে যায়, কাঁদিতে আরম্ভ করে লোকে। আমাদের সম্মুখে হিসাবের খাতা, কলম হাতে কাঁপিতেছে। বল দেখি, কি লিখিতে পারি ? লাভ ? না, দেনা ? দেখি, লাভও হয়েছে, কিন্তু শেষটা দেনায় দাঁড়িয়েছে। অন্তর্যামী, দেখ, সকলে কলম নিয়ে, খাতা সম্মুখে নিয়ে বসেছে। কার হাত কাঁপিতেছে ভয়ে, তুমি দেখিতেছ। আমিও লিখি, ইঁহারাও লিখুন। লোকে ইহার পর সেই খাতা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিবে, কি রকম আমরা ছিলাম। দলপতি দলের বিশ্বাস পাইল না, ইহা লেখা রহিল খাতায়। দলের মধ্যে কলহ অশান্তি গেল না, ইহাও লেখা রহিল। ধর্ম্মের সম্পর্ক মধুময় নহে, দলের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে, ইহাও লেখা রহিল খাতার মধ্যে। দলপতি অপেক্ষা অন্য লোকে দলকে ভাল-বাসে, দলের লোকের সুখবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইহাও লেখা রহিল। খাতাখানি সিন্দুকে পড়িয়া থাকিবে, আমরা চলিয়া যাইব. ইহার পর ভবিষ্যতে সেই সিন্দুক লোকে খুলিয়া খাতা দেখিবে ; দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিবে যে, এত বড় কারবার, এত বড় মহাজনের ব্যবসায়,

শেষে দেনা হইল? ২৫ বৎসরের সাধনে দু'পয়সার ক্ষমা উপার্জ্জন হয় না? তবে আর ধর্ম্মের কারবার করিব না, আর ধ্যান উপাসনা করিব না, আর ধর্ম্মের দল করিব না। হরি, তবে আর কেহ দল করিবে না। হরিনামে লোক্‌সান্? আগেকার মত সকলে একা একা পাহাড়ে কিংবা অন্য অন্য স্থানে সাধন করিবে; পুরাতন বিধান রহিবে। তবে নূতন বিধানের দল আর রহিল না। ভগবান্ জাগ্রত! সব তো দেখিতেছ? আগে যা ছিল, ক্ষমা, ধ্যান, ভক্তি, উপাসনা, উৎসাহ ক্রমে ক্রমে যাইতেছে, দেখিতেছ তো? ছিল এক দৈনিক উপাসনা, তাও কি হইতেছে, দেখিতেছ তো? পরের সেবা, পরিবার মধ্যে ধর্ম্মস্থাপন সব কমিয়া যাইতেছে, দেখিতেছ তো? আর যা বাকি থাকিতেছে, বছর বছর সব ক্রমে কমে আস্‌চে। এদিকেও সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। কলম চল চল, শীঘ্র চল, সত্য কথা লিখে যাব, পৃথিবীকে ফাঁকি দেব না। লেখ লেখ, আগে যেমন ভালবাসিতাম পরস্পরকে, এখন আর বাসি না। হিসাবে যা ঠিক, তাই লিখে যাব, আমি মিথ্যা চাই না। এই দলে কি হয়েছে, আমরা সত্যকে সাক্ষী ক'রে লিখে যাব। নিজের নিজের কিছু কিছু লাভ হয়েছে। আগে যা খারাপ ছিলাম, তার চেয়ে ভাল হয়েছি। খাতার মাথায় বড় বড় অক্ষরে সকলে লিখেছেন, কারো দুই কোটি, কারো তিন কোটি লাভ হয়েছে। একথা ঠিক, ঐখানে দাঁড়ি দিয়া তার পরে লেখা হইল "দল", দলের জমা খরচ। তার নীচে কেবল লোক্‌সান, লোক্‌সান! বৃদ্ধদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রেম, চক্ষুকে হাস, মনে মনে একত্র থাকিবার ইচ্ছা নাই, বাহিরে কেবল দেখান। আগে সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে ছেলেদের নৃত্য, পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছা ভালবাসা। নিজসম্বন্ধে সকলে জিতেছেন, কিন্তু দলসম্বন্ধে সকলের লোক্‌সান হ'য়েছে। হে ভগবান্, দয়া কর, সন্ধ্যা না হইতে হইতে যদি উপরের চেয়েও নীচেকার ব্যাপারে

লাভ না হয়, তবে বড় দুর্ভাগ্য। মা, তুমি যে ঢের টাকা দিয়াছিলে বাণিজ্য করিবার জন্য। শেষে এমন দুর্ভাগ্য, এত দেনা? দীননাথ, কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে সন্ধ্যার সময়, যখন ভয়ের সময়, তাহার পূর্ব্বে শীঘ্র শীঘ্র আরও কারবার করিয়া, পরলোকে যাবার পূর্ব্বে দেনা শোধ করিয়া, খুব লাভের বন্দোবস্ত করিয়া, শান্তিনিকেতনে চলিয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিধানের মানুষে বিশ্বাস

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২রা চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, বুঝাইতে গেলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে না; যারা তোমার আদেশে এই ব্রতে ব্রতী হইয়া লোককে বুঝাইতে যায়, তাহারাই লোকের কাছে অন্ধকারের মত হয়। হে হরি, কি হইবে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে, যদি প্রাণ থাকিতে থাকিতে এক জন মানুষের আচার ব্যবহার সকলের নিকট বিদেশীয়ের ন্যায় হয়? হয় তো কম বুঝাইলে ভাল হইত। হে পিতঃ, খুব বড় বড় সকল সংবাদ দিলে প্রচার করিতে, লোক তাহা বুঝিতে পারিল না। উপায় কি নাই বুঝিবার? বেদ বেদান্ত বুঝা যায়, একজন সামান্য মানুষের কথা, যা রোজ রোজ বলিতেছি, কেহ কি বুঝিতে পারিবে না? তবে ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার মধ্যে সমুদ্র বাড়িতে লাগিল, এ পারে আমি, ও পারে তাঁহারা রহিলেন। ভবিষ্যতে তাহা হইলে আর আশা হয় না। বরং শান্তি আরাম বর্ত্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে অন্ধকার। আপনার লোক খুন পর্য্যন্ত

করেছে, ধর্ম্মসম্প্রদায় অতি দুশ্চরিত্র হ'য়ে গিয়াছে, প্রবর্ত্তকের মতে চলা দূরে থাকুক ; কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ, আর কোথায় এখনকার বৈষ্ণবেরা ! কোথায় মহর্ষি ঈশা, আর কোথায় তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ! তাই বলি, ভবিষ্যতের দিকে দেখিলে আশা হয় না। কেন বুঝিল না লোকে ? ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কথা নাই। কারণ, এই প্রকারই হইয়া থাকে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি চামার, কিন্তু একই ব্যবসায়। তাই বুঝিয়াছি, এই রকমই হইয়া থাকে। জীবন থাকিতে—ভূতকালে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও বুঝিবার আশা নাই। অনেকে আগে ভাই বলিতেন, এখন বলেন না, বিশ্বাস করেন না। বলেন নেতা ? তাও নয়, কেন না সকল সময় ইঁহার মতে চলিলে ভাল হয় না। বন্ধু ? ঠিক তাও নয়, কেন না রোগ শোকের সময় তেমন সহানুভূতি দেন না। ঠিক কিছু এমন নাম নাই, যা দেওয়া যায় ইঁহাকে। ঠাকুর, তাই ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে যাচ্চি, ভক্তদের নিকট হইতে স'রে যাচ্চি। যত দিন যাইবে, বিশ্বাস না করিবার কারণ বাড়িবেই বাড়িবে। যখন গোড়া খেয়ে গেল পোকাতে, তখন যে গাছ ক্রমে ক্রমে নুইয়ে যাবে, তার আর সন্দেহ কি ? ধর্ম্মরাজ্যে এ কথাটা বড় শক্ত যে, যদি কোন দলপতিকে কেহ দূরে রেখে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তবে তার পক্ষে শয়তানবৎ। বাপ মাকে ভালবাসা, স্ত্রীপুত্রকে অন্ন দেওয়া, এ সকলে কিছু দেবভাব প্রকাশ পাইল না। কিন্তু ধন্য সে, যে বলিতে পারে, আত্মার প্রাণ পেয়েছি যাঁ হ'তে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়েও ভালবাসি। প্রাণনাথ, যাঁর কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখেছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে ; তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা, এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা দরকার নাই ; কেবল এই কথাটা

যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা একজনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূলে। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে একজনের ইসারা। মার হাসির রহস্য একজনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানী হয়েছে। সত্য সত্য কি সে বাড়ী ক'রে দেয় নি, বন্ধু হয় নাই ? সেই সব দিয়েছে যে, প্রাণ দিয়েছে। সে এক সময় ছেলে হ'য়ে কাছে এয়েছে, মা হ'য়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হ'য়ে এয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়। সে যে প্রাণ দিয়াছে সকলের জন্য। সেই লোকটা আমি। যদিও সে আমি, আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি ; আমি বলি, তাকে বিশ্বাস করা উচিত। ঠাকুর, আনন্দের রাস্তা, বিশ্বাসের রাস্তা আমরা যেন ধরিতে পারি। বন্ধুকে আমরা যেন অবিশ্বাস না করি। সে মানুষকে যদি না ভালবাসি, যে মানুষ তোমার কথা শুনিয়েছে, তোমার পথ দেখিয়েছে, তবে তুমি যে নিরাকার অদৃশ্য ভগবান্, তোমাকে যে ইঁহারা ভালবাসেন, সে কথা আমি কেমন ক'রে বিশ্বাস করিব ? মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এখনই খুব বিশ্বাসী হই, যেখানে প্রাণের রত্ন সকল পাইয়াছি, সেখানে খুব বিশ্বাস রাখিয়া এবং পূর্ণ প্রেমিক হইয়া, তোমার শান্তির রাজ্যে গিয়া সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানপ্রবর্ত্তকে বিশ্বাস

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, কি কি পাপ করিলে আমাদের নরক হইতে পারে, কৃপা করিয়া বলিয়া দাও তুমি। কতকগুলি কাজ আছে, যা করিলে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইতে হয়, অপমানিত, জাতিচ্যুত হইতে হয়। আমরা তোমার সার সার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ভাবি যে, সামান্য দোষ ত্রুটি করিয়াছি। কি কি দোষ করিলে ধর্ম্মের মূলে কুঠার মারা হয় ? আমাদের পক্ষে বড় বড় দোষ পাপ কি, নরক কোন্ পাপে, কৃপা ক'রে ব'লে দাও। নরহত্যা, ব্যভিচার এ সব মনে হ'লে যেমন ভয়ানক পাপ মনে হয়, সেরূপ কোন্ কোন্ দোষ। আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আস্‌চে, তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতঃ, নরকের উপযুক্ত হই কি না ? বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, বিধানবিশ্বাসে যদি ত্রুটি হয়, যে প্রণালী দিয়া বিধান আস্‌চে তাতে যদি অবিশ্বাস অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল। তোমার আদেশে আদিষ্ট হ'য়ে যে নববিধান প্রচার করিবে, তার আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য। তোমার বিধি পালন করাই তো এবার আমাদের পরিত্রাণ। তবে, নাথ, যে প্রণালী দিয়া বিধি আসিতেছে, তাহা ষোল আনা মানিতে হইবে। বিধানবাদী যদি বিধান না মানিলেন, তার সঙ্গে যদি আর পাঁচটা মত মিশাইলেন, লবণের লবণত্ব যদি না রহিল, তবে আর কি হইল ? এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত না লইয়া, তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলাম, তা হ'লে কেবল ত্রুটি হইল না, ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল, ভয়ানক অবিশ্বাস হইল। এখানকার কথা ষোল আনা লইতে হইবে।

এর ভিতর বুদ্ধির খেলা নাই। বাদ দেওয়া হইতে পারে না। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট ক'রে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতেই হইবে। এ তো বড় অহঙ্কারের কথা যে, আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হ'বে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। এ জন্য ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়। এঁরা বলেন, এ সামান্য ত্রুটি; কিন্তু আমি বলি, এ ভয়ানক পাপ। আমি বলি, এরা বিশ্বাস করিল না, হিন্দু বলিয়া মুসলমানের কোরাণের মতে চলিল, শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবের মতে চলিল, তা হ'লে ভয়ানক কপটতা হইল—অবিশ্বাস হইল। এ জন্য, ভগবান্, এই চিন্তা মনে কষ্ট দেয় যে, তবে কি পঁচিশ বৎসরের পর নরকে যাবার পাপ আমরা করিতেছি? প্রেমসিন্ধো, তুমি বলিতেছ, "আমি অবিশ্বাসীকে তো ক্ষমা করি না, আমি পাপীকে ক্ষমা করি; আমি দুরন্ত পাপীকে বুকে করি, কিন্তু অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করি না।" বুঝিতে হইবে, এ জায়গা তো ক্ষমার নহে। এ যদি কেহ বলে, বিশেষ বিধানশাস্ত্র নাই, দলপতি নাই, এখানে ক্ষমা কিরূপে হ'বে? তা হ'লে কি হইল আমাদের দলের অবস্থা? নরকের দরজা বন্ধ হ'বে কিরূপে? একবার যদি বিধান মানা যায়, ষোল আনা সেখান হইতে লইতেই হইবে। তোমার স্বর্গের হুকুম জারি ক'টা লোক করিতে পারে? সে হুকুম না মানা, আর ঈশ্বর নাই বলা, এক। পূর্ণ বিধি যা প্রচার করা হইল, তা যদি কেহ না নিয়ে থাকেন, দলপতির কথা কেহ যদি অগ্রাহ্য ক'রে থাকেন সেই বিধিসম্বন্ধে, তা হ'লে আমার একটু সন্দেহ নাই, তাঁদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন, এটা নিশ্চয়। আমাকে মূর্খ জেনে, পাপী জেনেও, আসল বিধির জায়গা যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এঁরা

বিশ্বাস করেন কি না? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, এঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি না? যদি পারেন, তাকে বলি বিশ্বাস। হে হরি, অবিশ্বাসকে বড় ভয় করি, ও ভূত প্রেত। বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় স্বর্গরাজ্য আসিবে। হে দয়াসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের রথে চ'ড়ে স্বর্গে যেতে পারি, এবং ষোল আনা বিধি পালন ক'রে, বিশ্বাসীদের মধ্যে দাঁড়াতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাইকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসা

(কমলকুটীর, শনিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১৭ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, এবার ব্রহ্মাণ্ড খুব স্বর্গের নিকট এয়েচে, তাই তোমাকে আমরা পেয়েছি। এবার লক্ষ্মী ঠাকরুণ খুব পৃথিবীতে এলেন, তাই আমরা তাঁকে বাড়ীতে এনেছি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে দেখা শুনা যেমন ঠিক ব্যাপার, ধর্ম্মের সকল বিষয়ে তেমনি ঠিক কি হয়েছে? হরি, যে সাকার মানুষকে ভাল না বাসে, সে কি কখন নিরাকার তোমাকে ভালবাসিতে পারে? বল, মা, উত্তর দাও। সে কি অনুমান ক'রে, কল্পনা ক'রে তোমাকে ভালবাসা, না, সত্য সত্য তোমার শুদ্ধ সত্যস্বরূপকে ভালবাসা? তার পরীক্ষা করিব। যদি তোমার প্রেরিতকে, ভাইকে ভালবাসিতে পারি, তবে জানিব, নিরাকার মাকে না দেখেও ভালবাসা যায়। ভগবতি, তুমি আড়াল থেকে দাবার চাল চাল্‌চ। একটা চাল চেলেছ, একটা লোককে দলের মধ্যে ফেলে দিয়াছ, পরীক্ষা করিবার জন্য

যে, তাকে সকলে প্রেম করে কি না, ভালবাসিতে পারে কি না। রোজ দেখিতেছ যে, এই যে লোককে ওরা দেখ্‌তে পাচ্চে, তাকে ভালবাস্‌তে পাচ্চে, কি না পেরে কেবল নিরাকারা তোমাকে রোজ সকালে মিছামিছি ডাকে। তুমি কি নিঃসন্দেহ হয়েছ যে, এরা যখন যাদের দেখ্‌চে, তাদের ভালবাসে, তখন তোমাকেও প্রেম করে? তোমার তো সন্দেহ যায় নাই। তুমি যখন দেখ্‌চ যে, সাকার ভাইদের যখন এরা ভালবাসিতে, বিশ্বাস করিতে পারে না, তখন, মা, তোমাকে না দেখিতে পাইয়া, কেমন ক'রে প্রেম বিশ্বাস দিতে পারিবে। হরি, এ রকম ক'রে যদি পরীক্ষা কর, আমরা নিশ্চয়ই হেরে যাব। একটা লোক, যার জীবন দেখ্‌চি, কাজ দেখ্‌চি, কিন্তু তার উপর দলের বন্ধু ব'লে বিশ্বাস করিতে পারি না, নির্ভর করিতে পারি না। হে ঈশ্বর, স্থায়ী বিশ্বাস, প্রগাঢ় প্রেম আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। ঠাকুর, তুমিই তো সাধুদের দ্বারা বলাইয়াছ যে, দৃষ্ট হইয়াছে যে ভাই, তাকে যে প্রেম না করে, অদৃশ্য মাকে সে কিরূপে ভালবাসিবে? আমরা তো পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি না; আর যে ভাইয়ের নিকট ধর্ম্মের মূল মন্ত্র পেয়েছি, তার প্রতিও তো তেমন ভাব হ'লো না। তবে কি হইল, হরি? আমাদের প্রেম সরল ক'রে দাও, আমাদের অনুরাগ যথার্থ ক'রে দাও। ভাইদের আদর করি, ভালবাসি এই জন্য যে, ভাইকে ভালবেসে মাকে ভালবাসিতে পারিব। তুমি ব'লেছ যে, "আগে পৃথিবীতে গিয়ে যে ভাইকে দেখা যায়, তাকে ভালবেসে এস, তার পর আমাকে ডাকিও। ভাইদের কাছে সুখ্যাতি-পত্র না পাইলে, আমি দরজায় প্রবেশও করিতে দিব না। ছেলের ব্যবহার বিশ্বাস করি না, পরীক্ষা না ক'রে। বলি যে, তুই পৃথিবীতে যা, ভাইদের কাছ থেকে সুখ্যাতি-পত্র নিয়ে আয়, তার পর আমি মানিব যে, আমাকে ভালবাসিস্।" ভাইকে ভালবাসিতে পার না, আর এত বড়

ব্রহ্মাণ্ডপতি নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় দেবতা, বেদ বেদান্ত যাঁকে পায় না, তাঁকে ভালবাস, এত বড় ক্ষমতা তোমার? মিথ্যা কথা। মা বলেন, "মিথ্যা কথা। আমার ছেলেকে ভালবাস না, আর আমাকে ভালবাস? আমার ছেলেরা তোমার কাছে রয়েছে, তাদের দেখ্‌চ, তাদের ভালবাসিতে পার না, আর আকাশে শূন্যে এসে মিথ্যা বকিতেছ!" দয়াময়, দয়া কর, ভাই যে সাকার, তাকে প্রেম দি, আর তার হাতে কলম দি, দিয়ে বলি— প্রাণের ভাই, লিখে দে যে, আমি তোকে ভালবাসি, নতুবা ঈশ্বর দরজা বন্ধ করেছেন, ঘরে যাইতে দিবেন না। ভাই লিখে না দিলে, আমি যাইতে পারিব না। হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ভাই বন্ধুদিগকে প্রণয় ভালবাসা অনুরাগ দিয়া, যথার্থ প্রেম দিয়া, তোমাকে ভালবাসিতে শিখি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশ্বরে শান্তিলাভ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই চৈত্র, ১৮০৪ শক;
১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ঠাকুর, তুমি কল্পতরু, তোমার গাছে সর্ব্বদাই ফল ফলে। তোমার পাতা শুকায় কই। পঁচিশ বৎসর দেখ্‌চি, এক দিনের তরে তুমি ফল-বিহীন তরু হ'লে না। আমার ভগবান্, তুমি কল্পতরু, ফলগুলি পেকে আছেই আছে, রসে ভরা। এই ভগবান্‌কে যদি সকল ভাই বন্ধু পূজা করিতে পারেন, পৃথিবীতে বড় আনন্দের দিন আসিবে। হে হরি, মনোহর শোভা! এমন সুখের হরি পেয়েছি যে, তাতে মনের সাধ মিটে গেল, আর কেউ কিছু দিক্, না দিক্। কত ফল গাছে! যত রকম

ফুল আছে, পাওয়া যায়। এই রকম দেবতাকে বলি, যথার্থ দেবতা। আমার ভগবানের গাছে পাকা ফল ফলেই আছে। অন্য ফলের সময় আছে বিশেষ বিশেষ, আমাদের নববিধানের তা নয়। কেউ খুব রাগিয়েছে, খুব কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু বাগান আলো ক'রে ফুল ফুটেই রয়েছে, ফল পেকেই রয়েছে। উপাসনার বাগান কিছুতেই শুকায় না। তরুণ দেবতা, চিরযুবা ঈশ্বর, চিরপ্রস্ফুটিত গোলাপ, সকলের হও। মা আনন্দময়ি, সকলের হও। হে দয়াসিন্ধো, তুমি থাকিতে কেন পৃথিবীতে লোকে কষ্ট পাইবে? সুখে থাকিবে, সব জাতি এক হ'বে, মানুষগুলো কেন ঝগড়া করে তুমি থাকিতে? মা, এমন শান্তির সময়ে, ঐ দেখ তোমার একটা সাধু ছেলেকে * জেলে পূ'রে নাকাল কচ্চে কেন? ধর্ম্ম কাঁদচে, ঈশা কাঁদচেন যে, আমার ধর্ম্মকে, আমার ছেলেকে এমন অনাদর কেন? হে পরমেশ্বর, কেন দুঃখ আসে পৃথিবীতে? ভক্তেরা কেন কষ্ট পান? তোমার সুখের ধর্ম্ম লউক সকলে। হে প্রেমময়ি, তোমার ছেলে ঈশা কি ক'রে গেলেন, আর কি হ'লো, দেখ একবার। এই পৃথিবীচিড়িয়াখানায় বাঘ ভাল্লুক ঢের, নানা রকম হিংস্র জন্তু। পিতঃ, আমরা ক'জন কত সুখে এখানে রয়েছি, আর তোমার সেই ছেলে জেলে প'ড়ে রয়েছেন। আমরা বলি, আমাদের আবার দুঃখ, ভগবান্! ও ভাইটি কেন কষ্ট পাবে? কেন ইংরাজ মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে মিলে ঝগড়া করিবে? তোমার ধর্ম্ম সকলে গ্রহণ করুক না? তুমি কল্পতরু, তোমাকে সকলে পূজা করুক না? মা, শান্তিজল এনে দাও। আর আগুন যেন জ্বলে না পৃথিবীতে। দাও, মা, শান্তিজল ঢেলে দাও, যেখানে তোমার সব ভক্তগণ কষ্ট পাচ্চেন, সেখানে শান্তি দাও, মারামারি অসুখ বন্ধ কর, সুখের রাজ্য আন। হে দয়াময়, কৃপাসিন্ধো, কৃপা ক'রে

---

* সালবেশন আরমীর মেজর টকার।

আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, কষ্টের কারণ যা কিছু ছেড়ে দি, অশান্তি দূর করি, করিয়া, আনন্দময়ী জননি, তোমার চরণে চিরকালের জন্য শান্তি লাভ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুক্ত অবস্থা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ঙ্কাল, রবিবার, ৫ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ; ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে দ্বিজদিগের হৃদয়ভূষণ, এই লোকেরা ক্রমাগত সংসারের বোঝা বহন করিয়া কর্ম্ম সাধন করিতেছে, সংসারের পথে বহু চেষ্টায় পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছে, স্বর্গের নূতন জীবনের কথা শুনিয়া ইহারা অবসন্ন হইবে। চলে এসে শুনিলাম, এ স্বর্গের পথ নয়। রৌদ্রের কষ্ট, বৃষ্টির কষ্ট পাইয়া আসিলাম, এখন দুই চারিটা ভাই বন্ধু বলিতেছে, এ পথে চলিও না, এ পথে স্বর্গরাজ্য পাইবে না। কোন্ দিকে সে রাস্তা? যে দিকে ঈশা গৌরাঙ্গ চলিয়াছিলেন? জিজ্ঞাসা করিল তোমার ঈশাকে, তোমার পিতা মাতা আসিয়াছেন এখানে, একবার দেখিলে না? শুনিবা মাত্র ভাবিলেন, যেন ধর্ম্মের ক, খ, কাটা হইল; হৃদয় উত্তেজিত হইল। তিনি বলিলেন, 'কেরে মা বাপ, ভাই বন্ধু কে? আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পূর্ণ করে, সেই আমার সর্ব্বস্ব।'

প্রিয় ঈশার পদচুম্বন করিয়া বলিতেছি, হে ঈশার পিতা, সেই সুমতি পাপিষ্ঠদের অন্তরস্থ করিয়া দাও। এখনও অনেকটা টান আছে সংসারের দিকে। উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্পর্কে সম্পর্ক বোধ

হইয়াছে কি না? ঈশার লক্ষণ জীবনে দেখা গিয়াছে কি না? তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে ব্রাহ্মণত্ব কোথায় হেরিব? শুনিয়াছি, একটী পরমহংস আছেন, তাম্রখণ্ড দিলে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যায়; বোধ হয়, কে যেন আগুন দিল, কে যেন বিষ দিল; সে পরমহংস তোমার সন্তান।

আমি ত তোমার কাছে শিখিলাম, এখন পরীক্ষা কর। পৃথিবীর এক টাকা হাতে দাও, লক্ষ টাকা হাতে দাও, হয় ত সেই টাকা লইয়া আমরা অকুন্ঠিতভাবে সংসারে ব্যয় করিব। আমাদের মা বাপ কি সংসারের দোকানদার? আমরা সেই পুরাতন জায়গায় আছি? টাকা ছুঁলাম, হাত বেঁকে গেল না? হাত পুড়ে গেল না? কোথায় স্বর্গরাজ্য, আর কোথায় আমি? কবে যাব দ্বিজদের বাড়ীতে? কবে শ্রীগৌরাঙ্গের মত মত্ত হইয়া নূতন জীবনের পরিচয় দিব? এখনও পুরাতন রক্ত আছে, ধর্ম্মের কবিরাজ বলিতেছেন, এখনও পুরাতন জ্বর যায় নাই, নাড়ী গরম রহিয়াছে; ধর্ম্মবন্ধুদের দেওয়া পয়সা কম হইলে, কি দিতে বিলম্ব হইলে, ধনপিপাসা এখনও টের পাচ্চি। অহঙ্কারের গন্ধি এখনও আছে। পুরাতন জ্বর যদি থাকে, পুরাতন পাপের রক্ত আছেই। মরি বাঁচি, আর এ রক্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি না। শীঘ্র পরিত্রাণ কর। শীঘ্র পরিত্রাণ কর।

এখনও তোমাকে মা ব'লে ডাকি না? আরও মা আছে? ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ এমন ভাই, আরও অন্যকে আপনার বলি? কে রে আমার আপনার? আমার মা, তুমিই আমার আপনার; ঐ বিশ্বাসজীবীরাই ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব। হে হরি, আর পুরাতন জীবন যেন বহন করিতে না হয়; পুরাতন জীবন ঘুচাইয়া দাও। দ্বিজ হইয়া বাঁচি। আমি দেখাতে চাই, আর আমি পুরাতন লোক নই; পুরাতন লোক যে,

সে মরিয়াছে। আমার বুদ্ধি, বিশ্বাস, আশা আর এক রকমের হইয়াছে। ধর্ম্মচিকিৎসক বলিলেন, আর জ্বর নাই। নূতন জীবনের অনুভব যাহাতে শীঘ্র হয়, এই কয়টী লোকের মাথায় হাত রাখিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। করস্পর্শ করিব উপাসনার পর, আর বলিব, কোন্ দেশ হইতে আসিলে? নববৃন্দাবন হইতে বুঝি? নবকাশী হইতে আসিলে? তোমার গায়ে যে গোলাপের গন্ধ! এই নূতন সুখে সুখী হোক্ আমাদের পরিবার। দ্বিজত্বের উৎসব আমাদের হউক। মা মঙ্গলময়ি, আমরা যেন নবজীবনের আনন্দ অনুভব করিতে পারি। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি, আর যেন সংসারে মরিতে না যাই। নূতন জীবন পাইয়া, নববস্ত্র পরিধান করিয়া, স্বর্গীয় ভাই বন্ধুদের সঙ্গে যেন মিলিত হইতে পারি, এই আশা করিয়া, আমরা তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিনয়-শিক্ষা

(কমলকুটীর, সোমবার, ৬ই চৈত্র, ১৮০৪ শক;
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, এই মিনতি করি তব চরণে, যত দিন দলপতির ভার থাকিবে এই হস্তে, যেন যথার্থ বিনয় থাকে। বড় হওয়া বড় খারাপ, মানুষ প্রলোভন সামলাইতে পারে না। যশের মত শয়তান আর কি আছে? এই জন্য তব চরণে প্রার্থনা করি, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, গরিব হইয়া থাকিতে পারি যেন তব পদপ্রান্তে। আমার ভয় হয় যে, আমার এই পার্শ্বস্থ লোকেরা খুব বড় হইয়াছেন, আরও বড় হইতে

পারেন, ইঁহাদের যশের ইচ্ছা, উচ্চ পদের ইচ্ছা, অহঙ্কার পাছে বাড়িয়া না যায়। ধর্ম্মের সঙ্গে যেন সংসারের অহঙ্কারের একটু মিশাল হয়েছে, সেই জন্য ফন্দি ক'রে নাটক সৃষ্টি করেছ, আমাদের কেশ ধ'রে বড় লোকের বাড়ী নিয়ে যাও। বড় মানুষদের বাড়ীতে যেখানে যাত্রাওয়ালারা বসে, ঠিক সেখানে আমাদের বসাও। মনের অহঙ্কারটুকু, হে দর্পহারী, তোমার প্রসাদে ক'মে যাক্। তখন গালে হাত দিয়া ভাবি, পরমেশ্বর, এ কোথায় আনিলে? ধর্ম্মাচার্য্য, কত দেশ বিদেশে বক্তৃতা করেছি, উপদেশ দিয়াছি, এখন আমরা যাত্রাওয়ালা সেজে, রং মেখে, সং সেজে অভিনয় কচ্চি। তুমি এইরূপে বিনয় শিখিয়ে দাও। আমি বলি, হয়েছে ভাল। রাস্তায় রাস্তায় নগরকীর্ত্তন ক'রে বেড়ানতে ছোট হওয়া হয় না, কিন্তু বড় লোকের বাড়ীতে, যেখানে পদে পদে অপমান হবার সম্ভাবনা, চাকরেরা মনে করিলে যেখানে অপমান করিতে পারে, সেখানে তুমি বিনয় শেখাও। এ শরীরে, এ বয়সে কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে আর কি অহঙ্কার থাকিতে পারে? বড় লোকদের কাছে ধার্ম্মিকেরা কখন ছোট হয় নাই; নববিধানের দলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তুমি তাও ক'রে দিলে? মা, এতে তোমার মান বাড়িবে, আমরা তা করিব না? আমাদের আর মানের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে কাজ কি? ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা বিনয়ী— ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা নিরহঙ্কারী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। মা, যে যা করিতে বলে, করিব; হরিনাম প্রচার করিতে এমনি মত্ত হ'ব যে, কে কি অপমান করে, ভাবিব না। আমরা যাত্রাওয়ালা হ'য়ে হরিনাম গান কচ্চি তো? এই পরম আনন্দ, পরম লাভ। তবে দিন দিন এমন জায়গায় নিয়ে যাও, যেখানে গরিব হ'তে, বিনয়ী হ'তে শিখ্‌ব। পরমেশ্বর, কি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের মাথা নত ক'রে দিচ্চ। যা খুসি, তাই করিতে পারিবে আমাদের লইয়া, এই আমাদের পরম লাভ।

হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ধর্ম্মের বিনয় এবং নম্রতার ভিতর থাকিয়া, দিন দিন খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীদরবারের শাসন

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৭ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২০শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মুক্তিদাতা, যে রাজ্যে বিচার নাই সে রাজ্যে পরিত্রাণ নাই। একটা পাপও নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দেবতা বিচার করেন না, তিনি পরিত্রাণ দেন না। আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহা অতি খারাপ। ইহা অপ্রেমের দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা করিতে পারে না। এই দল মলিন অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সে বুঝিতে পারে, একটি শাসনের দড়ি গলায় রয়েছে। এখানে একটু কিছু করিলে, চুল চিরে বিচার হইবেই। তাই বলি, এই দলের এক দিক্ সোণা, এক দিক্ লোহা। স্বর্গে এর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার হ'বে। এঁরা নিজে পারুন, না পারুন, এঁরা আপনার সম্বন্ধে খুব শিথিল হ'লেও, পরের সম্বন্ধে এক চুল পাপ সহ্য করিতে পারেন না। পরমেশ্বর, এঁদের বিচার আরও সূক্ষ্ম হউক। কিন্তু এঁদের অন্যের সম্বন্ধে এত বিচার, আপনাদের সম্বন্ধে শিথিল কেন হ'বেন? মা তারিণি, যাঁরা পরকে এমন ক'রে বিচার করেন, তাঁরা যেন আপনাদিগের সম্বন্ধে ভাল ক'রে বিচার করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে আজ আমি অধিক কিছু বলিব না, আজ এই বলি, এঁদের শাসন

আরও প্রবল কর। একটা মিথ্যা কথা, একটু উপাসনাতে অমনোযোগ দেখিলে, সকলে যেন শাসন করেন। দেবি, তুমি স্বয়ং এঁদের ভিতর থেকে বিচার কর, নতুবা যে আপনাদিগকে বিচার করিতে পারে না, তার সাধ্য কি যে পরকে বিচার করে। একজন কেবল শাসন করিতে পারেন, গালাগালি দিতে পারেন, যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত্তা। এজন্য তুমি দলটিকে এমনি কৌশল ক'রে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর দু'জন একজন গালাগালি দিবেই। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা? মা, তোমার এত দয়া আমাদের প্রতি? শাসন করিবার জন্য এমন কৌশল ক'রে রেখেছ? মা, এ দলে যখন আমি আছি, তখন বিলাসী কখন হ'তে পারিব না। ধন্য ধন্য দয়াবান্ বিচারপতি, এমন চমৎকার দলের ভিতর আমাদিগকে রেখেছ যে, একজন সাধু ব'লে সুখ্যাতিপত্র পান না! আমি বেঁচেছি তোষামোদে দলের হাত থেকে। এই দলে বিচারিত হ'য়ে যে স্বর্গে উঠিবে, ঈশাও তার একটি পাপ দেখিতে পাইবেন না। কলিকাতায় থাকা, এই দলের মধ্যে থাকা, আগুনের মধ্যে থাকা। এই দলের কাছে যে সাধু ব'লে প্রতিপন্ন হ'বে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, ঈশা মুষাও তাকে সাধু বলিবেন। ২৫ বৎসর কেটে গেল, এখনও আমরা কেউ এই দলের মধ্যে সুখ্যাতি পাইলাম না। এর ভিতর কেউ নিষ্কাম নয়, কেউ নিঃস্বার্থ নয়, কেউ তেমন ধ্যানশীল নয়। ইহা মঙ্গলের ব্যাপার। কোটী কোটী বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে। কেন না দেবতা বিচার করেন ইঁহাদের ভিতর থাকিয়া, দেবতা শাসন করেন ইঁহাদের দ্বারা। মা, আমরা যেন এই শাসনের ভয়ে, ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া চলি, আর শুদ্ধ হই। দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর। তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত। তোমার ভিতর দেবতা কথা ক'ন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা

করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এই দৈনিক বিচার এবং শাসনের ভিতর থাকিয়া, ক্রমে শুদ্ধ ও সুখী হই এবং তোমার নিকটে পরিত্রাণ লাভ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধর্ম্মে অলৌকিক বিশ্বাস

(কমলকুটীর, বুধবার, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২১শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হরি, আমরা তোমার ধর্ম্মকে ঠিক বিশ্বাস করি না, ইহার যুক্তি আছে, আমরা যে পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে, প্রেমসম্বন্ধে বিশ্বাস করি না। এ অবিশ্বাস কি আমরা মানুষকে করি, না, ধর্ম্মকে করি? আমরা বলি যে, আমরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি না; মানুষকে অবিশ্বাস করি বলিয়া, যে আমরা নববিধানকে অবিশ্বাস করি, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি না, তাহা নয়। কিন্তু, ঠাকুর, আমি ইহার উত্তর এই দিচ্চি যে, বিচারপতি, তোমার আদালতের সম্মুখে এ কথা গ্রাহ্য নয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মানুষদিগকে অবিশ্বাস করা, আর ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করা একই। পাঁচিশ বৎসর সাধনের পর, পরস্পরের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাদের অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস! এ তো মানুষকে অশ্রদ্ধা নয় এ ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা! আমরা সামান্য বিষয়েই সামান্য কারণে পরস্পরকে অস্বীকার অবিশ্বাস এখনো করি। বিশ্বাস কম, তাই টাকা কড়ি তালুক মুলুক দিয়া বিশ্বাস হয় না। এঁদের আমরা আচার্য্য প্রেরিত ব'লে থাকি, কিন্তু এ দিকে দু'পয়সা দিয়ে বিশ্বাস হয় না। এঁরা শঠ নন, প্রবঞ্চক নন, এটুকু বিশ্বাসও নাই। পরমেশ্বর, দেখ একবার ভিতরের ব্যাপারটা

কি ভয়ানক! ধর্ম্মকে এত অবিশ্বাস? নববিধান কি পাপ দূর করিতে পারে? নববিধান একটু মিষ্ট উপাসনা গান করিতে পারে; নববিধান কি ভাইয়ের শরীর থেকে পাপের দাগ দূর করিতে পারে? নববিধান কখন দয়া শেখাতে পারে না। আমরা মনে করি না, আমরা বিপদে পড়িলে কেউ সহায় হ'বেন, রোগ হইলে কেহ ঔষধ দিবেন, নববিধান দয়া করাইতে পারিবেন। উপাসনা সকলে ক'রে থাকে, কিন্তু তাতে কারো কিছু হ'বে না। কেউ একজন বলুক দেখি যে, আজ যদি আমি খুব ভাল ক'রে উপাসনা করি, কাল সে আমায় সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবে? স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হ'বে? তা পারে না, মা, তোমার ধর্ম্মকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে যে এঁরা খুব সৎ থাকিবেন, তা বিশ্বাস হয় না। এঁরা যে অঙ্গীকার ক'রে তা পালন করিবেন, তা বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্ম মানুষকে ভাল করিতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না; তবে আর তোমার নববিধানের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কৈ রহিল? তবে এমন ধর্ম্ম চাই না। তুমি না ব'লেছিলে, কাণাকে দেখাবে, পঙ্গুকে চলিবার শক্তি দিবে? কে পারিলে, এই আমরা বলি। মা, অলৌকিক ধর্ম্মের প্রতি অলৌকিক বিশ্বাস দাও, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতে দাও। পরস্পরের স্ত্রী পরিবারের ভার লইতে পারি, দায়িত্ব লইতে পারি টাকা কড়ি সম্বন্ধে,—পৃথিবীর নীচ লোকেরাও যা করে,—এটুকু বিশ্বাসও হয় না? ধর্ম্ম মানুষকে ভাল করিতে পারে, এটুকু বিশ্বাস করিতে পারি না। মা, বিশ্বাস কোথায় গেল? ভাইকে বিশ্বাস করিলাম না, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিলাম না। শেষে ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিলাম! হে মাতঃ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ বিশ্বাস উপার্জ্জন করিয়া, তরিয়া যাইতে পারি। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অচ্ছেদ্য বন্ধন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২২শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে পাপীর গতি, তুমি জান, কি প্রকারে বিশ্বাসীকে ধরিয়া রাখিতে হয়। আমি জানি না, কিরূপে বিশ্বাসীর ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে হয়। তোমার যোগ আমাদের সঙ্গে অতি নিগূঢ়, আমাদের যোগ তোমার সঙ্গে অতি ছাই। আমি তোমাকে ধরি যে, এটা কোন কাজের নয়, অসার রকম। কতকগুলি পচা দড়ি দিয়ে তোমাকে জীবনের সঙ্গে বাঁধি। সংসারের দড়িতে কথন ভগবান্‌কে বাঁধা যায়? কিন্তু, ভগবান্, তোমার তরফের যোগটা বড় চমৎকার রকম। কোন্ খানটা ধরেছ, কিছুই বুঝিতে পারি না,—কি রকম যোগ, কিছুই বুঝিতে পারি না; কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, একজন আমাদের ভিতর এমনি ক'রে ধ'রে আছেন যে, কিছুতে তাঁকে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার গ্রন্থি কোন্ জায়গায়, সেই জায়গাটাই আমি দেখিতে পাই না। কোন মতেই সেই বন্ধন খুলিতে পারি না। কোন্ খানটায় সেই বাঁধন, তাহা বুঝিতে পারি না। মা জননি, তোমাকে শোবার ঘর থেকে তাড়াতে পারিলাম না। খাবার ঘরে গেলাম, বাসনে পিঁড়িতে খাবারে এমনি ক'রে আছ, কিছুতে তাড়াতে পারিলাম না। এমনি ক'রে কাপড়ে চোপড়ে বিছানায় খাবারে জলে টাকাকড়িতে আছ, যে কিছুতে তোমাকে তাড়াতে পারি না। রক্ত ব্রহ্মময়, শরীর ব্রহ্মময়, এমনি ক'রে ধরেছ যে, কিছুতে পালিয়ে যেতে পারি না। বুকের ভিতরে হরি। বরং প্রাণটা ছাড়া যায়, ভগবান্, তোমাকে ছাড়া যায় না। কিন্তু, প্রাণনাথ, তোমার যে যোগ দু'দিকে কেন হয় না? এদিকে ওদিকে

দু'দিকে কেন হয় না? এমনি ক'রে শরীরে থাকিবে যে, আমি মনে করিলেও, তোমাকে দূর করিতে পারিব না। তুমি এমন ক'রে রক্তের সঙ্গে মিশেছ যে, কারও সাধ্য নাই, তোমাকে বাহির করিয়া দেয়; আমি তো কিছুতেই পারি না। এমনি করিয়া প্রাণে থাক যে, যেন কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। হে দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সহিত যে বন্ধন, তাহা যেন কিছুতেই না যায়। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃত্বে একত্ব

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০৪ শক,
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, তুমি আমাদের মিলন সম্পন্ন কর। ধর্ম্মের মিলন, জাতির মিলন, দেশের মিলন কর। সে দেবতা দেবতাই নন, সে ঈশ্বর ঈশ্বরই নন, যাঁহাতে মিলন হয় না। একের সম্পর্কে যদি দশ জন এক হয়, সেই বাপ, সেই মা। একটা সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আছে, যাহার জন্য আমরা সকলে এক পরিবার। ভ্রাতৃত্বের কারণ পিতৃত্ব, মাতৃত্ব। 'পিতা পিতা' সকলে মিলে এই কথা বলিতে বলিতে, আমরা এক হই; যদি এক না হই, তবে আমাদের পিতা এক নন। এক গর্ভধারিণী, এক প্রেমময়ী মা তুমি। তোমাকে আমরা যত দেখিব, দেখিতে দেখিতে প্রেমে মুগ্ধ হইব। তুমি যদি মিলন হইলে, পিতঃ, তাহা হইলে, যত প্রেরিত মহাপুরুষ সাধু, তাঁহারা আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহা হইলে আমরা পিতৃকুলের গৌরব রাখিব। পিতঃ, পৃথিবী এক হউক। এই

কয় দিন তোমার সন্তান ঈশাকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হইব। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে এক হউক, এক মার সংসারে সকলে স্থান লাভ করুক, এক মার বাড়ীতে সকলে বাস করুক, এক মার গৃহে সকলে এক পরিবার হউক। এই শুভ শুক্রবারের উৎসবে, তোমার সেই সাধু সুসন্তানকে স্মরণ করিয়া, সকলে এক হউক। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এক হইয়া, অনন্তকালের জন্য মিলিত হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পিতা পুত্রে একত্ব

(কমলকুটীর, শনিবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যখন মনের ভিতর যোগাসনে বসিতে যাই, তখন ঐ তোমার ঈশা ছেলেকে মনে হয়। দু'জন এক হয়ে যোগাসনে বসিলে পাপ অসম্ভব হ'বে, কামনা বাসনা থাকিবে না। অহং কৈ, আমিত্ব কৈ, যে ইচ্ছা হ'বে? আপনার আমিত্বকে বিদায় ক'রে দিয়াছিলেন ঈশা, 'ভগবান্, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা' 'তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা' বলিতে বলিতে, তোমার সঙ্গে এক হ'য়েছিলেন। 'আমি তোমাতে, তুমি আমাতে' 'আমি তোমাতে, তুমি আমাতে' বলিতে বলিতে, পাত্রের জল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে, তোমার সঙ্গে একাকার নিরাকার হ'য়ে যাই। আমি নাই, একত্ব হইল। এই ধর্ম্ম ঈশা জগতে দেখালেন। ভগবান্, তোমার ঐ সুপুত্রের মহিমা পাপী জগৎ যেন বুঝিতে পারে, এইটি তুমি ক'রে দাও। আমি তোমাতে, আমি নাই, আমাকে মেরে ফেল। আমার

হরি কেবল আছেন, আমার কামনা নাই, বাসনা নাই, হরি কেবল আছেন। মা জননি, ঈশাবৎ ক'রে দাও। তাঁর ধর্ম্মের গূঢ়ত্ব কোথায়, কিছু কিছু বুঝি। ধর্ম্মসাগরে কোথায় যে তিনি তলিয়ে গিয়াছেন, একটু একটু বুঝিতে পারি। ভগবান্, তোমার কাছে কি মন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন ? যোগ আর এর চেয়ে উচ্চ কি হ'তে পারে ? একেবারে আমি নাই! আমি উঠিতে পারি না, আমি খাই না। আমি নাই, কামনা বাসনা আর কোথা হইতে হইবে। ভগবান্, ঈশার মত ক'রে দিতে পার ? কামনাও চাই না, বাসনাও চাই না, পুণ্যও চাই না, পাপও চাই না, চাই কেবল ঈশার মত "ঈশা নাই" হইতে। সব ইচ্ছা ভগবানের হ'য়ে যাক্। ভগবান্ বই আর কিছু নাই। সঙ্গে ভগবান্, সংযুক্ত ভগবান—পৃথিবীর লোকেরা, ঈশা যা ব'লেছিলেন, তা জলে ভাসিয়ে দিয়ে, কোথা থেকে মত কতকগুলো প্রচার ক'রেছে। আমরা তোমাকে মান্য করিব। তুমি বড় একটা চমৎকার পন্থা বাহির ক'রেছ। পাপ ভেবে কি হ'বে ? ও সব নাই একেবারে! রাতারাতি আত্মাকে গঙ্গা পার ক'রে দিলে! শাঁসটা নাই, খোসা প'ড়ে রইল! হরিসন্তান, তোমার কোটি অংশের এক অংশ আমাদের দিতে পার ? মা, কেমন ক'রে আমরা তোমার নববিধান হজম ক'রে, পরিপুষ্ট সবল হ'ব, বল। ঈশা তো ও সব কিছু করেন নাই, তিনি ধর্ম্ম চিবিয়ে তো হজম করেন নাই। তিনি এই ব'লেছিলেন, ব্রহ্মের সহিত এক হ'য়ে যাওয়া,—আমাতে তুমি, তোমাতে আমি। এই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন। জীবের জীবত্ব দূর হ'য়ে যাবে, আমি তুমি হ'য়ে যাব। আমার আমি থেকে আর কাজ নাই, আর স্বতন্ত্র থেকে কাজ নাই। ব্রহ্মেতে যা তুই। এতে ঢের সুখ। আমার আমি, তুই আর স্বতন্ত্র থাকিস্ না। আমি-দস্যু বড় টানিতেছিস্, তুই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মাটী করিলি? মা, আমার আমি নাশ কর।

আমি যা'ক তবে। আমিকে বলিদান করি, সব চুকে গেল। দয়াময়, কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিনাশ করিয়া, যেন ঈশার পথ ধরিয়া, পিতা পুত্রে এক হ'য়ে যেতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইন্দ্রজালে মুগ্ধতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই চৈত্র ১৮০৪ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, সত্য দিয়া তুমি সাধু যোগীদিগের জীবনকে আপনার চরণের সঙ্গে বাঁধিয়াছ, যুগে যুগে। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নববিধানে নাট্যভূমি সাজাইয়া, ভক্তদের প্রাণ হরণ করিলে। মিছা ছায়াবাজি করিয়া, ভেল্কী করিয়া প্রাণ হরণ করিলে। তুমি খড় বিচালি দিয়া 'টাকা সোনা' ব'লে আমাদের ভুলাইতে পার। শেষটা রঙ্গভূমিকে যাতুঘর করিয়া ফেলিলে? হে হরি, এই কথা মনে থাকিবে চিরকাল যে, ফাঁক দিয়া হরি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া গেলেন। আগেকার ঈশা মুষার সময় অলৌকিক, কিন্তু অলীক নয়; এ যে অলৌকিক, কিন্তু অলীক। মিছামিছি সব মিথ্যা দিয়ে লইয়া গেলে। মা, ফাঁকি দিয়ে নববৃন্দাবনে লইয়া চলিলে। একটা পায়রা উড়াইলে, মিছামিছি, কি খবর আনিল কপোত স্বর্গ হইতে? পবিত্রাত্মা জীবিত, তার সাক্ষী নববৃন্দাবনের নাট্যাভিনয়। মা, ফাঁকি দিয়ে প্রাণটা কেড়ে নিলে?. এতে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বাড়্চে। মা, তোমার এমন ক্ষমতা? কিছু না দিয়ে প্রাণ হরণ করিলে? টাকা দেবে না, পয়সা দেবে না, কন্যাকার জন্য ভাবিতে দিবে না, অথচ

প্রাণ হরণ করিলে। আয়, ব্রহ্মের ভেল্কী আয়, স্বর্গের কপোত আয়। মা, কল্যকার ব্যাপারে এই হউক যে, সকলের বুকে কপোত থাকুক। জীব উদ্ধার হ'য়ে যাক্, সকলের পরিত্রাণ হউক। রঙ্গভূমি ধন্য হইল এত দিনে। ইন্দ্রজালে পরিত্রাণ হউক। তোমার পবিত্রাত্মা বুকে থাকুন সকলের। সোণার পাখী, বুকে আয়, সোণার কপোত, তোকে বুকে ধরি। হরি, ফাঁকি দিয়ে এই যে রঙ্গভূমি সাজিয়ে আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইলে, এ বড় ভয়ানক! মিছামিছি দু'টো বাঁশের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে সব কচ্চ? রথ নাবালে, পাপপুরুষ আনিলে, ইন্দ্রজাল দেখালে। হে দয়াময়, কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চিরকাল তোমার মায়া ইন্দ্রজালে জড়িত হ'য়ে থেকে, খুব মুগ্ধ হ'য়ে থাকি এবং শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যাদেশ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ঙ্কাল, রবিবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে প্রত্যাদিষ্টদের একমাত্র সদ্গুরু, তোমার কৃপাতে আমরা ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হইব, পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গের আস্বাদন পাইব, এই আশা করিয়াছি। ইহা কেবল প্রত্যাদেশের অবস্থাতেই হইবে। নিজের চেষ্টায় যে ধর্ম্ম বা উপাসনা করি, তাহাতে অহঙ্কার হইতে পারে; সেটুকু সার মনে হয় না, অধিক মূল্যের মনে করিতে পারি না। সাধুদের জীবনের কথা শুনিয়াছি, কেমন অনায়াসে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই সাধু সন্তান বলিলেন, "পাপ, দূর হ", অমনই পাপ চলিয়া গেল।

আর আমরা পাপ তাড়াইবার জন্য এত কাঁদিতেছি, তবু পাপ যায় না। আমরা ত সেই বংশের সন্তান ; আমাদের কেন তেমন হয় না ? এক হুঙ্কারে আমরা পাপকে তাড়াইয়া দিব। এখন যে কথা শুনিলাম, এ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই যে প্রত্যাদেশ পাইয়াছি। পাইয়াও প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করিয়াছি। তোমার প্রত্যক্ষ কৃপায় যখন পাপ দমন করিয়াছি, তখনও বলিয়াছি, আমি করিলাম। দেখ, হে ভগবান্, যাহারা প্রত্যাদেশ পাইল না, তাহারা কত দুর্ভাগা ; আর যাহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াও মানিল না, তাহারা আরও দুর্ভাগা।

প্রত্যাদিষ্ট জীবের রক্তে দেবতারা সঞ্চারিত। সে অবস্থায় যে সুখ, যদি সর্ষপকণা পরিমাণে তাহা আমাদিগকে দান কর, কৃতার্থ হইয়া যাই। এই দলটী তোমার অনেক দিনের আশ্রিত। শুনিলাম, প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। বন্ধুরা মানিলেন না ; ভাইয়েরা মানিলেন না। যদি মানিতেন, আরও কত প্রত্যাদেশ হইত। না মানিয়া আর পাইলেন না। নূতন বাইবেল প্রস্তুত হইত, তাহা আরম্ভ হইতেছে না। প্রত্যাদেশ! প্রত্যাদেশ! কপোতরূপে আবার এস। বুদ্ধির অভিমানে পৃথিবী গেল ; আবার আসিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ কর। নিদ্রিত ভগবান্, অচেতন ভগবান্ সমুদ্রে ভাসিতেছেন ; থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি ? যিনি অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ দেন, আমরা সেই ভগবান্‌কে মানি। হে প্রজ্বলিত হুতাশন, দর্শন দাও, দর্শন দাও। উড়িব প্রত্যাদেশের আকাশে। ধর্ম্মবিজয় হইবে।

হে ঈশ্বর, হে জগতের সিদ্ধিদাতা, মুক্তিদাতা, আর একবার তোমার আশ্রিত জীবকে উদ্ধার কর। রসনার ভিতর প্রত্যাদেশের অগ্নি দাও ; জীবনবেদ হইতে এক এক অধ্যায় বাহির করিয়া দেখাইব। নববিধানের পূজা জ্বলন্তভাবে আরম্ভ করিব। প্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে

আলোড়িত, আন্দোলিত কর। বালক যুবা বৃদ্ধ সকলে ক্ষেপিয়া উঠুক। পাগলবংশ দেখাও; মত্ত হস্তীর ন্যায় যে সকল লোক, সেই সকল লোককে দেখাও; একবার বঙ্গদেশকে মাতাইব। জল হইব না; আমরা অগ্নি হইব। বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া, প্রত্যাদেশের আকারে যথার্থ বেদজ্ঞান লাভ করিব। আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে প্রত্যাদেশের তেজ ও জ্যোতি লাভ করিয়া, নববিধানকে জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। হে সিদ্ধিদাতা, বিনীতভাবে প্রণত হইয়া, প্রত্যাদেশের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব। স্বর্গের বলে বলীয়ান্ হইয়া, জ্বলন্ত রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্য যাদুকর

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৩ই চৈত্র, ১৮০৪ শক;
২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, তোমার সকল সত্যই ইন্দ্রজাল, তুমি নিজেই প্রকাণ্ড যাদুকর। আর 'লাগ ভেল্কি' 'লাগ ভেল্কি' এই শব্দই তো পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। এই পাপ বুকের ভিতর আছে, 'এই উড়ে গেল, এই উড়ে গেল' বলিতে বলিতে যদি যায়, তবেই ধর্ম্ম হইল, ভেল্কি হইল। পরমেশ্বর, প্রকাণ্ড যাদুঘর নির্ম্মাণ ক'রে, তার ভিতর নিয়ত তোমার বুজ্রুকি দেখাচ্চ, লীলাখেলা দেখাচ্চ। ঘরের ভিতর, সংসারে সব জিনিষে ভেল্কি দেখাচ্চ। হরি, আমাদের প্রতিজনকে ভোজবাজির মূল মন্ত্র শেখাও। বাস্তবিক, নাথ, সমুদয়ই ভেল্কি। যখন কিছু ছিল না, ঘোর অন্ধকার

ছিল, তখন একজন প্রকাণ্ড যাদুকর ব'সে 'লাগ ভেল্কি' 'লাগ ভেল্কি' বলিতেছিলেন ; 'আয় আয়, চন্দ্র আয়, সূর্য্য আয়' চন্দ্র সূর্য্য হইল। কিছু নাই, পৃথিবী হইল ; এইরূপে কিছু নাই, আবার সব হইল। 'লাগ ভেল্কি' বলিতে বলিতে, গৌরাঙ্গকে পাপী জগতের সম্মুখে আনিলে। হরি হে, যাদু সর্ব্বস্ব তোমার, তবে যাদু কর আমাদিগকে ; মোহিত কর আমাদিগকে, যাদু করিতে শেখাও আমাদিগকে। এই ভয়ানক অন্ধকার আমাদের হৃদয়ে, ইহার ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য বাহির করি। ভেল্কির মূল মন্ত্র আমাদের শেখাও। বাঘ দেখিতে দেখিতে ভেড়া হ'য়ে গেল। আমি আর্শিতে মুখ দেখিয়া দেখিব, দেবতা ব'সে আছেন। হরি, এইরূপে অলৌকিক পরিবর্ত্তন ক'রে দাও। পাপ তাপ কোথায় চ'লে গেল, চিহ্ন রহিল না। পিতঃ, আর্শিতে মুখ দেখিতে দেখিতে, এক দিন যেন দেখি, দেবতা ব'সে আছেন। এটা ক'রে দিতে পার? তবে তোমায় বলিব যাদুকর। দয়াময়ি, বহু কাল হইতে তোমার শরণাগত হ'য়ে আছি ; দেরিতে যা কিছু হয়, তাতে বড় বিশ্বাস হয় না, যা হঠাৎ হয়, তাতে বিশ্বাস হয়, তাকেই প্রত্যাদেশ বলি, অলৌকিক বলি। মা, আস্তে আস্তে যা হয়, তাতে বিশ্বাস আনন্দ হয় না। ভেল্কির খেলা দেখাও। লক্ষ্মী দর্শন হচ্চে না, একেবারে লক্ষ্মীকে সম্মুখে দেখিব হঠাৎ। প্রত্যাদেশ শুন্‌চি না, হঠাৎ প্রত্যাদেশ শুনিব। মা, নববিধানের সমুদয় কারখানা মনে হচ্চে, যেন ভেল্কি। ধর্ম্মকে যে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ক'রে নিতে পারে, সেই যথার্থ বিশ্বাসী। এই জন্য তোমার কাছে ইচ্ছা হয়, যাদু দ্বারা মোহিত হই। এই জীবনকে যদি সোণার বরণ ক'রে দেবে, একেবারে রাতারাতি ক'রে দাও, পরিবর্ত্তন একেবারে ক'রে দাও, লোহাকে সোণা একেবারে ক'রে দাও। নবজীবন দেবে তো রাতারাতি দাও। কিছু নাই, একেবারে সব হইল। অলৌকিক সংবাদে চম্‌কে উঠে, বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে, তৎক্ষণাৎ

নববিধানের শরণাপন্ন হয় লোকে। মা জননি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পৃথিবীর লৌকিক ব্যাপার মন্ত্র তন্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া, তোমার অলৌকিক মায়ার ভিতর পড়িয়া, আপন আপন জীবনে নববিধানের ভেল্কি বাজী দেখাইয়া, পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অমিশ্র বিধান গ্রহণ

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীননাথ, হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না, এ সমুদয় আমারই। আমি বলিব, বলিতে পারিব, এই সমুদয় ইঁহাদেরই। আমি বলিব, বলিতে পারিব, জীবনান্তেও বলিব। ইঁহারা বলিতে পারিবেন, ইঁহারা স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছেন, ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। দুই এক বিষয়ে মত লইয়াছেন, কিন্তু স্বাধীনভাবেই সব করিয়াছেন। সেই জন্য এত অমিল, মতভেদ। বিচারের দিনে ইঁহারা পরিষ্কাররূপে এই কথা বলিতে পারিবেন। সে দিন গোলমাল করিতে পারিব না, সে দিনে যা ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হ'বে, তা এখন আমাদের মানা উচিত। আমি ঠিক বলিতেছি, এ সকলে আমার হাত অল্প আছে। এক জনের সন্তানে যেমন স্বভাব, শিক্ষা, প্রকৃতি তাহার অনুরূপ হয়, ভ্রষ্ট যে পুত্র, তাতে তেমন হয় না। এক বিধি, এক আদর্শ গ্রহণ করে না বলিয়া, অনেক বিবাদ বৈলক্ষণ্য। অনেক লোকের রুচি একত্র হ'য়ে, এই ব্যাপার, এই কীর্ত্তি হইয়াছে। দশ জন কারিকরে এই নববিধানকে গড়িয়াছি ; খুব

ভক্তি, কম ভক্তি, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় একটি দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয়, তাই নববিধান হয়েছে। দশ পনের জন কারিকর মিলে গড়্‌চে; ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁদ আছে, সেই রকম সে করিতেছে। কি গড়্‌চে? একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব। দয়াময়, কি হইল? আমার জিনিষ ব'লে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটি পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারিতাম, তবুও অনেকটা সুখী হইতাম; তা না হ'য়ে আমি একটা ছবি আঁকিলাম, একজন এসে বলিলেন, ওখানটা আরো কাল হ'বে, এই ব'লে আলকাতরা মাখিয়ে দিলেন; আর একজন, এখানটা এ রকম হ'বে না ব'লে বদ্‌লে দিলেন, দিয়ে বলিলেন, এই আমাদের নববিধান। তাঁরা 'আমাদের নববিধান' বলুন, নববিধানের ছবি এঁকে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্তু প্রাণান্তে সই দিব না। মা, এঁরাও দিন একটা একটা, তোমার আজ্ঞা নিয়ে; কিন্তু গোড়ার নক্সা যে আমার, তাতে কেন অন্য রং মিশাইলেন? আমার আদর্শ বদ্‌লে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শটা পৃথিবীতে রহিল না যে, গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে। প্রেমস্বরূপ, পাঁচ কাজের ভিতর গোলমাল ক'রে আমি চল্‌তে ভবে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে, তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে এক খানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচ রকম মত মিশাইলেন? পরমেশ্বর, পবিত্রাত্মসম্ভূত, একভাবজাত, সুজাত, সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে, পৃথিবী জানিবে, যথার্থ বিধান কি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মিশ্রিত ধর্ম্ম গ্রহণ না করি; কিন্তু

তোমার খাঁটি অমিশ্রিত নববিধান গ্রহণ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সু-জাতত্ব

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১লা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে নিত্যানন্দ, তোমার নববিধানের নিশানে কাদা লাগিল। ঠাকুর ঘরে টাকার ব্যবসায় হইতে লাগিল। পবিত্র বেদবেদান্তে সামান্য লোকেরা কালীর আঁচড় দিতে লাগিল। অকৃত্রিম ধর্ম্মকে অকৃত্রিম রাখ, তোমার চরণে এই ভিক্ষা। আমাদের জীবনের আঁস্তাকুড়ে ধর্ম্ম প'ড়ে মলিন হ'য়ে গেল। নাথ, তোমার ধর্ম্মকে পবিত্র রাখ, তোমার সাধু পুত্রদের চণ্ডালের সঙ্গে বসিতে দিও না। হে শ্রীহরি, আমরা দেখিতেছি, আমাদের জন্মের দোষ আছে। আমরা যে ঠিক সেই ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বংশ, তাহা নহে। আমাদের ভিতর একটু একটু চামারের রক্ত আছে। যদি ব্রাহ্মণতনয় হইতাম, ব্রাহ্মণের তেজঃপূর্ণ রক্ত এই শরীরে আছে, দেখাইতাম। এ যেন মিশ্রিত রক্ত, আমাদের শরীর মলিন ক'রে রেখেছে। ব্রাহ্মণের শূদ্রের মিশ্রিত রক্ত আমাদের ভিতরে যদি থাকে, আমি চণ্ডাল। আমার ভিতর ঈশা বুদ্ধের রক্ত শূদ্রের রক্তে মিশ্রিত হয়েছে। স্বর্গের পবিত্র নূতন রক্ত আমার ভিতর দাও। ঈশা, মুষা তেজোময় রক্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যাইতেছি অশুদ্ধ অপবিত্র রক্ত লইয়া। সুজাত নই আমরা। আমাদের ভিতর অপবিত্র রক্ত আছে, আরম্ভ তার আমা হইতে। হে ঈশ্বর, নববিধানের পবিত্রতা

রাখিতে পারিলাম না, তোমার ধর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলাম না, তার ভিতর আপন বুদ্ধির মত মিশাইলাম। কৈ আমার দেববিধান? তারও জন্মের ঠিক নাই, আমাদেরও জন্মের ঠিক নাই। পবিত্রাত্মজাত কর আমাদের বিধানকে। এই ক্ষত শরীর ধুয়ে ফেলি, অপবিত্র রক্ত ধুয়ে ফেলি। শরীরের বেলা দশটা পাপ খারাপ হয় যদি, আত্মার পাপ আরও খারাপ। ধর্ম্মকে ঠিক করা চাই, আত্মার পাপ ঠিক করা চাই। তোমার সাধু সন্তানগণ ধন্য, কি আশ্চর্য্য তেজোময় সুকুমার ব্রাহ্মণতনয়। ঈশা বলিলেন, আমি ঈশ্বরতনয়। তিনি বলেন, দুটো প্রভুর সেবা হয় না। আমরা অনেক প্রভুর সেবা করি, বলি, দুটো তিনটা বাপের সেবা করা যায়। ঈশ্বর, আমাদের বুকের ভিতর সব রকম রক্ত আছে। এ বিজাত আত্মা সকল রকম রং দেখাতে পারে। আমি কেবল এক পিতাকে ভালবাসিব। আমার পিতার নিকট হইতে যা আসে, তাই খাব। পিতার ধন লইব, আর কারও কিছু লইব না। আমি সুজাত সন্তান। সতী যদি পাঁচ পতিতে মন দেন, তিনি যেমন গেলেন, সন্তান যদি পাঁচ পিতার মায়ায় মুগ্ধ হয়, তিনিও তেমনি গেলেন। পিতঃ, সুন্দর বাপের কাল ছেলে তো হয় না। তুমি যে শান্ত, আমি যে রাগী। চেহারায় তো মিলিল না তোমার সঙ্গে। আমি জানিতাম, আমি তোমার ছেলে। এত দিন পরে দেখ্‌চি, তা নয়। চেহারায় মিল নাই। আমি সুজাত! পিতঃ, দয়া ক'রে নববিধান এনে দাও। একটা কোন বিজাত ব্যাপার আমরা ছোঁব না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে ধর্ম্ম নষ্ট করেছি, পাঁচ রকম মত চালিয়েছি। এত দিন পরে দেখ্‌চি, রক্তের ঠিক নাই! দয়াময়ি, আমরা পরস্পরকে খুব শাসন করি, এতে যদি ভাল হই, সুজাতদের সঙ্গে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিতে পারি। আমরা তোমাকে একমাত্র পিতা ব'লে ভালবাসিতে পারিলাম না। এই মণ্ডলী ভিন্ন বন্ধু নাই, বিপদে সহায়

নাই. ইঁহারা আপনার লোক, আর তুমি আপনার, আর কেহ আপনার হ'তে পারে না। নববিধানের প্রেরিত দলের পরস্পরের নৈকট্যের সম্বন্ধ যেমন, এমন আর হ'তে পারে না। শ্রীহরি, তোমার কাছে এই মিনতি করি, এই ক'জনকে খুব মিষ্ট ব'লে যদি মনে না হয়, তবে এঁরা আপন আপন পথ দেখুন। এখানে তারা থাকুক, যারা বাপকে জানে, আর ভাইদের ভালবাসে। হে আদরের ঈশ্বর, একবার আদর ক'রে তোমাকে, একমাত্র পিতা মাতা ব'লে ডাকি, তোমাকে ভালবাসি। আর কাউকে চিনি না, আর কাউকে জানি না। ঠাকুর, মলিন রক্ত বিদায় ক'রে দাও, নির্ম্মল রক্ত ভিতরে দাও। এক মত, এক বিশ্বাস, এক রকম প্রণালীতে চলা, এক মা, এক বাপ। হে দয়াময়, হে প্রাণনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই পিতা মাতা বলি, এ রক্তে চণ্ডালত্ব না থাকে, অতি শুদ্ধ পরিষ্কৃত ঋষিরক্ত-বিশিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ক্রোধনির্ব্বাণ

(কমলকুটীর, সোমবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
২রা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি যদি রাগী হইতে, তবে তুমি সুখী হইতে না। মানুষের মনে রাগ বড় কষ্ট দেয়, আগুন জ্বালিয়া দেয়, শান্তিজল শুকাইয়া যায়। তোমার বক্ষে কেবল শান্তি দিন রাত বিরাজ করিতেছে। মানুষের মন কথায় ব্যবহারে উত্তপ্ত হয়। ঈশ্বর, তুমি কেমন শান্তিস্বরূপ! কোটি দূত তোমার চারি দিকে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিতেছে। কোটি কোটি ঋষি

তপস্যাভূমিতে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিতেছেন। রাগ তুমি জান না, অথচ পাপের প্রতি তোমার ভয়ানক রাগ। তুমি রাগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছ, সেই জন্য স্বর্গে এত সুখ, এত শান্তি। যদি তোমার কাছে কিছু শিখিতে হয়, আমি এই শিখিব যে, কাহারও ব্যবহারে উত্তপ্ত হইব না। আমার হৃদয়ে শান্তি থাকিবে। দয়াময়ি, আমরা তো তোমার সন্তান, আমরা কেন রাগি? পরের ব্যবহারে আমরা ঠিক থাকিব। মনের শান্তি কিছুতেই যাইবে না। যদি দয়া করিয়া পরিত্রাণ করিবে, তবে ভক্তরাজ্যকে রাগের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত কর। রাগ আসিবে না মনে। তোমার প্রেরিত ঈশার মতন সেই মেষের স্বভাব কবে হইবে? মেষের স্বভাব হইয়া, পৃথিবীর যত বাঘের কাছে বসিয়া থাকি, ক্ষতি হইবে না। স্বর্গ লাভ হইবে নিশ্চয়। আমি ভালবাসিতে শিখিব তোমার মত। আমি ক্ষমা করিব তোমার মত। পরের কাছে উত্তেজনা পাইলে, আমি রাগ করিব না। মা, যার মনে রাগ, রাগের আগুন তার ভক্তিজল শুকিয়ে দিচ্চে। পরমেশ্বর, বড় শোচনীয় অবস্থা তার। হরি, তুমি তো নাস্তিকদের অবধি ভাত খাওয়াচ্চ। তুমি যদি রাগিতে, তবে কি হইত? ও মুখ কিছুতেই বিমর্ষ হয় না; শান্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। তুমি কোন জীবের প্রতি কখন একটুও রাগ না। তোমার শ্রীচরণে এই মিনতি, যদি স্বর্গে কোন উপায় থাকে, রাগকে নির্ব্বাণ ক'রে দাও। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এনে, রাগ নির্ব্বাণ ক'রে দাও। হরি, রাগ নাই তোমার, তাই তোমার পূর্ণ সুখ। মা, রাগ দূর ক'রে দাও, তা' হ'লে ভাই বন্ধুর ব্যবহারে উত্তপ্ত হ'ব না; তোমার কাছে থাকিতে থাকিতে তোমার মত হ'য়ে যাব, আর রাগ থাকিবে না। সকলে আমরা মাটির মানুষ হ'য়ে যাই। উত্তপ্ত হ'বার পূর্ব্বেই ক্ষমা ক'রে ফেলি। বিপদ্ প্রলোভন আক্রমণ যত কেন আসুক না, ভিতরে

কেবল মার স্বভাব বাড়িবে, কিছুতে উত্তপ্ত হ'ব না; আমাদের মধুর স্বভাবে সকলে মোহিত হ'বে। সেই একজন আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে আপনার মধুর স্বভাবে সকলকে মোহিত ক'রেছিল। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাগের আগুন একেবারে নিবাইয়া দিয়া, কেবল ক্ষমা, কেবল শান্তি জগৎকে দিয়া সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দল হইতে বিদায়

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
৩রা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে, যাহা হইয়াছে, তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকর্ম্মণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইঁহাদের সকলের মত চরিত্র গঠন হইয়া গিয়া থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু না থাকে, তবে আর পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যাঁর যা করিবার, আপনি আপনি করিয়া লইয়াছেন। হে পিতঃ, ইঁহাদের ভার লইয়াছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণ দরকার। ঔষধের যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। জোর ক'রে চিকিৎসা করা কি ভাল দেখায়? হে দয়াল হরি, মানসিক চিকিৎসা এইরূপ। একটা অবস্থা আছে, মন যায় ও দিকে আর যায় না। খুব ভক্তি প্রেম উপাসনা, তার পর একটা সীমা। একটা সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে, মানুষ এক আধটু উপাসনা ক'রে,

কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আস্তে সংসারে চ'লে যাবেন সকলে। প্রেমের মৃত্যু হ'বে। মিছামিছি সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে ডাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হ'বে। মা, সাধু হ'ব, কিন্তু মিলন হ'বে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য ব'লে দাও। বিশ্বাস নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হ'ব না, ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেব কেন! এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়া হ'বে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা হ'ব, কিন্তু সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে! মা, দেখ, কি হচ্চে। হে দেবি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধরিয়া, যতটুকু আলো পাই তোমার নিকট হইতে, সেইরূপে কাজ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রোগের প্রতীকার *

(কমলকুটীর, বুধবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হরি, আর প্রতীকার তবে হইবে না। আর কোন উপায় নাই, ইঁহারা বলিতেছেন। ইঁহারা ঔষধ খাইবেন না। ঔষধ না খাইলে, আশা কি? বিনা ঔষধেতো রোগের প্রতীকার হয় না।

---

* ৪ঠা এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই কয়দিনের প্রার্থনাগুলি লেখিকার (শ্রীমতী মোহিনী দেবীর) অবরোধ হেতু লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভাই কালীশঙ্কর দাস তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এই সকল প্রার্থনার সার লিখিয়া রাখেন। তাহাই উদ্ধৃত হইল। ("আচার্য্য কেশবচন্দ্র"—শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৮৩—১৯৮৫ পৃঃ এবং "ভাই কালীশঙ্কর দাসের জীবনী" ৪৭—৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মিল অসম্ভব

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

গুরু পাপী, শিষ্য পুণ্যবান্; গুরুর গলায় বিষ্ঠার হাঁড়ি, শিষ্যবর্গ অতি গৌরবাস্পদ ভদ্রলোক। এস্থলে মিল হওয়া অসম্ভব। একত্র নৌকা ছাড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেষকালে ছাড়িয়া চলিলাম। মিল যে হয় না, ঠাকুর! আমি তো মিল করিব ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার এত দোষ থাকিতে, কেমন করিয়া নির্দ্দোষীদের সঙ্গে মিলিব।

ভিক্ষুর জীবন

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

ভিক্ষুর জীবন পবিত্র, ভিক্ষান্ন পবিত্র।

উচ্চশ্রেণীর হয় না

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
৯ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী কেহ হয় না, কিন্তু অতি সামান্য কাজ করিয়া দিন কাটাইতে চায়।

তোমার হওয়া

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১০ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

পুথিলেখা, বক্তৃতা করা যাহাদিগের কাজ, তাহারা তোমার লোক নহে। চণ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণ পারে। আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহা পিতামাতার নিকটে সন্তান যেরূপ করে, সেরূপ নহে ; রাজার নিকটে দূরদেশবাসী প্রজা যেমন দরখাস্ত লিখিয়া পাঠায়, আমরা তাই করি। যদি ঠিক ছেলের মত আবদার করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে সঙ্গে এলাম, এইরূপ আঁচল ধরিয়া যদি বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু পাইতাম ; কিন্তু তাহা তো পারিলাম না। তৃণপত্রাদি সব তোমার পরিচয় দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তোমার হইতে পারিলাম না।

রাজপুত্রের জন্মদিন *

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১১ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

রাজপুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা।

অবিশ্বাস গেল না

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ;
১২ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

অবিশ্বাস তো গেল না, স্থিরতর নিশ্চিত ভূমিতে তো কেহ অদ্যাপি দাঁড়াইল না। হে ঈশ্বর, তোমার দোষ নাই, সব দোষ আমাদের।

* ১১ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ, কলিকাতায় উডল্যাণ্ডে কুচবিহারের রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়।

নবজীবন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১লা বৈশাখ *, ১৮০৫ শক ;
১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

নূতন বৎসরে নবজীবন পাইব। পাপরাজ্য হইতে ডুব দিয়া পুণ্যরাজ্যে যাইব। ব্রাহ্মসমাজ আর থাকিবে না, নববিধানের নব জীবন লইয়া নূতন বৎসরে প্রবৃত্ত হইব। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ বুদ্ধ কনফুসস্ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া নূতন প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিব।

সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী

(কমলকুটীর, শনিবার, ২রা বৈশাখ, ১৮০৫ শক ,
১৪ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে সন্ন্যাসীর ঈশ্বর, পূর্ব্বে বৈরাগ্য আসিয়াছিল, নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। নববিবাহিতা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস গৌরকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গেল। সে সন্ন্যাস আর কি ফিরিবে না? আমরা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়া হইব; সন্ন্যাসীর কি সন্ন্যাসিনী হইবে না? সন্ন্যাসী কি চিরকাল স্ত্রী-বিহীন থাকিবে? ঈশ্বর, বিবাহ দাও।

নববিধানের প্রেম

(কমলকুটীর, রবিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার বলে, আমি সুখে থাকিব, আর আমার ভাইগুলি দুঃখে মরুক; ধর্ম্ম বলে, আমিও দুঃখ পাব, আর ভাই ভগ্নী-

---

* অদ্য বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতা এই চারিটী ব্রত প্রেরিতদিগকে দেওয়া হয়।

গুলিকেও দুঃখ দিব। নববিধান বলে, কারু কথা থাকিবে না; সকল শাস্ত্রের অর্থ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন অর্থ করিব। যে অন্ন আছে, সকলে খাবে, বস্ত্র সকলে পরিবে, আমি উপবাসী থাকিব, আমি ছেঁড়া নেকৃড়া পরিব। আমি ছাতি হইয়া সকল রৌদ্র সহ্য করিব, ভ্রাতারা আমার ছায়ায় বাস করিবে। আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা আমাতে বাস করিবে।

একখানি শরীর

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক;
১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মিলনের ঈশ্বর, অমিল আর রাখিও না। আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক হইতে শিখাও; আমরা এক এক জনে এক এক যন্ত্র বাজাইব, কিন্তু সুর ও তাল, রাগ ও রাগিণী এক হইবে। যে আমাদের ভিতরে থাকিয়া ভিন্ন সুরে, ভিন্ন তালে বাজায়, সে অভদ্র লোক। আমরা কয়জনে মিলিয়া একখানি শরীর হইব। এক শরীরের যে কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে, যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর।

এঁরা আর পারেন না

(কমলকুটীর, বুধবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক;
১৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময় হরি, আমি পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইলাম; ইঁহারা—এই বন্ধুগণ, আর আমার সঙ্গে যাইতে

পারিতেছেন না। ইঁহারা দুইটি পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া আর চলিতে পারিতেছেন না। আমি বন্ধুদিগের জন্য কি না করিলাম? মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি সকলই যে করিলাম।

তুমি কি নাই?

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে বিশ্বাসীর পিতা, তুমি কি সত্য সত্যই নাই? এই যে আমার বন্ধুগণ বলিতেছেন, তুমি নাই। তুমি আর উত্তর দেও না, কাঁদিলে শুন না। আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে, বড় শক্ত গালি হয়। চোর বল, দস্যু বল, বদ্‌মায়েশ বল, তাহা সয়; কিন্তু তোমার পিতামাতা নাই, একথা সয় না।

তোমার প্রেম

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
২০শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, প্রেম স্বর্গেও আছে, পৃথিবীতেও আছে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ভালবাসে, তাহা দেখিয়াছি; এ সকল প্রেমের সঙ্গে তোমার প্রেমের তুলনা হয় না। তোমার প্রেম, যে মারে, গালাগালি দেয়, খেতে দেয় না, তাহাকেই ভালবাসে। তোমার প্রেম লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভালবাসিলেন। ঈশা বুকের রক্ত দিয়া শত্রুর মঙ্গল সাধন করিলেন।

উপযুক্ত ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, শনিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
২১শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হরি, আমাদের বয়সের উপযুক্ত ধর্ম্ম দেও। আমরা বৃদ্ধ হ'য়ে দুর্ব্বল রুগ্ন হ'য়েছি, এই রুগ্নাবস্থায় যাহা সাধন করিতে পারি, সেই ধর্ম্ম দেও।

যাহা প্রয়োজন, আগেই সৃষ্টি করেছ

(কমলকুটীর, রবিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যখন প্রথম সৃষ্টি করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ ছিল? ধান্য দেও, অন্ন দেও, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়, ইহা বলিয়া কি কেহ প্রার্থনা করিত? তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, এই ব'লে কাঁদিল; তার পর কি তুমি নদীর সৃষ্টি করিয়াছ? না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের অন্ন জলের প্রয়োজন হইবে, তাই তুমি এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছ। সেইরূপ ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম এ সকল মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি মানুষ-সৃষ্টির আগে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হিমালয়ের দেবতা

(হিমাচল, শনিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
৫ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে হিমালয়ের দেবতা, এখানে তোমার পূজা করিলে, কার না শরীর মন বিকম্পিত হয়? এখানকার দেবতা মিথ্যা নহে, ভারতের জ্বলন্ত জাগ্রত দেবতা পর্ব্বতের উপরে বেড়াইতেছ। যদি কাহাকেও দেখিয়া গা কাঁপে, সে কেবল তোমাকে। ঋষিজীবনবায়ু এখনও এখানে প্রবাহিত। ঋষিরা যে সূর্য্য দেখিতেন, আমরা সেই সূর্য্য দেখিব ; যদি কেহ দেখিতে চান, আসুন, এই পর্ব্বতে। আমি নিদ্রিত ঠুঁটো হাতভাঙ্গা পাভাঙ্গা দেবতার পূজা করিব না। আমি বুঝিব যে, আমি তোমাতে আছি, তুমি আমাতে আছ। আমি বাজারে বাজারে ঘুরে, হিন্দুদের বাজার, মুসলমানদের বাজার, শিখদের বাজার, সকল বাজার ঘুরে ঘুরে, সকলের চেয়ে জীবন্ত যিনি, সকলের চেয়ে সুখী যিনি, সব চেয়ে কথা কন যিনি, আমি সেই দেবতার পূজা করিব। হে হিমালয়ের দেবতা, আমি মরা দেবতা. দুর্গন্ধ দেবতা. পচা দেবতাকে মানি না। কেহ কেহ বলেন, "এত দিন তোমার সঙ্গে থেকে, নানা রকম ক'রে, সকলে মিলে তোমাকে বন্ধু ব'লে তোমার সঙ্গে ডাকিলাম। কিন্তু ও সমুদয় কি আমার দেবী ? আমি 'মা' বলিয়া মানিলাম,—কাছে বসিয়া ডাকিলে কি হইবে?" আমার কাছে বসিয়া বন্ধুরা এক মাকে ডাকিলে, এক মার মত দেখিলে, সব মধুময় হইবে। আমি ঠিক বলি, আমার মা সত্য। হিমালয়, তুমি বল, "আমি ধূমধাম করিয়া বেড়াইয়াছি, আর্য্যজাতিকে পৃথিবীর শিরোভূষণ করিয়াছি। আমি গঙ্গাতীরের মড়া লইয়া হিমালয়ের গায়ে বেড়াই, আবার আমার কাছে এসেছিস্,

তোকেও গুঁড় করবো। চার শত বৎসর পরে আবার আমাকে কে ডাকে? সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। চার শত বৎসরের ঝড়ের ভিতর শোঁ শোঁ করিতেছি। প্রেমফুল দিবি আমার পায়ে, আমি ভগবতী পার্ব্বতী। এই ক'টা দিন আমার পূজা কর্, আমি তোদের দিয়ে ভারত আবার কাঁপাইব।"

নির্জীব দেবতা কি কথা কন? তুমি এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলিলে,—দাঁড়া, দাঁড়াইলাম,—বোস, বসিলাম; এখানে এসে ঘুমোতে পারবে না, এখানকার রাজা বড়, এখানকার ঠাকুরও বড়। এই আমাদের জীবনের বৃন্দাবন, এই তীর্থ। এখানে কিছু পাব, এখানকার রাজা যখন খেপেছেন, তখন যোগ ধ্যান সকলি পাব। হিমালয় যখন পাশ ফিরে উঠে বসেছেন, তখন দেশে অনেক দুঃখ পাপ হ'লেও, একটা হিমালয় ছুঁড়ে ফেলে দেবো, চূর্ণ হ'য়ে যাবে। পাহাড়ে যোগ সমাধি জ্ঞান বিশ্বাস সকলি পাব, এখানে আর ছোট বাঙ্গালী নাই, পাহাড়ী পাহাড়ের দেবতাকে যেমন পূজা করে, সেই ভাবে পূজা করিব। আমি হিমালয়ের দেবতাকে ডাকিতে এসেছি। তুমি ভারতকে উদ্ধার করবে। অন্য সব দেবতা যেমন খড় মাটীর মত। দেবতা একজন তুমি। তোমাকে মা ব'লে, খুব একতারা বাজাইয়া তোমার পূজা করি। ঋষি হইব, কাহারও কথা শুনিব না কাহাকেও ভয় করিব না। কাণ দিয়া শোন, চক্ষু দিয়া দেখ,— হরি আমার, আমি হরির, প্রাণধন হরি আমার গোলাপ ফুল। আমার এত অহঙ্কার বাড়িতেছে। সকলেই দেবতা খুঁজে আনিল, কোনটা পচা, কোনটা পোকা পড়া; আমার দেবতা না অঙ্গহীন, না পচা। আমি এমন পেয়েছি যে, ইঁহার মত আর নাই, বাবা ব'লে বাবা, বন্ধু ব'লে বন্ধু, মা ব'লে মা। আমি চিরকাল তোমারি হ'য়ে থাকি। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, আমরা যেন অসার দেবতা ঝেড়ে ফেলে, এই লোকটির

যে দেবতা, তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং পবিত্র হই। জাগ্রত দেবতা, হিমালয়ের দেবতা যিনি, তাঁহাকে পূজা করিব। আর কাহাকেও ডাকিব না, আর কাহারও পূজা করিব না। কেবল তোমাকেই ডাকিব, হে দয়াময়, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [সুনীতি দেবী]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গিরিধারণ

(হিমাচল, রবিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
৬ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে স্বর্গীয় পিতঃ, হে হিমালয়ের রাজা, আমাদের ভাবনা চিন্তা ঘুচিল না, অথচ আমরা তোমাতে আনন্দ সম্ভোগ করিব। আমরা পাহাড়ে বেড়াইব, অথচ মনের ভিতর দুঃখ কষ্ট থাকিবে, আর নানা পরীক্ষায় পড়িলে তাহার ভিতর তুমি আমাদের সুখী করিবে। আমাদের বুক ভাঙ্গিলে, তোমাকে মা ব'লে ডাকিব ; তাহা না হইলে, হরি, তোমার ভক্ত যদি আপনাকে শান্ত সহিষ্ণু দেখাইতে না পারেন, তবে সামান্য লোকেরা কি করিবে ? প্রাণেশ্বর, আশ্চর্য্য মধুর বিধি তোমাতে! সংসারের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে হরিনাম করি। সংসারের ভার যদি হিমালয়ের মতন হয়, হে গিরিগোবর্দ্ধন, যে তোমার ভক্ত হইবে, সে এক অঙ্গুলীতে সংসার বহন করিবে। ভগবান্ নিজে তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, শান্তি, ক্ষমা বুকে লইয়া, ভক্তেরা দেখান ভক্তির জোর। আমরাও যেন, নাথ, বিপদ পরীক্ষায় পড়িলে আমাদের জীবনে তাহাই দেখাই। আমরা পাহাড়ে বসিয়া সকালে বৈকালে এই খেলা করি, কে ছোট আঙ্গুলে বড় পাহাড় ধরিতে পারে, সংসারের ভার রাখিতে

পারে। যদি সুখ তোমার কাছে, তবে ভক্ত যদি না ধরিতে পারিলেন, তবে কি হইবে? একটি একটি পাহাড় একটি একটি তোমার ভক্ত ধরিবেন। আমরা কিছুতেই ম্লান হইব না, তোমাকে নিকটে পেয়ে সকল ভার তোমাকে দেবো। কেমন ক'রে পাহাড় ধরিতে হয়, মার কাছে শিখিব। মা এত বড় ব্রহ্মাণ্ড ধরে আছেন, আমরা ছোট ছোট পাহাড় ধরিব। আমাদের মুখ যদি পরীক্ষায় পড়িলে মলিন হয়, তবে আমরা তোমার নাম করিতে পারিব না।

হে গিরিগোবর্দ্ধন, আমরা তোমাকে সকল সংসারের ভার দিয়া যেন পবিত্র হই। আমরা সংসারের বড় বড় ভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়া, সকল অপমান সহ্য করিয়া, যেন শুদ্ধ ও সুখী হই, হে দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উচ্চপ্রকৃতি

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
৮ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল, হে উচ্চদেবতা, নিম্নভূমি ছাড়িয়া পাহাড়ে আরোহণ যেমন, সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ তেমনি। যদি এখানে আসিয়া সেই কলহ, সেই রাগ রহিল, তবে, ঈশ্বর, এই স্থানের অগৌরব। নীচ বিষয়লালসা এখানেও থাকিবে? সেই দুর্গন্ধ আঁস্তাকুড়, সেই লোভের বস্তু, সেই নীচতা, নীচসঙ্গ, হরি, এখানে কিছুই নাই। এখানে বড় বড় গাছ পাহাড়। দেখিবার জন্য উচ্চ পর্ব্বত, সম্ভোগের জন্য ফুল। এখানে যদি তোমার মানুষেরা কুড়ে হইয়া বসিয়া থাকিবে, তবে আমরা এই

দেবতাদের পথে কেন আসিলাম? বুঝি, পথ ভুলিলাম! ভগবান্, মনের নীচতা দূর কর; এখানে যত দিন থাকিব, রাগ হ'বে না, লোভ হ'বে না। হিমালয়ের দেবতা ঢাল খাঁড়া লইয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমার কেল্লায় কেহ নীচ প্রকৃতি লইয়া আসিতে পারিবে না। হে দয়াময়, আমরা হিমালয়ের কাঁধে হাত দিয়া এক হই, আমরা উচ্চ হই। হে ঠাকুর, আর কি ভাল দেখায়, আমাদের এখানেও রাগ লোভ থাকিবে? যদি ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ঢেঁকি থাকে, তবে কি হইবে? আমরা কি ভাল হইতে পারিব না? দাও, পর্ব্বতরাণি, সুমতি দাও। মন, তুমি নীচ ভাব ছাড়, নীচ বুদ্ধি আর ধরো না, তুমি উচ্চ স্থানে ব'সে উচ্চ হও। এখানে আর রাগ প্রলোভন নাই, বিভীষিকা নাই। এখানে দেবতারা রহিয়াছেন, এখানে ঋষিদিগের পদচিহ্ন রহিয়াছে।

আমরা এই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া উচ্চ হই, ভাল হই। আমরা যে, ঠাকুর, তোমার পুত্র, হিমালয় তোমার। আমরা হিমালয়ের উপরে থাকিয়া নীচের দিকে তাকাব না। আমরা উচ্চ হইব। হে দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নীচ প্রকৃতি ছাড়িয়া, উচ্চ প্রকৃতি লাভ করি ও উচ্চ আকাশে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমার মা

(হিমাচল, বুধবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক;
৯ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে শান্তিদাতা, হে হৃদয়-উদ্যানের সুমিষ্ট ফুল, আমার এই একটি বিনীত প্রার্থনা তোমার কাছে যে, তুমি সকলের হও। যেমন তুমি

আমার, তেমনি সকলের হও। পৃথিবীর লোকেরা সত্য হরিতে মজিল না। তাহারা হরি হরি বলিল, পিতা পিতা বলিল, কিন্তু সুখ হইল না। এই জন্য পরদুঃখে কাতর হ'য়ে তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যেমন এখানে সুখশান্তি দিতেছ, তেমনি সকলকে দাও। আমার বাড়ী যেমন সাজাইয়া দাও, তেমনি সকলের ঘর সাজাইয়া দাও। আমার উপাসনার স্থানে যেমন ক'রে, মা, আনন্দের পোষাক পরে, উজ্জ্বল বরণ ধ'রে এস, সকল বাড়ীর উপাসনার স্থানে সেই রূপ দেখাও। মা, তোমাকে না চিনিয়া, ইহারা কত দিন থাকিবে? যদি সুখের আস্বাদ না পাইল, তবে কি হইবে? আর অন্য দেবতাকে কেহ যেন ঈশ্বর বলে না। আর মাটীর, পেতলের, তামার মরা দেবতাকে কেহ যেন না মানে। মা লক্ষ্মি, যখন তুমি আছ, যখন সকল ঘরে তুমি যাইতে প্রস্তুত, তবে তোমাকে লোকে কেন নেয় না? রোগের ঔষধ তুমি, লোকে রোগে পড়িয়া তোমায় তবে ডাকে না কেন? টাকা কড়ি মুক্তা সকলকে দিবার জন্য লইয়া বসিয়া আছ, তবু পৃথিবীতে এত দৈন্য কেন? তুমি জরীর জামা দিবে, গরিবকে বস্ত্র দিবার জন্য বসিয়া আছ। দীননাথ হে, তোমাকে পৃথিবীর লোকে, বুঝি, বুঝিতে পারিল না। আমার হরি যেমন, অন্যের হরি তেমন খাঁটি নয়। গৃহের কর্ত্তারা তোমাকে লইয়া যাইবেন। সকলের ঘরে যাও। তোমাকে গৃহস্থেরা বরণ করিয়া লইবে। তুমি যদি সকল ঘরের লক্ষ্মী হও, বৃদ্ধ ও বালক সকলে তোমার প্রেমে মত্ত হইবে। প্রাণনাথ, ভক্তের ঘরে যেমন আছ, তেমনি সকলের ঘরে যাও। অমুক ঘরে জড়ের পূজা হয়, অমুক বাড়ীতে পূজাও হয়, অথচ কান্নাকাটি, এ যেন শুনিতে না হয়। প্রেমময়ি, যার মা তুমি হও, তাকে কত টাকা দাও, কত সুখ দাও, তার সাক্ষী আমি। গরমের সময় সর্ব্বৎ দাও, শীতের সময় শাল দাও। আমার মা লক্ষ্মী; আমি তোমার দয়ার

সাক্ষী। যাঁহার পূজা আমি পঁচিশ বৎসর করিয়া কত সুখী হইতেছি, আমি বাড়িয়ে বলিতেছি না, যথার্থ মার গুণ যাহা, তাহাই বলিতেছি। মা, রথে করিয়া সকলের ঘরে ঘরে একবার যাও। সকলে দেখুক, কেমন হৃদয়কে চমৎকৃত করিতেছ। মার পুণ্যের কাপড়ে প্রেমের চুম্‌কি দেওয়া কেমন চিক্‌মিক্ করিতেছে। মা, তাই ইচ্ছা করে, আমার মাকে সকলে দেখিয়া নববিধান-বিশ্বাসী হউক। মা, তোমাকে আমি বিখ্যাত আর কি করিব। তবে সকল গৃহস্থের পদতলে থাকিয়া, গরিব ভক্ত এই বলে, মাকে যে দেখিয়াছে, সেই জানে, মা কেমন। মা দুর্গা ভগবতী ভক্তের বাড়ী এসে সকল ঘর সাজান। ভক্তের মন কেবল ভক্তবৎসলাই জানেন; তাই বলি, সকলে আমার মাকে চিনুক। তোমার সংসার, তোমার বাড়ী ও তোমার পরিবার, এইটি বিশ্বাস করিয়া, যেন তোমার চরণে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

চিন্ময়ে মগ্ন

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১০ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে চিরসুস্থতা, আত্মার যৌবন তুমি, সুস্থতা তুমি, বল তুমি, চিরবসন্ত তুমি, তোমাকেই ডাকিতেছি। আত্মাকে আরাম দাও। অতি সুন্দর লতা, কোমল লতা যেমন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তেমনি, হে কল্পতরু, আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা তোমাকে জড়াইয়া থাকে। তুমি বৃক্ষ হও, আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া সুখী হই।

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে শরীরের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্তু মনের জন্য। হে কৃপাসিন্ধো, তুমি যে সুন্দর, তুমি যে সুস্থ, তুমি যে পর্ব্বতের এই শীতল বায়ু; তোমাকে ভক্ত পাইলে রোগ শোক পাপ তাপ তার চলে যায়। মার কোলে ছেলে যেমন বসিতে পারে, তেমনি শিশু আত্মা তোমার কোলে বসিতে পারে। হে ঈশ্বর, শরীরের অতীত আমার আত্মা, আমি তোমাতেই মিশিয়া যাইব। চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে, হে প্রেমময়, প্রেমলহরীতে মগ্ন হইয়া থাকিব। সে এখানে না, এ পৃথিবীতে না। সেখানে, সেই আনন্দ-সাগরে উড়িব, বিহরিব। সেখানে জড়ও যাইতে পারে না, শরীরও যায় না। হে আনন্দস্বরূপ, আমাকে সেইখানে রাখ। শরীরের রোগ থাকিবে না, জ্বালাও থাকিবে না, মনে আর শরীর থাকিবে না।

পিতঃ, তোমাকে কোথায় ডাকিতেছি? এ সবই যে চিন্ময়। এখানে লবণসাগরে লবণ এক হইয়া গিয়াছে। তোমাতে আমরা লীন হইয়া যাইব, ইহাই আমাদের সুখ। ব্যাধিমন্দির দেহকে চিন্তাসাগরে ডুবাইয়া কি হয়? চিদানন্দকে ডাকিলে কত সুখ হয়। আমরা দু'টি পাখীতে একটি ডালে, অনন্তকালের ডালে বসিয়া থাকিব। তোমার বাগানের পাখী কর, অন্য বাগানের পাখী হ'ব না। তোমার সরোবরের মাছ কর, অন্য সরোবরের মাছ হ'ব না। সংসারের অতীত, জড়ের অতীত সেই স্থানে তোমার সঙ্গে এই সুমিষ্ট বায়ু সম্ভোগ করি। হে গিরিরাজ, হে গিরিরাণি, এই কয়েকটি গরিব পাথককে, ভগবতি, তোমার কোলে স্থান দাও, দেখা দাও। দয়াময়ি, আনন্দ-সুধা পান করাও। হে জগজ্জননি, হে প্রেমময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, অসার সংসারের বাসনা ছাড়িয়া আমরা যেন তোমাতে মগ্ন হই। আমরা এই নূতন রাজ্যে

আসিয়া, সুখ শান্তি যেন সম্ভোগ করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আর্য্যজাতির দেবতা

(হিমাচল, শুক্রবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১১ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, আর্য্যজাতির দেবতা, আমরা তোমাকে আর্য্যভাবে দেখিতে চাই, পূজা করিতে চাই। আর্য্যজাতি তোমাকে মেঘে বৃষ্টিতে পর্ব্বতে নদীতে দেখিতেন। ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তেমনই দেখিতে পাই। যেখানে থাকিব, সেইখানেই তোমাকে দেখিব। আর্য্য ঋষিরা একবার নয়, কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে পাইতেন, বুকে ধরিতেন। তাঁদের সন্তান আমরা, আমাদের ভিতরে তাঁদের শোণিত আছে। আমরা তোমাকে সকল স্থানে দেখিব, পর্ব্বতে নদীতে দেখিব, বাতাসের ভিতর তোমার কথা শুনিব। হে দেব, তোমার আর্য্যের একটি বিশেষ গুণ ছিল, তুমি যতক্ষণ ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইতে, আর্য্য তোমাকে ধ'রে রাখিতেন। আমরা কেন সে রকম পারিব না? যত ভক্ত তোমাকে বেঁধেছিলেন, গৌরাঙ্গ ধ্রুব প্রহ্লাদ সকলে তোমাকে প্রেমডোরে বেঁধেছিলেন। আমরাও তোমাকে সেই রকম বাঁধিব। হে ঠাকুর, তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিলে, তবে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হে পতিতপাবন, আর্য্যের দেবতা, আমরা যেন তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখি। হে হরি, তোমাকে আমরা সংসারে বাঁধিয়া রাখিব,

তোমার রাঙ্গাচরণ সকল স্থানে দেখিয়া সুখী হইব, মা দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [সাবিত্রী দেবী]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রাচীন ঈশ্বর

(হিমাচল, শনিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১২ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে আর্য্যজাতির ঈশ্বর, তোমাকে আর্য্যদিগের দেবতা বলিলে, কেমন আনন্দ, কেমন গৌরব হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের প্রাচীন যিনি, বেদবেদান্তের আর্য্যদিগের যিনি, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যাদেশের আগুন জ্বালিয়াছিলেন যিনি, সেই দেবতা তুমি। এ সব মনে করিলে, কি গৌরব হয় না? আমাদের প্রাচীন আর্য্যের দেবতা বলিলে, কত মহত্ত্ব হয়। মা, যদি আমরা শাখা ছাড়িয়া, ডাল ছাড়িয়া গোড়াতে যাই, সেখানে দেখিব, সকলে এক হইয়া, একটি কুশলের পরিবার হইয়া, গৃহের দেবতা, তোমাকে ডাকিব। আর, দীনবন্ধো, এরূপ ভারতকে বিভক্ত রাখিও না; ভারতেশ্বরি, এক ধর্ম্ম দিয়া তোমার কাছে রাখ। আমরা একের ধর্ম্ম কেন করি নাই? নিম্নভূমির গোলমাল, জাতিভেদ সে সকল এখানে কিছুই নাই। আমাদের প্রাচীন আর্য্যের দেবতা তুমি, ভারতের ঐক্য, গৌরব তুমি। তোমারি কাছে এই মিনতি করি, মা ভারতেশ্বরি, তোমার ভারতের কাছে আবার এস। ইহাকে উদ্ধার করিবার কি এখনও সময় হয় নাই? হে ঈশ্বর, তুমি মহামহিমান্বিত ঋষিদের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গেও কথা কও। হাজার হাজার বৎসর কত বিপদ হইতে বাঁচাইলে, হাজার হাজার বৎসর

কত পাপ হইতে উদ্ধার করিলে, আমরা যেন তোমারি পূজা করি। আমাদের বাপ পিতামহের দেবতা তুমি, যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস তোমার কাছে থাকিয়া তোমারি পূজা করিয়াছিলেন। আর যেন, মা, পাপ না করি। আর্য্যশোণিত! হৃদয়ে জাগিয়া উঠ। আমরাও এবার ঋষি হই, যোগী হই, মুনি হই, তপস্বী হই। আর একবার আমাদের দাঁড় করাইয়া দাও, তোমার ভারত রোগাক্রান্ত হ'য়ে শুইয়া রহিয়াছে। মা, বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে দেখ্‌ব, তোমার ভারতের মাথায় সোণার মুকুট। তুমি কত দিনের মা, কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানে ছিলে. সেই মা তুমি। মা, ব'সে ব'সে ভাব্‌ছ, কখন ভারত আমাকে ডাকৃবে। মা, আবার ভারতকে জাগাও। মা, আমরা ঋষি হইয়া প্রাচীন সাধুদের গৌরব যেন রক্ষা করিতে পারি। আমাদের বাপ পিতামহের দেবতা তুমি, আমাদের মা বাপ তুমি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জ্বলন্ত বিশ্বাস

(হিমাচল, রবিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৮০৫ শক ;
১৩ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়ালু ঈশ্বর, হে গিরিরাজ, যাহা সত্য. আমরা তাহা কেন না দেখিব? ঈশ্বর, তোমাকে কেন অসার মনে করিব? হিমালয় যেন মুদগর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে. এখানে যে অবিশ্বাস পাপ লইয়া আসিবে, তাহাকে চূর্ণ করিবে। এই গিরি প্রবল গিরি, অনন্ত হিমানীতে তাঁহার পূজা করিতেছে। এখানে যিনি আসিবেন, তাঁহারই যোগী হইতে হইবে,

ঋষি হইতে হইবে ; তাহা না হইলে, হিমালয় তাড়াইয়া দিবে। আমাদের মনে যদি একটু পাপ থাকে, অমনি হিমালয় তাড়াইয়া দিবে, বলিবে— "আমি ইহা সহ্য করিব না, আমার রাজা জীবন্ত ও জাগ্রত, যাও নীচে যাও, বঙ্গদেশে পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাও। আমার কাছে যদি আসিবে, হিমালয়ের মত ঋষি হও, নতুবা গড়াইতে গড়াইতে ফেলিয়া দিব, চূর্ণ হইয়া যাইবে।" এখানে উপহাস করিবার স্থান নয়, এখানে হিমালয়ের সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমরা ভয়ে ভীত ও কম্পিত। এখানে হিমালয়ের দেবতার পূজা করিতে হইবে। ভগবন্, দেখা দাও, সৎ রূপে শিবরূপে ; অনন্ত বরফের উপরে তোমার তেজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হিমালয়, অবিশ্বাস-পাপ দূর কর। তোমার দেবতার কাছে অনুরোধ কর, আমরা যেন বিশ্বাসী হই, যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইলে প্রাণের বন্ধুকে হৃদয়ে ধরা যায়, তোমাকে ধরা যায়। মা, ভক্তগণকে লইয়া এস ; গৌরাঙ্গ নানককে দুই হাতে লইয়া, মাথার উপরে ঈশাকে লইয়া, বুদ্ধকে বক্ষে ধরি। হে ঈশ্বর, ভক্তের ঈশ্বর, ভীরু বাঙ্গালীরা যেন হিমালয়ের গালে চুণ কালি দিয়া না চলিয়া যায়। এখান হইতে অমনি ফিরিয়া না গিয়া, বিশ্বাসী হইয়া যাইব। ঈশ্বর, তুমি বল, হিমালয়ে আবার সত্য যুগ আসিল। সেই সোণার দেবতা আবার হিমালয়ের উপর আসিবেন। নববিধানে আবার সুখের সময় আসিয়াছে। আজ আমাদের দক্ষিণে বামে যত সাধু, আজ আমরা হিমালয়ের উপর বসিয়া দেখি, স্বর্গ পৃথিবী এক হইল। নববিধানের রথ স্বর্গ হইতে আসিল। মা যত সাধু ভক্ত লইয়া আসিলেন, হিমালয়ে মৃদঙ্গ বাজিল, শঙ্খধ্বনি হইল, গৌরী মহাদেব আর একবার আসিলেন।

প্রাণের হরি, রক্তের হরি, আমি কি তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলি ? সত্যযুগ কলিযুগের অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিল, এই কথা আমি বলি,

আর হাসি। দেবদেব মহাদেব, আমার একটী প্রার্থনা শোন, আমার একটী বন্ধুও যেন নিরাশ না হন। হিমালয়, আমাদের বেদ বেদান্ত শোনাও, মহাভারত রামায়ণ শোনাও। এসেছি তোমার কাছে, ধমক দাও কেন? শেখাও। তোমার মত শান্ত গম্ভীর অটল বিশ্বাসী কর। ধন প্রাণ সম্পদ তুমি, হিমালয়, তোমাকে বুকে রাখি। হিমালয়, এসো, বসো এইখানে, আমরা তোমার উপর তোমার দেবতাকে দেখি। প্রাণদাতা, প্রাণ-বায়ু, বুকের ভিতরে ভক্ত সহ তোমাকে দেখিব। আর যেন না শুনি, কোন ব্রাহ্ম স্বপ্ন দেখে, তোমাকে ডাকে না। কোন ব্রাহ্ম দুই মিনিট তোমার পূজা করে, এ রকম যেন আর কেহ না করে। এ সময় যদি মানুষ বিশ্বাসী না হইবে, তবে কোন্ সময় হইবে? এস, গৌরাঙ্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, এস, আমাদের কাছে এস; ঈশ্বর, এস। আমি স্বপ্ন লইব না। আমি ভাই ভগিনীকে, বন্ধু বান্ধব সকলকে, হিমালয়ের জলন্ত ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে দেবো। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তগণের সঙ্গে তোমাকে লইয়া, এবার আমরা জলন্ত বিশ্বাসী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন বস্তু

(হিমাচল, সোমবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;

১৪ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর, হে লীলারসময় হরি, অনুমতি কর, তবে বলি, আমি কি জন্য সুখী এবং কি জন্যই বা দুঃখী। আমি তোমার জন্য সুখী, হে হরি, মনুষ্যের জন্য দুঃখী। হে হরি, যাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহার

জন্য সুখী, যাহাদের পাই নাই, তাহাদের জন্য দুঃখী। দুঃখ মোচন কর, হরি। যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। হরি, তোমার একটী কলহশূন্য পরিবার হইবে, এই জন্য প্রেমফুল তোমার চরণে দিয়াছি, এই জন্য বৈরাগ্যের আগুন খাইয়াছি, এই জন্য মদ্য মাংস ছাড়িয়াছি। আমার শরীর দুর্ব্বল হইল, একটি দল করিব বলিয়া। যে দল হইয়াছে, ঠাকুর, তাহাকে ভাল না করিলে হয় না। দুঃখের দলকে সুখের দল কর। ভগবানের কোলে মাথা দিয়া থাকিব, এমন দল চাহিয়াছিলাম। টাকা কড়ি কিছু নাই, সংসারে বসিয়া সদাশিব হাসিতেছেন, এমন দল চাহিয়াছিলাম। প্রেমময়, তোমার মতন মুখ যাহাদের, সেই রকম দল চাহিয়াছিলাম। ভগবান্, দুঃখীর যতদিন না পেট ভরিবে, ততদিন কাঁদিবে। ভগবান্, লোক কত পাইয়াছি; কিন্তু সে সুখী মুখ পাই নাই, আমোদের পরিবার পাই নাই, যাহার সঙ্গে কেবল তোমার কথা বলিব। ওরা মানুষ হ'বে, সাবালক হ'বে, তারপর তোমার কাছে আনিব, আশা ছিল। বাহিরের কথা শুনিতে চাই না। তোমার সংসারের সুশৃঙ্খলা চাই। ভগবান্, সে ক'টা লোক কোথায় আছে, যাহাদের আমি খুঁজিতেছি। তাহারা কোন্ পাহাড়ে, কোন্ গর্ত্তে আছে? এ ব্যক্তি যে দল ছাড়া থাকিতে চায় না। সকালে যাই, রাত্রিতে যাই, তারাতো সুখের কথা বলে না, সংসারের ছাই কথা তারা বলে। সে দল আমার হ'ল না। হরি, দুঃখ মোচন কর। যদি দশটা পরীক্ষার মধ্যে এই একটা হয়, তবে আমি ইহা মাথায় ক'রে নেবো। আমিতো তোমাকে চেপে ধরবো না। আমি দু'টিতে সুখ চাই, পিতাতে এবং পুত্রেতে। আমি যখনই ফল খাই, আধ খানা ক'রে, পূরো ফল খাই নাই। হরি, আমার দুঃখ মোচন কর। সংসারের মাঠে প্রাণকে না জুড়োতে পেয়ে, ভক্তবৃক্ষতলে গিয়া বসি। নিম্ন ভূমিতে যদি না পাওয়া যায়, পাহাড়ে আসিয়াছি। পৃথিবীতে যদি না পাওয়া

যায়, স্বর্গে যাব। সকলের সঙ্গে যদি না পাওয়া যায়, একা সাধন করিব। পেটের দায়ে, হরি, চুরি ডাকাতি করিতে হয়। দীনবন্ধো, সেই জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি সাধু চুরি করিতে আসিয়াছি, ঈশা মুষাকে লইতে আসিয়াছি। পাঁচটি লোককে চাই, কই, সে পাঁচ জনকে তো পাই নাই। মা, তোমার কাছে গূঢ় কথা শুনিতে চাই। আমাকে যে বলে—এ নূতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই সত্য বলে; আর যারা বলে—এ দলপতি বড়লোক, এ কথা আমি শুনিতে চাই না। ভগবান্, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ, আমি তাই চাই। আমি কি, দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার ক'রতে হয় কি ক'রে, তাই শেখাতে এসেছি? আমি কি ধূর্ত্ত?

দয়াল প্রভো, আমি তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পায়, সেই সকল আমার কাছে। আমাদের দেশের খবর এরা শুন্‌তে চায় না। এরা যা নিয়েছে, তাতে সুখী হওয়া যায় না। মার কাছে যে মজার কথা শিখেছি, তা নিতে চায় না। এই হ'তেই তো দুঃখ। আমার বুকের ভিতর আসুক, মজার মজার অর্‌গ্যান সেতার পেয়েছি, শোনাই। আমাকে সকলে বলে না কেন—কি নূতন জিনিস আনিয়াছিস্, আমাদের দে; তুই একাই কি সব নিবি? মা, এই জন্য কেবল দুঃখ হয়। মা দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন, মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে থাকিয়া, নিত্য নূতন জিনিস লইয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধি

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১৫ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে ধর্ম্মগুরো, তোমার প্রসাদে, তোমার আজ্ঞায় যে নূতন শাস্ত্র বিরচিত হইতেছে, এই পুস্তককে স্পর্শ কর, আশীর্ব্বাদ কর, নিজ হস্তে লেখ। তুমি যুগে যুগে নববিধি প্রচার করিয়া, ভক্তকুলকে শাসিত করিতেছ। এবার অরাজক দেশ রাজাকে মানিতেছে না। ভক্তদেশে কেন, হে ঈশ্বর, এ প্রকার দুর্দ্দশা, বিড়ম্বনা? দীন দুঃখী ভক্তেরা পাহাড়ে আসিলেন, তাঁহারা অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইলেন না, তুমি পথ দেখাইয়া দিলে। পিতঃ, স্বেচ্ছাচার দেখিলে ভয় হয়। কৈ, নববিধি কৈ? কিরূপে অর্থব্যয় করিব, কিরূপে থাইব, ঈশ্বর, আমরা যে কিছুই জানি না। বিধি যে সকল ধর্ম্মের লোকেরা পায়; হিন্দু পায় বিধি, খ্রীষ্টিয়ান পায় বিধি, মুসলমান পায় বিধি, শিখ পায় বিধি। সকল শাস্ত্রের লোকেরা তোমার একটা একটা বিধি ধ'রে থাকে। মা, কেবল নববিধানের বিধি নাই। মা, তুমি এ সময়ে গুরু হও; এই সময়ে হওনা, মা? কৈ, বিধি কৈ? বিধিবিহীন ভারত তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে কাঁদিতেছে। তোমার পাপী সন্তান বলে, কৈ বিধি, কৈ বিধি; দুঃখী বলে, কৈ বিধি, কৈ বিধি; আমরা ভক্ত হইয়াও বলিতেছি, কৈ বিধি, কৈ বিধি? মা, আমাদের বুঝাইয়া দাও, কি ক'রে সংসার চালাইব। জননি, স্বেচ্ছাচার-নিবারিণি, একবার আমাদের বিধি কি, ব'লে দাও। মা, তুমি জান তো ঘরের কথা, বাড়ীর পুরুষেরা কি করিবে, মেয়েরা কি করিবে, ছেলেরা কি করিবে। ঘর চালাতে হয় কি ক'রে, পড়িতে হয় কি ক'রে, মা, আমরা কিছুই জানি না। মা, এই সময় তুমি পবিত্র প্রত্যাদেশ আনিয়া,

নূতন সংহিতা বাহির কর। আমরা একটি দল, তোমারি মতে চলি। তোমারি ঘর বাড়ী সকল লও। যত মরা পচা পাচ্‌কো দেব দেবী ইহাদের সকলেরই মন্ত্র তন্ত্র আছে ; কেবল আমাদের, সত্যস্বরূপ, তোমারি কি মন্ত্র তন্ত্র নাই ? এ শতাব্দীর ভক্তেরা আলোকবিহীন হইয়া নরকে যাইবে ? মা, এই জন্য কি নববিধান আনিয়াছিলে ? মা, তা আমরা কখনই বিশ্বাস করিব না। মা, আমরা যেন তোমার নববিধি বিশ্বাস, করি। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আর স্বেচ্ছাচার না করি, আমরা তোমার শাস্ত্র মানিয়া, তোমার প্রত্যাদেশ শুনিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দেবী লক্ষ্মী

(হিমাচল, বুধবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১৬ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে গৃহলক্ষ্মি, তোমার সংসার তুমি কর, আমরা দেখি। সংসারে যে ধর্ম্ম আছে, সংসারে যে তুমি আছ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। উপাসনার সময় যে তুমি আছ, তাহা তো সহজে বুঝা যায় ; কিন্তু চাল ডালের ভিতর যে তুমি আছ, তাহা বুঝা বড় কঠিন। ভক্তিভাবে, মা, তোমার প্রেমগান করিলাম, মা, তোমার চরণে প্রেমফুল দিলাম, সহজে ; কিন্তু সংসারের চালের ভিতর তোমাকে দেখা বড় শক্ত। আমাদের ভাণ্ডার নিরীশ্বর, খাবার ঘর নিরীশ্বর, শোবার ঘর নিরীশ্বর। এ সকলেতে সমস্ত দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কোন্ বিধানবাদী, কোন্ ভক্ত তোমাকে দেখেন ? আজ পাঁচিশ বৎসর সংসার করিলাম, লক্ষ্মীকে

দেখিলাম না। মা লক্ষ্মীর সংসার করিতে কে পারে? কেবল তুমি পার। ভক্তেরা কে কোথায় তোমাকে নিয়ে সংসার করিয়াছেন, দেখিতে পাই না। সেই জনক ঋষিরাই সংসারে লক্ষ্মীকে দেখিয়াছেন। কে আবার লক্ষ্মীকে মানে? পেটটা ভরিলেই হইল। মা লক্ষ্মি, ঘরের লক্ষ্মি, ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে, বনের লক্ষ্মীকে খুঁজিতে আসিলাম। বাড়ীতে তোমাকে না পেয়ে এখানে আসিলাম, এখানেও তুমি ধরা দিলে না; মা, তবে ঘরে থাকি। ঘরে সাধন করিতে পারিলাম না ব'লে পাহাড়ে আসিলাম, এখানেও, মা, তোমাকে পাইলাম না। ইচ্ছা বড় যে, সংসারটা তোমার হয়। আমার বাড়ী কখনও নাস্তিকের বাড়ী হইবে না। মা, কি অধর্ম্ম হ'য়েছে যে, এ বাড়ীতে পাপ লোভ রাগ হ'বে? মা লক্ষ্মি, ছেলেবেলা হইতে, বুঝি, তোমার পূজা করি নাই; কেবল বেদে পুরাণে আকাশে এক ঈশ্বরকে ডাকিয়াছি। হে প্রেমস্বরূপ, আমার প্রতি দয়া কর। ভক্তের বাড়ী নিরীশ্বর হইতে দিও না, এখানে নাস্তিকতা আসিতে দিও না। মা, তোমার এই ঘর সোণার ঘর হ'বে। মা লক্ষ্মী আমার সব করেন। আমি আর মানুষকে বিশ্বাস করিব না, মা লক্ষ্মি, তোমাকেই বিশ্বাস করিব। মা, তোমার ইচ্ছা যে, আমার বাড়ী ঘর তোমার হয়। মা, তুমি সকলি পার; ভক্তের ঘরে পার না তো, কাহার ঘরে পার? মা, এখানে তোমার জোর আছে। হাসিতে হাসিতে, মা লক্ষ্মি, ভক্তের ঘর করিতেছ। মা, আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর। তোমার সংসারে কেহ লোভী হইতে পারে না, কেহ হিংসা করিতে পারে না। মা, পরলোকের ত এখন দেরী আছে, এখন ঘরে ত তোমায় দেখি। লক্ষ্মি, বাড়ী সাজাও, স্বর্গের ফুল এনে সাজাও, স্বর্গের ঝাঁটা এনে ঝাঁট দাও। মা, স্বর্গের সংসার করিয়া দাও। মা জননি, তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া দেখে পরিত্রাণ পাইব, তোমার রান্না

দেখিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিব। মা, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অসার সংসার ফেলে দিয়ে, লক্ষ্মীর সংসার স্থাপন করিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চির উন্নতি

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১৭ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে পরিত্রাণকর্ত্তা, আমরা সকলে উন্নতির পথের যাত্রী। আমরা এক রকম জড়ের মতন থাকিব, ইহা তোমার ইচ্ছা নয়। তুমি যাহাকে মানুষ বলিয়াছ, সে যে উন্নতিশীল হইয়া, এই রকম ক'রে কোন প্রকারে তোমার পূজা করিয়া জীবন শেষ করিবে, ইহা তোমার বিরুদ্ধ কাজ। আমরা শ্রান্ত হ'য়ে পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিব না, এ কথা বলিলে, পিতঃ, তুমি বিরক্ত হও। বৃদ্ধই হউক, যাই হউক, দৌড়াইতেই হইবে। মা, তুমি বলিতেছ তবে তুই মানুষ হ'লি কেন? যদি তুই কাঠের মতন, পাথরের মতন পড়ে থাকৃবি তবে মানুষ নাম নিলি কেন? তুমি বলিতেছ, তোকে আমি সোণার মুকুট পরাব বলেছি, তুই কেন তবে কাঠের কাছে, পাথরের কাছে যাস্? তুমি বলিতেছ, চলে আয় না ; সংসার বিশৃঙ্খল হয়েছে, তবে কি আর ভাল হ'বে না? তোমার বৃদ্ধ সাধক ও উল্ট বুঝিয়া বিরক্ত হয়, একটি দুটি তিনটি করিয়া সকলে ঐ কথা বলে। মা দয়াময়ি, ইহা ত তোমার ইচ্ছা কখনই নয়। আমাদের অগ্রসর হইতেই হইবে। ইহাদের যে চড়া প'ড়ে গেল। যে রাগী, তাহার কি রাগ যায়? যে লোভী, তাহার কি লোভ যায়? যার হৃদয়

শুকিয়ে বালী হ'য়ে গেছে, তাহার হৃদয়ে কি জল হয়? আমরা যে অনন্তকাল তোমার প্রেমে বাড়িব। আর যাত্রী চলিল না, ঘণ্টা দুই না চলেই পথিক বলে, আর পারিব না; এ সকল মিথ্যা কথা, আমাদের যে, মা, আশার ধর্ম্ম উন্নতির দিকে চলিতেই হইবে। এ ঘরে তেল পড়েছে, ও ঘরে কাগজ ছড়ান, ও ঘরে পচা ফল, এ সব অলক্ষ্মীর ঘর। লক্ষ্মীর ঘর আর নাই, লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন। আজ গুছিয়ে উঠিতে পারিলাম না, কাল গোছাইব, এ সকল বিশ্বাস করিতে দিও না। কাল রেগে মরেছি বলিয়া আজও রাগিব? কালকে পাথরের মত শক্ত হৃদয়ে ভাইকে গালাগালি দিয়াছি বলিয়া আজও দিব?

অলক্ষ্মি, আর কত দিন থাকৃবি আমাদের বাড়ীতে, সর্ব্বনাশী? তুই কি লক্ষ্মীকে আসিতে দিবিনি? মরণ পর্য্যন্ত কি তুই থাকৃবি? মা, তোমার মেয়েরা ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে, তাহাদের পরীর মতন হাত, কাল হইয়া যাইবে। মা, তোমার রাজ্যে বাবুয়ানা বাড়িয়াছে, তা তুমি ব'সে ব'সে দেখিতেছ। মা, আমরা কেবল যোগ ধ্যান করি, উচ্চ কাজ করি, ঘর ঝাঁট দিব কেন? এ সকল কাজ চাকরের। আমরা লম্বা লম্বা প্রার্থনা করিব, একতারা লইয়া গাছতলায় বসিয়া গান করিব। আমাদের ঘরে যদি তেলের দাগ থাকে, বাসনে যদি ময়লা থাকে, তাহা হইলে কি নরকে যাইব? তেলের দাগ আমরা উঠাব কেন? মা, তোমার গরিব দাস এ সকল মানে না; সে বলে, ঘর অপরিষ্কার থাকৃলে তাহার জন্য নরক আছে। বাড়ীতে কাহারও সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই। মা, তবে উন্নতি হইবে কবে? পরলোকে গিয়া মারধোর খাইতে হইবে? আমি বলি, এইখানে সেই কাজ করিলেই তো হয়। মা, তোমার ঘর ঝাঁট দিব, ইহাতে আবার অপমান কি? উন্নতি চাই, খারাপ হ'য়েছে বলিয়া কি ভাল হইবে না? মা, যা হইবার তা হইয়া

গিয়াছে, এবার লক্ষ্মীর সংসার স্থাপন করিব। মা দয়াময়ি, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ঋষি-দৃষ্টি

(হিমাচল, শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১৮ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে আর্য্যপিতা, আমাদের পিতৃপুরুষ বড় সৎ ছিলেন। আমি নীচ হইব ? আমরা কেন নীচ হইব ? ঠাকুর, উচ্চ প্রকৃতি দিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদের উপযুক্ত করিয়া লও। কেহ কেহ বলেন, আর্য্যপুরুষেরা ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্র বরুণকে মানিতেন। ঈশ্বর, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এ রকম ছিলেন বটে মানি, কিন্তু তাঁরা নাকি সকল সময়ে তোমাকে দেখিতেন, তাঁহারা জলে কেবল জলের দেবতাকে দেখিতেন। হরি হে, আমরা যে বড় বিদ্বান্। কিন্তু, হরি, আমরা কেন সে রকম তোমার পাদপদ্ম জলে স্থলে দেখিব না ? ঈশ্বর, তাঁহাদের বুদ্ধি দেখে বলিহারি যাই। মা, আমরা বাতাস থেকে তোমাকে বিদায় দিয়া, বাতাসকে নিরীশ্বর মনে করিতেছি। মা, তাঁহারা সকলে পাহাড়ে বসিয়া, হাত জোড় করিয়া, বাতাসের ভিতর তোমাকে দেখিতেন। ওরে কাণা চক্ষু, তোরা বিদ্বান্ হ'য়ে কিছু দেখ্‌তে পেলিনি ? আহা ! তাঁহারা কি ভক্ত, জলে স্থলে সকল স্থানে, মা, তাঁহারা তোমাকে দেখিতেন। আমাদের কাণা অবিশ্বাসী চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না। কাণা ছেলেরা মাকে দেখিতে পায় না, জলদেবতাকে দেখিতে পায় না। কাণা ছেলে খানায় প'ড়ে কাঁদিতেছে। কাঁদুক্, কাঁদুক্, আরো কাঁদুক। মা, আমরা

জলে, স্থলে, আকাশে, আগুনে, বাতাসে, সকল স্থানে তোমাকে দেখিব। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, যে দিকে তাকাইব, তোমাকে দেখিব। পূর্ব্ব-পুরুষেরা! কোথায় কোন্ পাহাড়ে রহিলে, আমাদের জাগাইয়া দাও। আমাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া দাও, উঠে একবার দেখি। মা, আমরা কিছুই দেখিতে পাই নাই। আহা! অমন টানা টানা চক্ষু কোথায় পাই? ধন্য চক্ষু! ধন্য চক্ষু! মা, তোমার ছেলেরা যেন চামারের ছেলে না হয়। আবার আমরা উৎসব করি, বাপ মার নাম রাখি। হতভাগা ছেলে হ'য়ে বলি, মার নাম ডুবালাম। আমরা কাণা হইয়া রহিয়াছি, ভারত সন্তানের দুঃখ আর কে বর্ণনা করিবে? কি হ'লো, মা? দাও দিব্যচক্ষু কাণাগুলোকে। ইচ্ছা হয়, আবার ঋষিভাবে ইন্দ্র বরুণকে জলের ভিতর দেখি। কাণাদের দৃষ্টি হউক, বাপ পিতামহের নাম রাখি। মা, তোমার সর্ব্বদুঃখহারিণী মূর্ত্তি বাপ মারা দেখিতেন। দর্পহারী, আমাদের অহঙ্কার দূর কর, আমরা যেন আর্য্যঋষিদের মত সকল সময়ে, সকল স্থানে, তোমাকে দেখে শুদ্ধ হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমে একত্ব

(হিমাচল, শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১৯শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে পরমাত্মন্, বাহিরের তত ভাল নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম-মিলন, তাহাই ভাল। যদি আমরা বাহিরে বলি, পরকে ভালবাসি, সে ভালবাসা অসার। হে হরি, আমরা যদি অন্তরে অন্তরে ভালবাসি, সেই আসল সুমিষ্ট। হরি, আমরা এখানে আসিয়াছি বলিয়া সেখানকার

সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল। যত দূরে থাক, তত প্রণয়, আমরা তোমার শাস্ত্রে এই শিখিয়াছি। মানুষের ভিতর যে প্রেম, সেই যথার্থ। শরীর দূর হয়, মন কি, ঠাকুর, দূর হয়? মা দয়াময়ি, বল, প্রেমের কি এমনি নিয়ম, যাই শরীর তফাৎ হইল, অমনি প্রেমও তফাৎ হয়? যত বিচ্ছেদ, তত প্রণয়। কোথায় প্রাণের ঈশা মুষা, তাঁরা কত দূরে? না, তাঁরা কাছে রয়েছেন। প্রেমের সম্বন্ধ কি এত নিকট? আমাদের ভক্তগণ কলিকাতায় ব'সে তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, গান করিতেছেন। আর তাঁরা যদি বলিলেন, তফাৎ, তফাৎ হইলাম। তাঁদের প্রাণের বন্ধুকে যদি তফাতে রাখিলেন, রহিলামই বা। আর যদি প্রেমের বন্ধন থাকে, তবে প্রাণে প্রাণে যোগ থাকিবে। যদি ঝেড়ে ফেলে মুখে বলে, "ভাই ভাই", "বন্ধু বন্ধু", তবে বিচ্ছেদ হইল। পাহাড় বলিল, দাঁড়া দাঁড়া, বিচ্ছেদ হয়েছে। এক দিকে দেখিলে, যেন হৃদয়ের মাঝে বিচ্ছেদের বড় বড় পাহাড় রহিয়াছে, আর এক দিকে প্রাণে প্রাণে যোগ। মা জননি, প্রেমের রাজ্য আনিয়া দাও, অন্তরে অন্তরে দেখা সাক্ষাৎ হউক। তফাৎ তো নই, আমরা সকলে হিমালয়ে ব'সে আছি। হে আনন্দময়, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার সঙ্গে সে দল লইয়া থাকা জমাট প্রেমের কথা। যেখানে থাকি, কয়টিতে এক হ'য়ে থাকি। মা, তাহাদের মনটাতে একবার বিশুদ্ধ প্রেম আনিয়া দাও। যদি ভালবাসি, তো প্রাণের ভিতর ভালবাসিব। তোমার কাছে দেখিব, সকলে একখানি হইয়া রহিয়াছি। মা, পুণ্যেতে এক কর, প্রেমেতে এক কর। ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে এক হইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কর। যেখানে যত সাধু আছেন, সকলের সঙ্গে আমাদিগকে এক কর। যে প্রেমেতে ছাড়াছাড়ি হয় না, যে প্রেমেতে সকলকে এক করিয়া রাখে, মা, আমাদিগকে এমন প্রেম দাও। এই আশীর্বাদ কর, আমরা

যেন, যে সাধুদের শরীর নাই, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া একখানি পরিবার হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পুষ্পভাব

(হিমাচল, রবিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২০শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে দিব্যধামবাসী, যে হস্ত পুষ্প রচনা করিয়াছে, সে হস্ত কেমন সুন্দর ! যে মন পুষ্পের রং কল্পনা করিয়াছে, সে মন কেমন ! পর্ব্বতে তোমার গাম্ভীর্য্য, হে বিশ্বপতি ; পুষ্পেতে তোমার সৌন্দর্য্য, হে বিশ্বনাথ। হে হরি, তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য পুষ্প রচনা করিলে। স্বর্গের ফুল যেন সাধু, পৃথিবীতে আসিয়াছে। পৃথিবী নরক, নরকের স্থানে পুষ্প কেন ? কুসুম থাকিবে তাহার কাছে, যার হৃদয় কুসুমের মতন। আমরা পাপী কৃষ্ণবর্ণ, আমাদের কাছে ফুল আসিয়াছেন, ইহা ভাবিলে সুখী হই। হে সুকোমল পুষ্প, তোমাদের বাড়ী কোথায় ? তোমাদের কে রচিল ? তোমরা কেন পাপীকে আজ দেখা দিলে ? পরী, সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, তোমরা কেন আসিলে ? তোমরা মার কাছে ফিরিয়া যাও। এ দুর্গন্ধময় স্থানে কেন আসিলে ? আবার উড়িতে উড়িতে মার কাছে যাও। মা, ফুল তো গেল না, আমাদের গায় বসিল। ইচ্ছা তোমার বুঝিলাম, আমরা ফুলের মতন লাবণ্যযুক্ত হইব ; যেমন তোমার দশটি ফুল দশ রঙ্গের, তেমনি আমরাও সকল সাধু একখানি হইয়া তোমার পূজা করিব। মা, তুমি যে পুষ্পশ্রেষ্ঠ, তোমার গাময় পুষ্প। আমি কাঠের দেবতা মানি না, পাথরের ঈশ্বর পূজি না, ঠিক

ফুলের মতন সুন্দর যিনি, সেই ঈশ্বর আমার। ফুল দিয়া সাজাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আবার হাসি পায়, ফুলের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। আমার গোলাপ তুমি, আমার জুঁই তুমি, আমার চাঁপা তুমি, আমার গন্ধরাজ তুমি। আমার লাল ফুল তুমি, আমার সাদা ফুল তুমি, আমার সবুজ ফুল তুমি, আমার নীল ফুল তুমি; তবে, ঈশ্বর, আমি কেন কষ্ট পাইব? দেখিতে ভাল, শুঁকিতে ভাল, বুকে রাখিতে ভাল; এমন ফুল পেয়ে আমি রাখিব কোথায়? মাথার উপর রাখি, বুকের ভিতর রাখি। বায়ু ফুল, আকাশ ফুল, বৈকুণ্ঠ ফুল, ফুলে ফুলে একাকার। মা, এই ফুলের বাগানে আমাকে রেখো। ফুলবাগান ছাড়িব না, ফুলবাগান আমার আছে কেবল একটি ফুল। আমার ফুল ফুটেছে, ফুটেছে ব'লে, পাগলের মত চীৎকার করি। হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া বলি ভারতকে, দেখ, আমার ফুলের বাহার কত! সকলকে ফুল লইতে বলি। হে ঈশ্বর, গ্রন্থ পড়িয়া শ্মশানে সাধন করা বড় নিগ্রহ। ফুলের মত তোমাকে যেখানে সেখানে দেখা বড় সুখের। বৈকুণ্ঠ আবার পুষ্প উদ্যান লইয়া আসিল। গোলাপের বৈকুণ্ঠে দিন কত ব'সে থাক। হে ঈশ্বর, এমন প্রেমেতে সুন্দর তুমি, আমি আবার বলি, আমার বন্ধু নাই! মা, তুমি যখন আমার গায়ে হাত দাও, গা শিহরিয়া উঠে, ঠিক যেন গোলাপ ফুল আমাকে স্পর্শ করিল। যখন চোক দিয়া মাকে দেখি, ঠিক যেন চোকে গোলাপের পাপ্‌ড়ী ঠেকে। যখন উপাসনা করি, কতগুলি গোলাপ ফুল আমার বুকে। বৈকুণ্ঠ আসিল, গোলাপের উদ্যান আসিল। তাহাতে ঈশা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, পাঞ্জাবের গুরু নানক, সকল ভক্ত-মধুকর সুধাপান করিতেছেন। মা, তোমার চারিদিকে মধুকর রহিয়াছে। বড় মধুকর, ছোট মধুকর, তাহাদের ভিতরে আমিও একটি মধুকর্ সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি। হে হৃদয়বন্ধো, আমাদের মধুময় কর।

মধুময় চিন্তা, মধুময় কথা, সব মধুময় হউক। ফুলের মতন, মা, শরীর হউক, ফুলের মতন মন হউক। নিষ্পাপ নির্ম্মল হই। মা, তুমি যদি ফুলের মতন কর, তবে এখনই ফুলের মতন হই। ফুল কাঁধে রাখি, বুকে ধরি, হস্তে করি; প্রাণ কুসুম হউক। বাহারে ফুল, তোমার কাছে বসিলে কেবল ফুলের কথা বলি। ভগবানের ফুল আমি চুরি করিতে আসিয়াছি। আজ যত ফুলের মধু লইয়া সকলকে খাওয়াইব। এই তো নববিধান, সকল ফুলের রস লইয়া দেশে গিয়া বলিব, দেখ, ভাই, এই নববিধান। সকলে এই রস পান করিয়া সকলকে মাতাও। দীন-নাথ, প্রেমপুষ্প, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পুষ্পের মতন হই। পুষ্পময়ি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে থাকিয়া, ফুলের মতন সাধু এবং কোমল হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার কাজ

(হিমালয়, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
২১শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, হে আমাদের মঙ্গলময় প্রভো, খুব উচ্চ ধর্ম্মের কার্য্য করিলেও মানুষ তুষ্ট হয় না। আমি দেখিয়াছি, জীবের আচরণ ব্যবহার, সংসারে তোমার কত কাজ করিয়াও তাহার মনে সুখ নাই। হে পিতঃ, তোমার কাজ করিলে, ভাল কাজ করিলে, ধর্ম্ম করিলে কি মন খারাপ হয়, অসুখ হয়, রাগ বৃদ্ধি হয়? তোমার কার্য্যালয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলে কি কষ্ট হয়? এই তো চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি। তা হ'বেই তো, মা, বিশ্বাস না করিলে কেন সুখ হইবে? আপনার লোক যদি

একটি ভাল জিনিষ খাইতে চান, তাহা অনেক পরিশ্রম করিয়া দিতে হয়; তবুও তাহা দিব, কেন না বন্ধু চাহিতেছেন। আর যেখানে বন্ধুর ইচ্ছা বুঝিতে পারি না, সেখানে ভাবি, কি বলিলেন, কে বলিলেন? ঠিক আদেশ শোনা চাই। তোমার মুখে ঠিক শুনিতে না পাইলে কিছুই হয় না। আমি যদি, মা, কথা না বুঝিতে পারিলাম, তবে মিথ্যা খেটে কি হ'বে? মদ খাওয়াও যা, হাড়ভাঙ্গা ধর্ম্ম করাও তাই। মা, তোমার কথাটী শুনে কাজ করিলে যত সুখ হয়, আন্দাজে ধর্ম্ম করিলে সে রকম হয় না। মা, তুমি যদি বল, সন্তান, আমাকে দু'টি ফুল এনে দে, আমি রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে ফুল আনিয়া দিলাম। যখন ফুল আনিলাম, হাত পাতিয়া তুমি ফুল লইলে, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, কত সুখ হইল। আর কাজ কাজ করিলে কি হইবে, মা? আর কিছু চাই না, সংসার কাড়িয়া লও। আর বক্তৃতাও করিতে চাই না। মিথ্যা খেটে মর্‌বো? বলে, যার জন্যে খেটে মরি, সেই বলে চোর। ওরে ভোলা মন, পরের ব্যাগার খেটে মরিতেছিস্ কেন, প্রচার করিতেছিস্ কেন? মা, খেটে খেটে প্রাণ গেল, কিছু হ'ল না। মিথ্যা ধর্ম্ম করিলাম, মা আদরিণীর কথা শুনিতে পাইলাম না। আমরা খেটে মর্‌ছি। প্রাণেশ্বরী কেবল মাথা নাড়িতেছেন, আর বল্‌ছেন, ও নয়, ও নয়, কেন অত লিখ্‌ছিস্, কেন অত খাট্‌ছিস্, আমি কি তোকে বলেছি, ও কাজ করিতে? মা, কথা কও। বল, মেয়ে আমার, আমাকে বাট্‌না বেটে দাও, আমি রাঁধিব; আমাকে ঐ ফুলটি পেড়ে দাও, আমি দেখিব। মা, বল বল, আরো বল। মা আমায় যা করিতে বলিবেন, আমি তাই করিব। আমি বইয়ের মত লইয়া চলিতে চাই না। আমি মার কাজ করিব। আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, জগদীশ্বর, দূর ক'রে দাও তোমার মন্দির হইতে। তোমার কাজ করিলাম, তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, আমার প্রাণটা

ঠাণ্ডা হইল। কেউ শুনিতে পাইল না, সকলে বলিল, দু'টি ফুল তুলে আহ্লাদ দেখ। বলুক, মা, গোপনে তোমার কাছে কত আহ্লাদ হইল। মিথ্যা খাটিতেছি কেন? মরিবার সময় কাঁদিব, আর বলিব, এত খাটিলাম মিথ্যা, মা একবারও কিছু বলিলেন না। মা, এরা কত দিন খাটিবে? মা, তুমি কথা বলিবে না, এরা মার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে না? আর কি আমি এখন কাজ করিতে পারি? জানি, মিথ্যা খেটে মর্‌বো, পয়সা পাব না। সমস্ত দিন খাটিয়া বলিব, ওগো, পয়সা দাওগো, ওগো, পয়সা দাও। ঐ জন্যে তো কাজ ছাড়িয়াছি। তাই, মা, তোমার কাজ করিতে আসিলাম। তোমার কাজ করিয়া আশীর্ব্বাদটি পেলাম, আর নগদ লক্ষ টাকা পেলাম। মা, তোমার কাছে এলাম, তুমি বলিলে, এই দুধটুকু খা, খেলাম, অমনি চারিটি পয়সা দিলে। খেলাম, তবু দিলে। বলিলে, ঐখানে ব'স, বসিলাম, দুই লক্ষ টাকা দিতে বলিলে। ওরা মিথ্যা মিথ্যা খাটিয়া মরিতেছে কেন? মা, এমনি তুমি আদর কর, ইচ্ছা হয়, সকলে তোমার কাজ করে। হে মাতঃ, হে দীনতারিণি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, মা, তোমার কাজ করিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দীনতা

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২২শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে বাড়াইয়াছে, কি তুমি মানুষকে বাড়াইয়াছ? ইহা ভাবিলে, ঈশ্বর, লজ্জা বোধ হয়।

তুমি কত বড়, মানুষ একটা কীট। উচিত, মানুষ তোমাকে খুব বড় করিবে ; কিন্তু দেখ, হরি, বিপরীত হইল, তুমি মানুষকে বাড়াইলে, মানুষ তোমাকে বড় করিল না। তুমি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া মানুষকে কাছে বসাইলে। লজ্জিত হইলাম, ঠাকুর ; কার কাছে বসিলাম ? এই জিহ্বাকে তোমার পবিত্র নাম করিতে দিলে। এই হাত অশুদ্ধ, যাহা ভাই ভগিনীকে বধ করিতে গেল, এই কলঙ্কিত হাত তোমার চরণে রাখিতে দিলে। মা, এই মন কত পাপ চিন্তা করে, তুমি এই মনে ভক্ত সাধুদের লইয়া আসিলে। এই বাড়ীতে কত পাপ হইতেছে, তোমার দয়া দীন দুঃখীদের কাছে তবু আসিতেছে। ভাবিলে লজ্জায় মুখ অবনত হয়। পিতঃ, কি করিলে, মানুষকে কত বড় করিলে! আমি তোমাকে ছুঁতে পারি না, আমার এই অপবিত্র জিহ্বা তোমার দীনবন্ধু নাম করে। মা, তুমি আমায় কেন এত বাড়াইলে ? আমরা নরকের কীট, নরকে প'ড়ে থাকিব, কেন আমাদের স্বর্গে আনিলে ? আবার বলি, এত আদর কেন আমাদের ? দূর ক'রে ফেলে দাও, নরকের আগুনে পুড়ি। পিতঃ, এত আদর কেন ? বৎসরের মধ্যে কত নূতন ফল খাওয়াইলে। সংসারের প্রচুর সুখে সুখী করিলে। আমি তোমাকে কি করিলাম ? তোমাকে রাজার রাজা বলিয়া কাঁধে বসাইতে পারিলাম না। পরমেশ্বর, মানুষকে এত আদর করিলে, পাহাড়ের উপরে ক্ষুদ্র কীটকে বসাইলে। মা, এই মিনতি করি তোমার শ্রীপাদপদ্মে, এত আদর পেয়ে যেন খারাপ না হই। যার বাড়ীতে মার এত অপমান, দিন রাত্রি, মা, তুমি এসে সেখানে ব'স! মা, তুমি কত গরিবকে বড় মানুষ করিলে, কত ধন দিলে, গরিবের ধন, গরিবত্ব কোথায় ছুটে গেল। মা, তুমি গরিবকে ধন দিলে, দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। মা, আমাদের কি হইল, আমরা এত পেয়েও সন্তুষ্ট হই না। মা, আমাদের কোথায় আনিলে ?

এ কি দেবতাদের মধ্যে, এ কি অমৃত-সরোবরের ধারে? এ কি? কোথায় আসিলাম? মা, এত আড়ম্বরের মধ্যে থেকে যেন ছাই হইয়া না যাই। তুমি আমাদের এত আদর কর, এত দিতেছ, এইটি বিশ্বাস করিয়া যেন বিনম্র হইয়া থাকিতে পারি, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার কার্য্য দর্শন

(হিমাচল, বুধবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৩শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, ভারতবন্ধো, অপূর্ব্ব কৌশলে তুমি ভারত উদ্ধার করিতেছ। আমি দেখি আর বিস্ময়াপন্ন হই, আমি দেখি আর আনন্দিত হই। এত বড় দেশ, এত বড় জাতি অন্ধকারে পড়িয়াছিল, কেমন আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আনিতেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীতে আনিলে। হে ভারতেশ্বরি, তোমার সোণার ভারতকে তুমি যেমন ভালবাস, এমন আর কে ভালবাসে। তুমি তোমার ভারতকে ভালবাস, সেই জন্য আবার বেদ বেদান্ত টানিতেছ, আবার কত নূতন ফিকির বাহির করিতেছ। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না, কেবল ভাবুক ভক্ত বুঝিতে পারেন। মা, তুমি যেমন জান, এই দেশ কিসে ফিরিবে, এমন কি আর কেহ বুঝিতে পারে?

মা, একবার বেদ বেদান্ত আনিয়াছিলে, আবার নূতন বেদান্ত আনিতেছ। পর্ব্বতেশ্বরি, পাহাড় কাঁপাইতেছ, সমুদ্র কাঁপাইতেছ, অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছে তোমার নূতন বিধির জন্য। তুমি যে ভারতকে বাঁচাইবে,

তার প্রকৃত উপায় করিতেছ। হে প্রেমরূপিণি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মা, তুমি আবার ভারতকে উদ্ধার করিবে, তাই কত কৌশল করিতেছ। সেই প্রাচীনকালের বেদ বেদান্ত হইতে সমুদয় বাহির করিতেছ। সর্ব্বধর্ম্ম এক করিবে, সেই জন্য এই সকল করিতেছ। ধন্য, নববিধানের রাজা! ধন্য, নববিধানের রাজা! সরস্বতি, তুমি সকল জ্ঞান বাহির করিতেছ। মা সরস্বতি, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, আমরা যেন তোমার কাছে থেকে, তোমার নূতন সংহিতা পড়ি। তোমার নাম তুমি আপনি গান কর, আমি শুনি।

ভারতের দেবী যে কি করিতেছেন, একবার ভারতবাসীরা এই পাহাড়ে এসে দেখুক না! কত বিশ্বকর্ম্মা লেগেছে স্বর্গে। কত শব্দ হইতেছে আকাশে। এখানে প্রাচীর হইতেছে, এখানকার জিনিস ওখানে গড়্ গড়্ করিয়া পড়িতেছে। কি হইতেছে? নূতন পৃথিবী, নববিধানের স্বর্গ প্রস্তুত হইতেছে। এ সকল কি যে সে সময়ে হয়? মা ভারত উদ্ধার করিবেন বলিয়া কি করিতেছেন, একবার এসে সকলে দেখ না। সব দেবদেবীরা ঘর সাজাইতেছেন। ওরে মূঢ় ভারতবাসী, তোরা একবার পাহাড়ে এসে দেখ্ দেখ্। আমার ইচ্ছা করে, অল্প-বিশ্বাসীরা একবার এসে দেখে, মা, তুমি কি করিতেছ। মা কোমর বেঁধে কত খাটিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিতেছেন। ভাবুক বলিতেছে, জ্ঞান না, মা সকল জ্ঞান এক করিতেছেন। মা, আমাদের বিশ্বাসচক্ষু খুলে দাও, একবার দেখি, তুমি কি করিতেছ। কত আদেশ প্রত্যাদেশ চল্লিশ ঘোড়ার রথে করিয়া আসিতেছে। আহা! হরি, কবে দেখিব, চক্ষের সমক্ষে এই সকল হইতেছে। আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি বলি, মা নূতন বিধান আনিতেছেন, রোজ কি ব্যাপার হইতেছে, তোরা একবার দেখ্; আমার কথা কেহই বিশ্বাস

করিবে না, বলিবে, কল্পনা করিতেছে। মা, তুমি সকলের চক্ষের সমক্ষে দেখাও। দেখি, তোমার কাজ দেখে প্রশংসা করি। মা, তুমি কত ফিকির জান। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার হস্তের কার্য্য সকল বিশ্বাসচক্ষে দেখিয়া, তোমার মুখের অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

রাজভক্তি *

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৪শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে রাজভক্তি মিলাইয়া তোমার পূজা করিব, কৃপা করিয়া পূজা গ্রহণ কর। আজ রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে, ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরো আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারই দাস ; হে গুরো, আমরা তোমারই সন্তান। হে পরম পিতঃ, আমরা সংসার জানি না, পরিবারের পিতা মাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলই তুমি, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারই। আমাদের ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই রাজ্ঞী তোমারই প্রেরিত, এই আমরা মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে তেমনই আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার, তাহাই আমার, তাহাই

* মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে প্রার্থনা।

আমাদের ; যাহা তোমার নয়, তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজ্যটাজ্য মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি।

আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুকুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজ্য, তোমারই ভিতরে এই রাণী। এই আর একখানি রূপ। মা, কত রূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যত দিন বাঁচিব, তোমার কীর্ত্তি মাথায় করিব। মা, তাই, আজ তোমার কন্যার জন্মদিন, তুমি তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সকলের অপেক্ষা বড় যে সিংহাসন, তাহার উপরে বসাইতেছ। সমুদ্র পর্ব্বত তাঁহাকে রাজভক্তি দিবে। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা তাঁহাকে রাজভক্তি দিব না? মা, তুমি যাঁহাকে রাজ্যেশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক যাঁহার অধীনে, আমরা তাঁহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে, "তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইঁহাকে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি, সব দিবে।" মা, আমাদের যাঁহাকে যাহা বলিতে বলিবে তুমি, আমরা তাঁহাকে তাহাই বলিব। মা, আজ তোমার কাছে কত হীরা, মুক্তা, পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালী সকলে রাজভক্তির গান করিতেছে। মা, ভাগ্যে আজ তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তাই দেখিতেছি, তুমি আজ তোমার সদ্গুণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্না রাজকন্যাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ যখন আমি দেখিলাম, রাজকন্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, তখনই শুনিলাম, তুমি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছ, "ভারতের রাণি, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।" অমনি স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহারাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে।

তুমি একবার বল, রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয়, মার জয়! মা, তুমি একবার সকল ভক্তকে লইয়া, তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া, এইখানে ব'স, আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমরা রাজ্যটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে! যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে? যে বলিল তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি, রাণি, এমন রাজভক্তি আর কার হ'তে পারে? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও; আর রাজার রাজা তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য, নব-বিধানের রাজ্য আমরা কুশলে রাখিব। মা, আমরা কয়টি তোমারই দাস, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারই চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসম্বাদ দূর কর, আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া, কুশলের রাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চির-স্নিগ্ধতা

(হিমাচল, শুক্রবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৫শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মঙ্গলস্বরূপ, হে শান্তিকমল, অগ্নিময় হৃদয়ে তুমি শান্তি হও, উত্তেজিত মনের তুমি সমতা হও, রাগীর তুমি ক্ষমা হও, অপ্রেমিক

বিদ্বেষীর তুমি প্রেম হও। হে ঈশ্বর, সংসার আগুন, স্বর্গ জল। হে ঈশ্বর, টাকা কড়ি মায়া মমতার জ্বালায় জ্বালাতন, পুণ্য এবং প্রেমে শান্তি তুমি। হে ঈশ্বর, আমরা যেখানে থাকিতাম, সে গরম স্থান; আমরা যেখানে আসিয়াছি, এ স্থান শীতল। হে ঈশ্বর, নিম্ন ভূমিতে কোলাহল, উচ্চ ভূমিতে নিস্তব্ধতা। যদি উচ্চ ভূমিতে আনিলে, তবে মনকে শীতল কর। গায়ে হাত বুলাইয়া ঠাণ্ডা কর। বাল্যকাল হইতে জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি—চিন্তার জ্বালা, রোগের জ্বালা, অপমানের জ্বালা, উৎপীড়নের জ্বালায় আজ কত বৎসর জ্বলিতেছি, একবার গণনা কর। পথিক আর পারে না, শান্তিদাতা, শ্রান্তকে শান্তি দাও। আর মনও এমনই হইয়া আসিতেছে যে, আর অশান্তি সহিতে পারে না। একটু যদি গরম বাতাস লাগে, অমনই, ঠাকুর, দেহ মন কাবু হইয়া পড়ে। অত্যুক্তি করিব কেন, হৃদয়ের ঠাকুর, হৃদয়ে থাকিয়া দেখিতেছ। একটু গরম শরীর সহ্য করে না, একটু গরম আত্মা সহিতে পারে না। ইচ্ছা হয়, এমন স্থানে যাই, যেখানে কেবল যোগ ধ্যান হয়। সেই দেশে পলাইয়া যাই, আর লু সহিতে পারি না। এখন যদি দূর হইতে দেখি, বিবাদের আগুন লেগেছে, অমনই যেন গা পুড়ে যায়। নিষ্ঠুর বন্ধুগণ যদি এই অপটু বন্ধুকে এমনই করেন, এইখানেই আমাকে পুড়িতে হইবে। ঠাকুর, জান তো তুমি, যে মানুষ ঘরের একটু গরম আগুন সহিতে পারে না, সে কিরূপে এ সকল সহ্য করিবে? পৃথিবীতে বড় গরম, এখানেও সাধুদের গরম, এখানেও রাগ! দেখ, নাথ, হিমালয়—আমাদের যেখানে আনিয়াছ, ইনি কিন্তু ও মানেন না। ইঁহার মাথায় অনন্ত হিমানি রহিয়াছে, হাজার রৌদ্রের তাপেও তাপিত হন না। দেখ, হিমালয়, এই রকম তোমার মা, তিনি কিছুতেই রাগেন না। অনন্ত হিমানি! যে বরফ গলে না, সেই বরফ তোমার মাথায়। হে হিমালয়, তুমি আমার মাকে মাথায়

করিয়া রহিয়াছ। অনন্ত হিমানী তিনি, তোমার মাথায় ঝক্ ঝক্ করিতেছেন। আমি সেই রকম হইব। তোমার মত আমার মাথায় অমনই অনন্ত হিমানী থাকিবে, আমি কিছুতেই রাগিব না। আর তাহা যদি না হয়, তবে যেখানে লু চলে, সেইখানে যাই। মা অনন্ত হিমানি, তুমি এমন কর, আর যেন না রাগি, পাহাড়ের মতন গম্ভীর শান্ত হইয়া থাকিব। সকলের স্বভাব এক নয়, হরি, তুমি তো আমাকে ও রকম কর নাই। আমার ঝগড়া শুনিলে অন্তরের অন্তর শুদ্ধ জ্বলিয়া যায়। তাই বুঝি, আমাকে গরম দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। বলিলে, "তোর মাথা গরম হ'য়ে গেছে, চল্. তোকে সেই হিমালয়ের উপর লইয়া যাই ঠাণ্ডাতে।" হয় তো তুমি এবার মনে করিতেছ,—একে হিমালয়ের করে রাখিব। হয় তো মনে করেছ,—এর এক গুণ ক্ষমা দশ গুণ ক'রে দিব। হয় তো মনে ক'রেছ,—হিমালয়ের উপর একে প্রেমিক ক'রে রাখিব। যদি তোমার মনে এই ইচ্ছা হয়, তবে তাই কর না, হরি? চির-ক্ষমাশীল, প্রেমেতে চির-সুস্নিগ্ধ কর। আমি বরফ, রাগিতেও জানি না, গোল করিতেও জানি না। তোমার রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করে, যেখানে তোমার সাধুগণ আছেন। মা, আর এই লোকগুলোকে, যাঁরা এখানে আসিয়াছেন, তাঁদের ঠাণ্ডা কর। এখানে বসিলেই মন ঠাণ্ডা হইবে, এই কয় দিনে একেবারে মন মাটী হ'য়ে যাবে। আর কি এরা রাগ করিবে? মা, বল দেখি হেসে হেসে যে,—"ইহারা আর রাগিবে না, ইহারা পাথরের মত হইবে, আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" দাও পাথর ক'রে, যেমন তোমার সিমলা একটি, মরি একটি, নৈনীতাল একটি, দার্জ্জিলিং একটি, মা, নববিধানের একটি একটি লোককে এমনই কর। এইখানে দেখা যাইতেছে, বেশী দুর নয়, ঐ বরফের কাছে গেলে চিরশান্তি। চল, মন,

আরো উপরে চল, গিয়া মাকে ডাক। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পাপের আগুনে শান্তিজল ঢেলে দিয়ে, বরফের মতন শীতল হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শ্রীধর-রূপ-দর্শন

(হিমাচল, শনিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৬শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অনাথশরণ, তিনি ধন্য, যিনি তোমাকে শ্রীধর নাম দিলেন, যিনি শ্রীপতি বলিয়া তোমাকে পূজা করেন, যিনি তোমাকে শ্রীনিবাস বলেন। যিনি জানেন, যিনি মনের সহিত তোমাকে শ্রীধর, শ্রীনিবাস বলেন, তিনি ইহ পরকালে সুখী হইবেন। কেবল তোমাকে ডাকিলেই হয় না। একটি একটি নাম দিতে হয়। সেই জন্য ভক্তেরা শতাধিক নাম তোমাকে দিয়াছেন। তোমাকে শ্রীধর বলিতে পারেন তাঁহারা, যাঁহারা তোমাকে শ্রীযুক্ত দেখিয়াছেন। তাহা না হইলে, ঈশ্বর, তোমাকে বনের মধ্যে আন্দাজে 'সত্যং শিবং' বলিয়া ডাকিতেছি। যাহারা সহস্রবার উপাসনা করিয়াছে, তাহারা শ্রীনাথ বলিয়া ডাকিতে পারে না। তোমার মুখের জ্যোৎস্না চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে রূপের সঙ্গে কোন তুলনা হয় না, সে রূপ কি আমাদের দেখাইবে না? তবে কেন আসিলাম পর্ব্বতে? যে রূপ দেখিলে আমরা বলিব, আমি কেন আর এ পথে ও পথে যাব, হৃদয়নাথের রূপে যে মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার ভগবানের রূপে যদি আমি মুগ্ধ হইলাম, তবে কেন অন্য পথে যাইব? আমরা চাই যে খুব উৎকৃষ্ট রূপ দেখিতে। হিমালয়ের মতন

উজ্জ্বল রূপের ছটা, চারি দিকে প্রেম ও পুণ্য ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সেই রূপ দেখিতে চাই। অসার সুখের জন্য পাপের কাছে, সংসারের কাছে আর যাইব না। আমার শ্রীধরের কেমন মুখের শ্রী, কেবল শ্রী, অন্তরে বাহিরে কেবল শ্রী দেখিব। শ্রীধর, শ্রীনাথ, কাছে এস, একবার তোমার নিৰ্ম্মল চক্‌চকে রূপ দেখি। যে রূপ দেখিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, পাপ তাপ দূর হয়, সশরীরে স্বর্গারোহণ হয়, সেই রূপ দেখাও। সকল রূপ দেখালে, শ্রীধর রূপ একবার দেখাও। তোমার রূপ দেখিয়া আমাদের সুন্দর শ্রী হইবে। উপাসনার পরে দেখিব, আমাদের এমন শ্রী হইয়াছে, পৃথিবী আমাদের দেখিয়া বলিবে, "তুই বুঝি আজ শ্রীধরকে দেখিয়াছিস্?" লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুল, কোটি কোটি সূর্য্য তোমার চরণে, হিমালয়ের উপর এমন রূপ দেখাও। মা, কেবল তোমার রূপ হেরি, আর রূপরস পান করি। কোথায় লুকালে পার্ব্বতি? ভগবতি, কোন্ পাহাড়ে লুকাইয়া রহিলে? মা লক্ষ্মি, কোন্ খড়ের ভিতর লুকালে? আর ঘোমটা দিও না, আর পর্দ্দার পশ্চাতে লুকিয়ে থেক না। একবার দেখা দাও, তোমার মেয়েরা হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছে। গোলাপের শ্রী, পর্ব্বতের শ্রী, নদীর শ্রী যে রূপে, সেই রূপ একবার দেখাও। এমন সুন্দর আর কোথাও নাই, ইচ্ছা হয়, কেবল ঐ রূপ দেখি। বন্ধু ব'লে বন্ধু, চাঁদ ব'লে চাঁদ। পাহাড়ে যদি থাক, মা, দেখা দাও, গৃহস্থের বাড়ী এসে দেখা দাও। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার সেই মনোমোহন রূপ দেখিয়া শুদ্ধ হই। তোমার চরণে থাকিয়া, শ্রীধরের রূপ দেখিয়া আমরাও শ্রীসম্পন্ন হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যযুগের সমাগম

(হিমাচল, রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৭শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে ভারতের পরিত্রাতা, দেশে একজন রাজা আসিলেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ইতর মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিল। বহুমূল্য একটি রত্ন দেশের মধ্যে আনীত হইল, লোকে তাহাকে সামান্য মনে করিল। যে বস্তু একদিন সমস্ত পৃথিবীতে রত্ন বলিয়া সমাদৃত হইবে, রাজার মুকুটে রত্ন বলিয়া বসিবে, জ্ঞানীর জ্ঞান হইবে, ভক্তের বুকে বসিবে, গৃহস্থ সমাদর করিবে, সংসারীরাও অনাদর করিবে না, একদিন যে বস্তুর এত সম্মান হইবে, সেই বস্তু আজ জগৎ চক্ষু থাকিয়াও দেখিতেছে না, হস্ত থাকিয়াও ধরিতেছে না। বারম্বার বলিলাম, লোকে মানিল না। ইহার কাছে বহুমূল্য রত্ন হারিয়া যায়, এমন বস্তু, তবুও কেহ লইতে চায় না। কিন্তু আমরাও ইহাকে কখনই স্পর্শ করিতাম না, ধর্ম্ম না বুঝিলে। এ কি তাঁবা, না মুক্তা, না রূপা, যে ইহাকে সেই ভাবে পূজা করিব? ইহা বলিলে, হে প্রভো, আমাদেরও পরিত্রাণ হইবে না। এই হিমালয় হইতে নববিধান নদীর মত গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে। যেমন গঙ্গা তোমার পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দেশে দেশে কত স্থান উর্ব্বরা করিতেছে, তেমনই তোমার এই নববিধান কত দেশ দেশান্তরে, পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রচার হইবে, লোকের কত উপকার করিবে। যে পরমা সুন্দরী দয়াময়ী মার মুখ ইউরোপ, আমেরিকার লোকে দেখিবে, আমরা তাঁহাকে আগে দেখিতেছি। ধন্য ভারত! কিন্তু মনে দুঃখ রহিল, কেহ বিশ্বাস করে না নববিধানকে। পরব্রহ্ম আকাশের দেবতাকে মার সাজে সাজাইয়া নববিধান গৃহস্থের বাড়ীতে আনেন।

দয়াময়ী মা আসেন, এ সামান্য ভাব নয়, যোগভাব, ঋষিভাব। ঋষি যিনি, কেবলই ব্রহ্মানন্দরস পান করেন। আমরা কি ধন পাইয়াছি! বুকের ধন, তোমাকে এই লোকেরা চান না। হরি, এমন দিন কি হ'বে, যে দিন সকল ভাই ভগিনী তোমাকে ডাকিবে? আর কি, যখন পর্ব্বতে মাকে দেখিলাম, তখন, পৃথিবী, আর দুঃখ করিও না। আমাদের মত এক দিন তোমারও সৌভাগ্য হইবে। ভারতের লোকগুলো কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে, দেখিলে দুঃখ হয়। হ্যাঁরে ভারতবাসী, তোর কি মা বাপ নাই? তুই কি পিতার ত্যাজ্য পুত্র হয়েছিস্? এই সময় ভারতে এত দুঃখ! অন্নপূর্ণা যে দেশে দেশে বাড়ী বাড়ী বেড়াইতেছেন! এখন কি আর বিশ্বাস করিব, রাজপুত্র, তুমি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছ, তোমার অন্ন নাই? না, মিথ্যা কথা। তুমি রাজার পুত্র, তোমার মার কাছে কত ধন, মাকে দেখ। ভারত, আর দুঃখ করিও না, মা যে রথে চড়িয়া আসিয়াছেন, দেখ। অবশ্য এক দিন তুমি দুঃখ পাইয়াছিলে, তাহা মানি, কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করিব না। আমি তোমার মাকে দেখিয়াছি, জাগ্রত জীবন্ত রূপ পাহাড়ে দেখিয়াছি। আর দুঃখ করিও না, নাস্তিকতা-পাপ ছাড়। দেখ, মা তোমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। হরি, তোমার দিন আসিয়াছে, তুমি রাজা হইবে। বেদ বেদান্ত আবার আনিলে, ভারত রাজপুত্র হইল। আবার বলি, লোকগুলি ভাল হইল না, এই দুঃখ রহিল। এমন রত্নকে চিনিল না, পাহাড়ে আসিয়া লোকে তোমাকে দেখিল না। আমি নিশ্চয় জানি, তোমার পৃথিবীতে আবার আদর হইবে। চীন জাপানের লোকে তোমাকে আদর করিয়া লইবে। কিন্তু আপনার লোক তোমাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। মা, তুমি কি হিন্দুস্থানীদের দেবতা, না, পাঞ্জাবের রাজ্ঞী? নির্ব্বোধ ভারতসন্তান,

তুমি মাকে ডাকিবে না? উঠ, জাগ, ভাই, জাগ। মা, আমাদের আনন্দের দিন আসিয়াছে, আর আমরা দুঃখ করিব না। ঘর পরিষ্কার করি, আসন পাতি। হিমালয় হইতে চেঁচাইয়া বলিব, ভাই, এস, ভগিনী, এস; আমাদের সুখের দিন আসিয়াছে। মা, তুমি যখন আসিবে, তোমাকে বরণ করিয়া লইব, তোমাকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূজা করিব। মা, হিমালয়ে যেমন তোমার মন্দির স্থাপিত হইল, তেমনি পৃথিবীতে তোমার মন্দির স্থাপিত হইবে। মা, আমি পরলোকে গিয়া দেখিব, যত বড় বড় লোক আমার মার পূজা করিতেছে। আমরা এই ক্ষুদ্র ঘরে তোমার পূজা করিতেছি, ইহার পর ভবিষ্যতে তোমাকে যত নৃপতিগণ রাজ্য করিবে। সময় আসিতেছে, যত সাধু সাধ্বীরা পরিবার লইয়া তোমার পূজা করিবে। তথাপি বলি, মা, আমরা ধন্য! কেন না, প্রথমে আমরা তোমায় পূজা করিয়াছি, তোমাকে ডাকিয়াছি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাস করিতে পারি যে, তোমার সত্যযুগ আবার আসিবে, নগরবাসীরা সকলে তোমার পূজা করিবে। আমরাও তোমার চরণে প্রাণ মন বিসর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শুদ্ধি

(হিমাচল, সোমবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৮শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

দীন দয়াময়, প্রেমসিন্ধো, তোমারি লোক আমরা, তোমারি সাক্ষী আমরা। আমাদের দেখিয়া লোকে ভাল হইবে, এই তুমি চাও।

আমাদের চরিত্র দেখিয়া লোকে নববিধান পাঠ করিবে। আমরা যেমন তেমন হইলে চলিবে না, ঠাকুর; আমাদের আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। সত্যের সাক্ষ্য বড় শক্ত, ঠাকুর। সংসারে আর কে আছে? আমরা যদি না সাক্ষ্য দিই, তবে কে আর দেবে, বল। লোকে যে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বে না, দয়াময়ি, তোমার নববিধানকে। আমরা খাঁটি হ'ব, তবে তো, ঠাকুর, লোকে ধর্ম্ম বুঝে উঠ্‌বে। আর আমরা যদি ভাল না হই, লোকে বলিবে, দেখ, কেমন রাগী লোভী, এত দিন উপাসনা ক'রে এই ফল!

দয়াময়ি, ইঁহাদের খাঁটি ক'রে দাও। ইঁহারা খাঁটি না হইলে তোমাকে কেহ চিনিবে না; আমার প্রিয়তম ধর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। খাঁটি না হইলে পাহাড়ে আসা মিথ্যা, যোগ ধর্ম্ম করা মিথ্যা। খাঁটি না হইয়া যদি উপাসনা করে, গান করে, তাহা হইলে কিছু হ'বে না। আমাদের দলে যে একটিও খাঁটি লোক নাই, হরি। এ রকম করিলে তো, হরি, আর রথ চলিবে না। ধর্ম্মের নৌকা ডুবে যাবে, আর নববিধানের যৎপরোনাস্তি অপমান হইবে। আর কি বলিব, ঠাকুর, আমরা যদি খাঁটি না হই, এত দিনের ধর্ম্মটা মিথ্যা হইবে। হে শ্রীহরি, হে মঙ্গলময়, তোমার সহচর অনুচর যাহারা হইবে, খুব খাঁটি না হইলে যে ইহাদের হইবে না। ইহারা খুব সত্যবাদী, খুব জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোকের কাছে দাঁড়াবে; মা, এমন লোক না হইলে হইবে না। মহিমা হইবে কিসে, পাহাড়ে বসিয়া চক্ষু বুঁজিলেও কিছু হয় না, খুব খাঁটি হইতে হইবে। আদালতে দাঁড়িয়ে বলিবে, ধর্ম্মের জয়! ধর্ম্মের জয়! ধর্ম্মের জয় কিসের, যদি ইহারা খাঁটি হইতে না পারিল? যাক্, আর উপাসনা করিয়া কাজ নাই। দিন দিন কি অগ্রসর হইতেছি? আর মাকে অপমান কেন? উপাসনা ক'রে কাজ নাই। প্রেম পুণ্য শান্তি

দাও ; আমরা এক এক জন পৃথিবীর কাছে দাঁড়াইব, পৃথিবীর লোকে দেখিয়া বলিবে, এই কয়টি লোক যেমন ঠিক মার একখানি পরিবার। আমরা মার উদরে জন্মেছি কি এই জন্য যে, রোজ সমান থাকিব? চৌদ্দটা গান করিব যে দিন, সে দিনও যে রকম, তার পরদিনও সেই রকম—স্বভাব একই রকম রহিয়াছে। পরমেশ্বর, বিষম ব্যাপার, যদি সমান থাকে লোক, একই প্রকার থাকে, তাহা হইলে পৃথিবী দূর ক'রে দেবেই দেবে। খাঁটি কর, ভাল কর কয়টিকে বেছে লইয়া। দিন দিন তিল তিল ক'রে ভাল হই। আর দেরী করিও না। খাঁটি কর, খাঁটি কর। আমরা স্নানটা করিব, অমনি শুদ্ধ হইয়া যাইব। মা, তোমার পাদপদ্মে থেকে দিন দিন খাঁটি হইব। আমরা লোক দেখান উপাসনা আর করিব না, মিছে মিছে বাহিরে ধর্ম্ম দেখাব না। জীবনের কাঁটাগুলি একটি একটি করিয়া বাছিয়া ফেলিব, পাপমলা ধুয়ে ফেলিব, পুণ্যের বসন পরিব। তোমার জ্যোতির ভিতরে থেকে শুদ্ধ হইব, মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মনোগমন

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২৯শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে মহাদেব, সংসারের আহার বিহার মধ্যে আত্মা আসল কাজ ভুলিতেছে। শরীর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে জন্য ভবে আসিলাম, তাহা কেন ভুলিব? হে দীনবন্ধো, সংসারের অনন্ত গোলমালে দিন কাটাই কেন? এখন আরাম করিতে করিতে

একটিবার তোমাকে ডাকিলে কি হইবে ? পিতঃ, জীবনের আসল কাজ ভুলিয়া, খাওয়া দাওয়া, টাকা কড়ি মনকে এমন টানিতেছে যে, যে জন্য পৃথিবীতে আসা, মন তাহা ভুলে গেল। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা আপনার খবর লন।

এই মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড সিঁড়ি আছে, তাহাতে উঠিলে ছাতে যাওয়া যায়। যেমন এই পর্ব্বতে উঠিলে সমুদয় দেখা যায়, তেমনি সেইখানে স্বর্গের সাধু দেবতাদের দেখা যায়। সেখানে বসিলে মন সংসার-বাসনা ভুলে যায়, স্বর্গের রাজাকে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মেতে লীন হয়, তাঁহাতে মিশে যায়। সেই আমাদের বাড়ী। পিতঃ, আমরা কোথায় এই দুর্গন্ধময় স্থানে বসিয়া রহিয়াছি। হে প্রেমময়, মনের ভিতর গেলে ভাল জায়গায় যাওয়া যায়। কোথায় ভাই বন্ধু ? তাঁহারা আত্মার ভিতর। ভিতরে কত প্রেমের পাহাড়। ভিতরে যথার্থ মহাদেবী তারাদেবীর পাহাড়। মনের ভিতর উঠিতে উঠিতে গিয়া পাহাড়ের উপর ব'সে যোগ করিতে হয়। আর কিছু চাই না, সেইখানে গিয়া তোমার সঙ্গে মিশে যাই। আমরা কি করিতেছি ? এ সকল তো পশুর কাজ। হাত পা নাড়ে তো পশুরা। সেখানে যোগীরা স্থির হইয়া তোমাতে এক হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের হাত পা নড়ে না। লইয়া যাও, পিতঃ, সেই রাজ্যে. আর পশুর রাজ্যে থাকিতে চাই না। সেখানে হাজার হাজার যোগী ব'সে যোগ করিতেছেন। কত ডাকিলাম, ও যোগী, দেখ না, আমরা আসিয়াছি, কত ধাক্কা দিলাম, কিছুতেই নড়ে না, একটি টুঁ শব্দ নাই। কাঠের বা পাথরের পাহাড় যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি তাঁহারাও। আহা ! হরি, তোমার পাদপদ্ম লাভ ক'রে তাঁহাদের এই হয়েছে। হরি, আমরা মিথ্যা খেটে খেটে মরিলাম। পিতঃ, তোমার সন্তানদের এই বাজার থেকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া

যাও। এখানে বসিয়া যোগ হইবে না, সেইখানে যাইতে হইবে, যেখানে বসিলে যোগেতে কেবল হরি-সুখে সুখী হ'ব। ওরে কাণা মন, তুই কিছুই দেখিতে পাইতেছিস্ না, ঐ যে পাহাড়ে ব্রহ্ম চক্ চক্ করিতেছেন। কালা, কিছুই শুনিতে পাইতেছিস্ না ব্রহ্মবাণী। চল্ চল্, শীঘ্র চল্, সকলে যে চ'লে গেল। কাণা, একবার চক্ষু খুলে দেখ্, ঐ দিক হইতে প্রখর কিরণ আসিতেছে। ভোলা মন, চল্ চল্, শীঘ্র চল্, আর ভাব্‌তে হ'বে না। যোগেশ্বরি, ঐখানে না গেলে হ'বে না, ঐ যোগের জায়গায়, মা যোগেশ্বরি, কাণাকে হাত ধরিয়া লইয়া চল, তাহা না হইলে যাইতে পারিব না। মা, ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় কৈলাস-গিরি, ঐখানে আমাদের লইয়া চল। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর সংসারের মিথ্যা কাজ না করি। তোমার ভিতরে থেকে যোগী হইব, সোণার ভিতরে থাকিয়া সোণা হইয়া যাইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুণ্য-সাধন

(হিমাচল, বুধবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;

৩০শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে পতিত-পাবন, আমরা যখন নিম্নভূমিতে ছিলাম, তখন কত ওজর করিতাম। এত সংসারের গোল, এত উত্তেজনা, এত প্রলোভন, এই বলিয়া, ঠাকুর, তোমার পূজা করিতাম না। বলিতাম, হাটের ভিতর কি, ঠাকুর, যোগ হয়, টাকা কড়ির ভিতর কি তোমাকে দেখা যায়? তুমি ওজর শূন্য করিবার জন্য, বুঝি, এখানে আনিলে? বলিতেছ, এখন ওজর কর্। হরি, এমন শান্ত স্থানে আনিয়াছ, এখানে

যদি মন ভাল না হয়, তবে, ঠাকুর, কোথায় যাইব? হরি, আমাদের এমন স্থানে আনিয়াছ যে, আজ একটা ঝগড়া, আজ একটা হিংসা, এ সব আর হ'বে না। হরি, আমাদের মিথ্যা কথা যাই তুমি শুনিলে, অমনি এমন জায়গায় আনিলে, যেখানে ওজরের কিছুই হইবে না। এখানে একটুও ওজর করিলে চলিবে না। এ ঋষিদের স্থান। এখানে রাগেও জ্বলিতে হ'বে না, লোভেও পুড়িতে হ'বে না; তবে এখানে কেন ভাল হ'ব না? হরি, এখানের চেয়ে কি আর ভাল স্থান আছে? এ যে স্বর্গ। এখানে রিপু প্রবল কেন? বাঘ যেন জঙ্গলে, বাজারে যেন গোলমাল, এটা বুঝিলাম; গাছের তলা এখানে, কেন রাগ হইবে, লোভ হইবে? গাছ কি আমাদের রাগাইতেছে, পাহাড় কি আমাদের চটাইতেছে? শান্ত পাহাড় আমাদের বন্ধু বিশ্বাসী বৃক্ষ আমাদের সহায়; তবে কেন আমরা ভাল হ'ব না? তুমি বুঝে বুঝে আমাদের কাণ মলে এমন জায়গায় এনেছ যে, আর ওজর করিবার যো নাই। এখানে সংসারের ভাবনা নাই, এখানে আজ গিয়া পাঁচ ঘণ্টা যোগ করিতে হইবে। এ যে একেবারে তোমার কোলের ভিতর মুনি ঋষিদের স্থানে আসিয়াছি। মা, এখানে যেন কাম ক্রোধ লোভ মোহ না আসে। এস্থানে যদি রাগ হয়, মুনি ঋষিদের স্থান কলঙ্কিত হইবে। এখানে বাতাস যেন গালে চড় মারে। আমরা যদি বলি, না বুঝিয়া একটু রাগ করিয়াছি, তুমি কিছুতেই শুনিবে না। মা, তুমি বলিবে, এখানে করিস্ না, মরবি। বিচারপতি, এখানকার আদালত বড় ভয়ানক। আমাদের কলিকাতায় এ রকম নয়। সেখানে বড় বড় পাপ করিলে বেত খাইতে হয়, দুই মাস চার মাস জেল খাটিতে হয়। এখানে বড় শক্ত বিচার। একটু কুচিন্তা মনে আসিলে বেত খাইতে হইবে, ভয়ানক শাস্তি হইবে, এখানকার বিচারপতির হুকুম। এখানে রাগের কারণ নাই, লোভের কারণ নাই,

এ দেবতাদের স্থান। মা, বুঝিতে দাও, যাঁহারা এখানে এসেছেন, বেত খেতে খেতে মরিতে হ'বে। তা না হয় খাঁটি হ'তে হ'বে, সকল নর নারীরই খাঁটি হ'তে হ'বে। খাঁটি হইয়া দেশে গিয়া বলিব, দেখ, হিমালয়ের আদালত হইতে খাঁটি হইয়া এসেছি। এখানে একটা পাপ করিবার যো নাই, হিমালয়ের দেবতা বলিয়াছেন, এখানে অষ্টপ্রহর খাঁটি থাকিতে হ'বে, এখানে একটুও ওজর নাই। তবে, দয়াময়, খাঁটি কর। এখানে ব্রহ্মচিন্তা ভিন্ন আর চিন্তা নাই, কেবল চিন্তামণিকে ভাব, কেবল হরি সুন্দরকে দেখ। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে পাপশূন্য হইয়া, ওজরশূন্য হইয়া, ভয়ে ভীত হইয়া, হিমালয়ের বাতাসে শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অলৌকিক ভাব

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
৩১শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, নববিধানের রাজা, যখন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম, তখন অবস্থা এক রকম ছিল, দায়িত্ব কম ছিল। এখন নববিধান বিশ্বাস করি, এখন আর এক অবস্থা, দায়িত্ব বড়। হে পিতঃ, বিধান মানা ভয়ানক ব্যাপার। ঈশা মুষাদের সেই যে ধর্ম্ম, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম এক করা, ইহা তো সহজ নয়। কিরূপে সহজ বলিব, ঠাকুর? যদি এ মানুষর ধর্ম্ম হইত, সামান্যভাবে ধর্ম্ম করিতাম, কেই বা খবর লইত? কিন্তু যখন তুরী ভেরী বাজাইলাম, বিধান আসিল, স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হইল, ইহা তো সামান্য ব্যাপার হইল না। স্বর্গের বাণী, স্বর্গের প্রেরিত, এই

সকল হইল আমাদের। পিতঃ, তোমাকে বলি, এখন কি আমরা সামান্য-ভাবে থাকিতে পারি? পিতঃ, তুমি বল, আমাদের কি এ বেশ সাজে বিধানে? যারা প্রত্যাদিষ্ট হয়, তারা তো সহজ নয়। পৃথিবী বলে, আমি জানি, ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ সেই শ্রেণীর লোক ইঁহারা। তাঁহারাও বই মানিতেন না, ইঁহারাও তেমনি। তাঁহারা বলেন, অগ্নিময় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইঁহারাও তাহাই দেখেন। এখন আর কি হইবে—পৃথিবী আমাদের বলিতেছে, তোমরা ঈশাদের মতন, তাঁদের চরিত্র যেমন, তোমাদেরও তেমনি। কেবল তাঁহাদের অপেক্ষা তোমরা ছোট, তোমরাও বিধানের লোক, তাঁহারাও বিধানের। দেখ, হে হরি, পৃথিবী একথা বলিয়া যেন আমাদের উপহাস করিতেছে। তাঁহাদের জীবন এক রকম, কি রিপুদমন, কি পুণ্য, আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার; আমরা কোথাকার অধম নারকী। ঈশ্বর, আমরা যে বংশের লোক, সে রকম হইলাম না। হরি, আমরা যদি অমনি যেমন তেমন হইতাম, কত রকম সম্প্রদায় আছে, তেমনি আমাদেরও একটা সম্প্রদায় থাকিত। তা নয়, কোথা থেকে তেড়ে ফুঁড়ে হিমালয়ের উপর উঠে বলিলাম, আমরা ব্রহ্মকে দেখিয়াছি, আমরা প্রত্যাদিষ্ট। পৃথিবী আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, আবার ঈশা মুষাদের সময়ের লোক আসিয়াছে। তার পর আমাদের স্বভাব দেখিয়া বলিল, ওরে আমাদের মতন পাতকী এরা, এদের জীবন অবিশ্বাসী। হে পিতঃ, আমাদের জীবনটা ছোট হয়েছে, ধর্ম্ম বড়। খুব বিশ্বাসী হইতে হয়, পৃথিবী কাঁপাইতে হয়। নববিধানবাদীরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? একটা নববিধানের পরিবার হিমালয়ে এসেছে। পৃথিবী দেখে বলে, এ মাটী থেকে গজায় না, এ স্বর্গ হইতে আসে। হরি, সে রকম কৈ হইতেছে? এ যেন পাঁচমিশুলে ধর্ম্ম, ঠিক অন্য ধর্ম্মের মতন ইহাও একটা। যদি ঈশার মতন হইত, আজ কি এ পাহাড়

এ রকম থাকিত? বল না, ঠাকুর, যদি মুষার মতন পাহাড়ে জ্বলন্ত ঈশ্বর দেখিতাম, তবে পাহাড় এ রকম থাকিত না। আমরা যদি জীবনে সে রকম দেখাইতে পারি, তবে তো হইবে। আমাদের দেখিয়া লোকে বলিবে, এঁরা রাগেন না, কিন্তু একটু রাগ থামাইতে পারেন না। এঁরা ভারী ভারী কথা আকাশ হইতে শোনেন, কিন্তু একটা নিজে বলিতে পারেন না। হরি, সে রকম হুঙ্কার ক'রে যদি বলি, আমরা প্রেরিত, প্রত্যাদিষ্ট, তা হ'লে প্রেমের সমুদ্র উথ্‌লে উঠিত; এ যে একটি ডোবার মত চুপ ক'রে র'য়েছে। তা হ'লে জ্বলন্ত অগ্নি জ্বলিত, এ যে একটি প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। হরি, যেমন ধর্ম্মটা বড়, তেমন জীবনটা কৈ? তুমি জ্বলন্তরূপে আমাদের দেখা দাও। আমরা বিশ্বাসী হইয়া তোমার কাজ করি। আমাদের কি বিধান নাই? এ রকম ঘুমন্ত যাঁরা, সেখানে বিধান নাই। মা, বিধান বিধান ক্রমাগত করি, বিধান কৈ? মা, জ্বলন্ত বিশ্বাস দাও, একবার জ্বলন্তভাবে বিধানবলে প্রত্যাদিষ্ট হই। এ রকম চক্ষের নিকটে অসহ্য, ইহাতে কি পরিত্রাণ হয়? এ রকম কত দেখা গেল, তারা আসে, ঘুমোয়, চলে যায়, তারা দিন কতক গান করে, উপাসনা করে, তার পর চ'লে যায়। যেখানে অলৌকিক কীর্ত্তি কিছুই নাই, সেখানে দেবতারা তো নাই। সে পৃথিবীর ছোট ছোট লোক, ছোট ধর্ম্ম। একেবারে বুকে হাত দিয়ে পৃথিবীকে বলিতে হ'বে, ওরে দেখ্‌, আমি ঈশ্বরকে দেখিতাম না, এখন কেমন তাঁকে দেখি। ওরে দেখ্‌, আমি পাতকী ছিলাম ভাল হয়েছি, বিশ্বাসী হয়েছি। হরি, সে রকম হইল না। তুমি দিলে জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের আগুন, এরা সব পা দিয়ে, থুত্‌ দিয়ে নিবিয়ে দিলে, আর মিন্‌সেগুলো সেইখানে মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বালালে। তুমি এই দেখে, স্বর্গ হইতে ফুঁ দিলে, নিবে গেল, তাদের দর্প চূর্ণ হ'ল। সে রকম হ'লে স্বর্গ

গাঁগাঁ ক'রে ডাকবে, প্রত্যাদেশের বাতাস বহিবে। কোথায় আমার সোণার ধর্ম্ম, কোথায় গেল? বিচার কর, বিচারপতি। কৈ, পবিত্র ঋষিরা একতারা লইয়া কৈ? সে সতী নারীরা কৈ? দলে দলে আস্তেন যদি, বিধান প্রচার হইত। এখন যেমন প্রেরিতদের দশা, ঠিক যেন ভূত পেতনি! যখন ঈশা মুষা গুরু নানক এসেছিলেন, প্রত্যাদেশ এনে পাহাড় কাঁপিয়েছিলেন। আর সে সময় নাই। মা, আর কি বল্‌বো, আমাদের চরিত্র যদি ভাল হয়, বুক ঠুকে বল্‌বো, দেখ না, মা আমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন। দেখ না, গেরুয়ার গন্ধ, স্বর্গের ফুলের গন্ধ। এ কি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম পেয়েছি? ঐ যে মেঘ ডাক্‌চে, তুমি বল্‌চো, ও মা কথা বলিতেছেন। যে বাতাস বহিতেছে, ও প্রত্যাদেশ। মা, আমাদের ভাল কর। নাথ, পরিত্রাণকর্ত্তা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিধানকে আর নকৃড়া ছকৃড়া না করি। ঈশার সময়ের, মুষার সময়ের যেমন বিধান, আমরাও এই বিধানকে তেমনি করিব। আমাদের ছাই চরিত্র ফেলে দিয়ে, যেন অলৌকিক ভাব বিধানে দেখাইতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার অভয় চরণ

(হিমাচল, শুক্রবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
১লা জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, অপার প্রেমসিন্ধো, যেমন পাপের জালে মানুষ জড়িয়ে যায়, আর শীঘ্র বাহির হইতে পারে না, তেমনি তোমার প্রেমজালে, পুণ্যজালে সাধুরা জড়িয়ে পড়েন, আর বাহির হইতে পারেন না।

হে অনাথনাথ, আমাদেরও সেই জালে জড়িয়ে রাখ। ঠাকুর, তোমার ভৃত্য হ'য়ে আমরা নাও কাজ করিতে পারি; কিন্তু তুমি যদি বেঁধে রাখ, তবে আর যাইতে পারি না। রিপুগণ কেবল ঘুরিতেছে, একটু স্থবিধা পেলে হয়। অবিশ্বাস, অভক্তি, রাগ প্রভৃতি আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে। একবার গৃহস্থ রাত্রে বাহির হইলেই ধরিয়া লইবে। একটু যাই অমনোযোগ হয়েছে, অমনি, হে পতিতপাবন, তোমার ভৃত্যকে পাপবাঘ টানিয়া লইয়া যাইবে। তাই বলি, ঠাকুর, এমন এক জায়গায় আমাদের রেখে দাও, যেখানে থেকে আর চোর, ডাকাত ধরিতে পারিবে না। একটা জায়গা আছে, সেইখানে থাকিলে প্রেম ভক্তি থাকিবেই থাকিবে। পর্ব্বতের উপরে এমন একটী জায়গা আছে, সেখানে গেলে আর গহ্বর হইতে উঠা যায় না। হরি, আরো উপরে লইয়া যাও, যত আমরা পলাইব, ততই লইয়া যাও। হরি, তোমার প্রেমের জালে আমাদের জড়িয়ে রাখ। আমরা তোমারই হ'ব, আর কাহারও হ'ব না। তোমাকেই মা ব'লে ডাক্‌বো। সে জায়গাটা কোথায়? ঠাকুর, লইয়া যাও না সেখানে, যেখানে সব সাধুভক্ত আছেন। আর সকল জায়গায় ভয় আছে, অবিশ্বাস-পাপের ভয়, তাহাতে কত লোক মরেছে। তাই বলি, ঠাকুর, যেখানে শত্রু নাই, সেইখানে লইয়া চল। সেখানে কখন চুরি ডাকাতি হয় না, আর এখানে রেখো না। ঠাকুর, সেইখানে লইয়া চল। আমরা মা লক্ষ্মীর নাম করিয়া নির্ভয় হইব। রাম নাম ক'রে ভূত তাড়াইব। অমৃতধামে গিয়া তোমার নাম গান করিব। মা, লইয়া চল সেইখানে। সেখানে গেলে, একেবারে তোমারই হইব। এখানে লোকে রাগাইবে, লোভ দেখাইবে। হরি, যখন আমি ঐ জায়গায় যাব, তখন আর রাগিব না, লোভ করিব না। ঐখানে গিয়ে তোমার প্রেমের জালের ভিতর পড়ে জড়িয়ে যা'ব। ঠাকুর, যখন তোমারই হ'ব, আর

কোথায়ও যাইব না। হরি, এরা যদি তোমার ঐ জায়গায় না গেল, তবে কি হ'বে। হরি, দাও অভয়পদ বিপন্নজনে, ভীতজনে, আর এমন কাগজ কলম দাও, যাহাতে একেবারে লিখে প'ড়ে দেবো, চিরকাল তোমার ঐ অভয় চরণতলে প'ড়ে থাকব। আর কেহ ধরিতে পারিবে না; শমন আসিলে বলিব, আমি মা দুর্গার কাছে এসেছি, তিনি আমার সহায়। মা, আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর অবোধ না হই। তোমার চরণে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে থাকিব। মা, আর পালাব না। মা আমাদের, আমরা মায়ের, কেবলই এই বলিয়া, চিরদিন তোমারই কাছে প'ড়ে থাকিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আর্য্যপরিবার

(হিমাচল. শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
২রা জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে আশ্রয়দাতা, তোমাতে আমরা এক হইব, এই কথা ছিল। আমরা কেবল কি এই কয় জন?—তাহা নয়, সমস্ত আর্য্য-জাতি। তুমি যে, ঠাকুর, আমাদের পুরাতন আর্য্যদেবতা। আমাদের সেই আর্য্য পূর্ব্বপুরুষ তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, আর আজ আমরা তোমাকে ডাকিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসর হইল, সেই প্রাচীন কালে তাঁহারা তোমাকে ডাকিয়াছিলেন। কেমন যোগ! আজ আমরাও তোমাকে ডাকিতেছি। হে প্রাণেশ্বর, সব ব্যবধান কাটিয়া গেল। তুমি কত কালের দেবতা, ইহা কেহই মনে করে না। আমি চাই, প্রাচীনকালের হাজার হাজার বৎসরের সঙ্গে যোগ রাখিতে, আমাদের এই সকল কথা

তাঁহাদের কাছে প্রতিধ্বনিত হইবে। তোমার কাছে বসিলে যে আমরা এক হইয়া যাই। আর্য্যগুরো, আর্য্যসন্তান-প্রসবিনি, আমরা তোমাতে এই দেখিতে চাই। এই হিমালয়ে হাজার হাজার বৎসর আগে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাকে ডাকিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহাকে ডাকিতেছি, আমাদের কথা সেইখানে প্রতিধ্বনিত হউক। তুমি ত কেবল আমার মা নও। সকলের মা তুমি। একবার লক্ষ ছেলে তোমাকে মা ব'লে ডাকুক একখানি সুরে। মা, আমরা যে তোমার একখানি পরিবার, সব ঋষি মুনি আমাদের কাছে এসে পড়ুন। মা, আমার এই চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ কর। হাজার হাজার বৎসর আগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিল হইতেছে, আর ওদেশ থেকে এদেশে যারা আসিতেছে, তাদের সঙ্গে মিল নাই। ঝগড়া দূর কর, ঠাকুর; আমরা কি ছোট? মা, আমরা যখন মনে করি, আমরা প্রকাণ্ড আর্য্য-বংশীয়, হিমালয়ে আমাদের ঘর বাড়ী, তখন আমাদের নিজেকে যেন কত মহৎ মনে হয়। আমাদের একখানি কর, সকলের সঙ্গে মিলে তোমার সঙ্গে এক হই। আমরা ছোট ঘরে বাস করিব কেন? তার চেয়ে হিমালয়ের উপর দাঁড়িয়ে বলিব, আমাদের এই মস্ত বাড়ীতে এসেছি। হরি, ছোট হ'ব কেন? আর্য্যসন্তান ছোট হইবে? প্রাচীনকালে, হরি, তুমি নিজে রাজমিস্ত্রী ছিলে, নিজে বিশ্বকর্ম্মা হ'য়ে এই বাড়ী তোয়ের করিলে আমাদের জন্য। এইখানে বসিয়া বলিব, আর্য্যশোণিত, হৃদয়ে প্রবাহিত হও, মনকে বলিব, এই বেলা সোণার মুকুট পর। আমাদের আর্য্যের কত পরাক্রম, কত বল। মা, আমাদের সকলকে একখানি পরিবার কর। হে দীনতারিণি, আমাদের কৃপা ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা আর ছোট যেন না হই, আমরা সেই আর্য্যপুরুষদের সঙ্গে এক হ'য়ে, একখানি পরিবার হইয়া তোমার চরণে থাকিতে পারি। [সা—] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার দুই মূর্ত্তি

(হিমাচল, রবিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
৩রা জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পরিত্রাণকর্ত্তা, হে পুণ্যদাতা, তোমাকে জননী বলিয়া ডাকিয়াও যেন আমাদের ভয় থাকে। ভয় যেন একেবারে আমাদের মনকে ছাড়িয়া না যায়। তুমি যে অসহ্য তেজ, একটুও পাপ সহ্য করিতে পার না। অশুদ্ধ মনে উপাসনা করিতে আসিলে, তুমি তাহা গ্রহণ কর না। তোমার কাছে, ভগবান্, কে পূজা করিতে পারে? এত বড় ঋষি আমাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি তোমার কাছে প্রিয় হইতে পারেন? কোটী কোটী চক্ষু তোমার আমাদের পাপকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। মা, তোমার ক্রোড়ে শয়ন করিব, তোমার স্তন্য পান করিব, তোমার শতদলপদ্ম-শ্রীচরণ বুকে রাখিয়া শীতল হইব। দেখ, হে ঈশ্বর, প্রেম প্রেম বলিতে গিয়া যেন পাপের কাছে না যাই। যতক্ষণ মার কাছে ভাল ছেলে হয়ে থাকিব, মা আমাকে লইয়া বলিবেন, বৎস, খাও, শোও। আর যখন ছাই হইব, আমাকে ক্রোড়চ্যুত করিয়া নানা পরীক্ষায় ফেলিবেন। মা, তোমার দুই রূপ, এক দিকে চন্দ্র, আর এক দিকে সূর্য্য। এক দিকের তেজে লোকেরা পুড়ে মরিতেছে, বলিতেছে, আর তেজ সহিতে পারি না। উঃ! কি তেজ, যেন গা পুড়িয়া গেল। পাপী বলে, আর তেজ সহ্য করিতে পারি না; পাপীকে জগৎ বলে, পালাও পালাও। আর এক দিকে কেমন সুস্নিগ্ধ চন্দ্রের কিরণ, ভক্তেরা সুখে সুধাপান করিতেছেন, কোথায়ই বা তেজ। সুখের সরোবরে মুক্তির পদ্ম ফুটেছে; সেই সরোবরে সাঁতার দিতে দিতে মুক্তির পদ্ম তুলিয়া লও। শ্রীহরি, তোমার এই রূপ ইঁহারা কেন গ্রহণ করেন না? আমি যদি নির্ব্বোধ হইয়া না লই, আমারও

সেই দুর্দ্দশা হইবে। আমাদের নববিধানের লোকেরও এই দশা হইবে। তুমি যে বলিতেছ, আমি পাপ সহিতে পারি না, উপাসক, আমাকে অপরিষ্কার মনে ডাক্‌চিস্‌? পরিষ্কার হ'য়ে আমার পূজা কর্‌। আমরা যদি শুদ্ধ হই, তুমি বলিবে, এসো, সন্তান, উপাসনার ঘর আমি নিজে ফুল দিয়ে সাজিয়েছি, তুই এসে আমার পূজা কর্‌। এক দিকে তোমার প্রেমের মূর্ত্তি; আর এক দিকে পুণ্যের শাসনে বলি, গেলাম গেলাম, আর তেজ সহিতে পারি না। মা, কোন্‌ দিকে যাইব, ভিতরে, না, বাহিরে? বহুকালের ঝগ্‌ড়া দূর কর। ঠাকুর, হিমালয়ের বায়ুতে মন শীতল হউক। এই সুস্নিগ্ধ বাতাসে শরীর মন দুই শীতল হইল। হে দীনবন্ধো, তোমার কাছে যখন আসিয়াছি, তখন যেন আমাদের মনটা শীতল হয়। খুব্‌ তোমাকে ডাকিব, আর বলিব, এখন আর রাগও হয় না, লোভও হয় না। তোমার পুণ্যময়ী তেজোময়ী মূর্ত্তি আমাদের শাসন করিতেছে; তোমার কোটী কোটী চক্ষু আমাদের পাপ ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে। দোহাই, মা, তোমার পূজার ঘরে কেউ যেন অশুদ্ধ মন লইয়া না আসে। তোমার কাছে আমরা যখন আসিব, শুদ্ধ শান্ত মনে হাসিতে হাসিতে পুণ্যজলে আমরা শুদ্ধ হ'ব। মা, একবার কোলে কর, যেমন গৌরাঙ্গ ঈশাকে কোলে ক'রে আছ, তেমনি আমাদের কোলে কর। কাদা মাটি মাখিয়া তো আর উঠিতে পারিব না — আমরা জন্মেও পিতার কোলে উঠিতে পারিব না। তবে আর দেরী ক'রো না, আমাদের পুণ্যজলে স্নান করাইয়া কোলে কর। মা, আমরা যেন তোমার পবিত্র প্রেমের জলে আমাদের সকল পাপ ধৌত করিতে পারি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে থেকে আমাদের মনের মালিন্য দূর করিয়া শুদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! [সা—]

স্বর্গের চিহ্ন

(হিমাচল, সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে গতিনাথ, হে আর্য্যদিগের নেতা, আমাদিগকে এমন চিহ্নিত কর যে, পৃথিবী আমাদের দেখিয়া বিশ্বাস করিবে। জগদীশ, যদি সকলের সঙ্গে আমরা সমান হইলাম, তবে লোকে বলিবে, আমরাও যেমন, এরাও তেমনি। তাহা হইলে, ঠাকুর, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না, আমাদেরও গতি হইবে না। ঠাকুর, একটি একটি নিদর্শন দাও। তোমার চিহ্নিত হইয়াছে যারা, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী তারা। তাদের দেখে পৃথিবী বলে, ইহারা ভগবানের চিহ্নিত অনুগত লোক। আমরা এই চাই, রাজার সঙ্গে যেমন রাজার কর্ম্মচারীকে দে'খে লোকে বলে, এ রাজার কর্ম্মচারী, আমরাও তেমনি তোমার সঙ্গে বেড়াব, লোকে দেখিয়া বলিবে, এরা বিশ্বরাজের কর্ম্মচারী। আমরা কবে জীবনে প্রেম, পুণ্য ও শান্তির সামঞ্জস্য দেখাইয়া চিহ্নিত হইব? কবে আমাদের কোমরে নববিধানের কোমরবন্ধ থাকিবে? দয়াময়ি, যতগুলি তোমার ভক্ত আছেন, সকলেরই চিহ্ন আছে; সকলেরই গলায় একটি ক'রে, বুকে একটি ক'রে সোণার চাকৃতি থাকে। আমাদের কয়টি এমন সদ্‌গুণ থাকিবে যে, যে দেখিবে আমাদের, তোমার চিহ্নিত বলিয়া বুঝিবে। গোলের ভিতরে যেন আর না থাকি। সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিলে লোকে যদি বলে, তুমি কার লোক?—আমি তো কিছুই বলিতে পারিব না। শ্রীহরি, কি দেখে তাহারা চিনিবে? আমি যদি বলি, আমি ভগবানের পূজা করি, আর যাহারা পূজা করে না, তাহারা বলিবে, তাহা হইলে তুমি নির্লোভী হইতে। আমি যদি বলি, নববিধান ভিন্ন আমি আর কিছুই বিশ্বাস করি না, তারা

বলে, কই তোমাদের চিহ্ন কই? আমরা জানি, মার লোকের গলায় তিনি সোণার চাপরাস চিহ্ন দেন। তখন কি বলিব? ভাবিয়াছিলাম, আমাদের দেখিয়া পৃথিবী বলিবে, এরা খুব সাধন ভজন করে। হায়, হরি! পৃথিবীর কাছে সহানুভূতি পাইলাম না যে; তাই, মা, তোমার কাছে ঘুরে ঘুরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলাম। আমরা তো জানি না যে, লোকের গলায় সোণার চাপরাস থাকে। এখন যাই কোথায়, দাঁড়াই বা কোথায়; ভক্তদের গলায় কি ঝুলিতেছে, ঐ একটি দাও না, মা। আমরা এখনও ওদলের উপযুক্ত হই নাই। মা, আমাদের স্নান করাইয়া ঐ চিহ্ন দাও। পৃথিবী দেখে বলিবে, এই বার বুঝিলাম, তুমি মার। এই রকমে তোমার দলের সকল লোককে চিহ্নিত কর। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সকল স্থানের লোক আমাদের দেখে বুঝিতে পারিবে। আমি তা' হ'লে তোমারই হইলাম। মা, চিহ্নিত কর, খাঁটি কর। তা' হ'লে কত আহ্লাদ হইবে। আমরা মায়ের, মা আমাদের, আমরা মায়ের, মা আমাদের, এই ব'লে নাচিব। আর তা' না হ'লে কিছুই হ'বে না। মা, বড় ইচ্ছা হয়, জীবন থাকিতে থাকিতে তোমারই হই। মা, দয়া ক'রে আশীর্ব্বাদ কর, আর এ দরজায়, ও দরজায় যেন না বেড়াই, এ সম্প্রদায়ে, ও সম্প্রদায়ে যেন না যাই। তোমার নিদর্শন বুকে রাখিয়া সকলকে দেখাইব। সকলে তোমাকে আদর এবং ভক্তি করিবে। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বৈরাগ্য

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
৫ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে প্রেমের দৃষ্টান্ত, পৃথিবীতে আসা কিসের জন্য? আপনার জন্য, কি জগতের জন্য? আত্মা স্বার্থপর, কি আত্মা সেবক? হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে তো আর তুমি সন্দেহের পথ রাখ নাই। তোমার লোক যাঁহারা পরের জন্য পরিশ্রম করিবেন, তাঁদের হাত, তাঁদের পা, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম এমনি করিয়া সৃজন করিলে যে, সে সমস্ত পরের জন্য। তাঁদের মাথাগুলো পরের চরণে, তাঁদের চক্ষের জল কেবল পরের জন্য পড়িতেছে। তাঁদের ঘর সংসার টাকা কড়ি সব পরের জন্য। এ পৃথিবীতে আপনার জন্য আসে পশুরা। তোমার সন্তানেরা আসেন পরের জন্য। বাঘ ভালুক যারা, বনের পশু যারা, তারাই কেবল আপনার সুখ চায়, আপনার জন্য খেটে মরিয়া যায়। তোমার ভক্ত বলেন, আমার যা কিছু ছিল, সব গেল, এখন রক্ত মাংস কেটে কেটে দেবো পরের জন্য। হে নাথ, যথার্থ মনুষ্য যাঁরা, এঁদের ভিতর দেবতার রক্ত আছে। তাঁরা নিজের সম্বন্ধে সব ভুলে যান, নিজের সম্বন্ধে বোকা হন, নির্ব্বোধ হন। নিজের বেলা কৃপণ, পরের বেলা উদার; নিজের বেলা হাত পা তাঁদের বুকের ভিতর সেঁদিয়েছে, পরের বেলা পরিশ্রমী। হে শ্রীহরি, তাঁর কি দোষ, তুমি যে তাঁকে এমনি ক'রে গড়িয়েছ। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি টাকা কড়ি সব প'ড়ে যায় পরের জন্য। তাঁকে রেখেছ উঁচু জায়গায়, আর তাঁর চারিদিকে গড়ান। দয়াসিন্ধো, তাঁর যে জীবনে সহস্র ছিদ্র, ভিতরে কিছু রাখিতে পারেন না; পাত্রগুলো সব ছিদ্র, যা রাখেন, প'ড়ে যায়, জলও থাকে না।

'আমাদের খাওয়াও', তাতো ভক্ত-পরিবার বলেন না, তাঁদের বাড়ীতে কেবল 'দাও দাও' শব্দ। দিতে এসেছি, দিয়ে যা'ব। টাকা দেব, জীবন দেব, রক্ত দেব, দিয়ে চ'লে যা'ব। মা, তুমি আপনি যেমন, তোমার কথাগুলো এলোমেলো, চুলগুলো এলোথেলো; তোমার অত বড় কুবেরের ভাণ্ডার, একটা চাবি নাই, যে যা পাচ্চে, সব নিয়ে যাচ্চে। একবার তোমাকে জিজ্ঞাসাও করে না, সব লুঠে নিচ্চে। সমস্ত বাড়ী খোলা। কেন, ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে একটাও কুলুপ নাই? তোমার লোকজনগুলোও ঐ রকম। ঈশা-মুষাগুলোও ঐ রকম দিল্‌দরিয়া। বাপ যেমন, ছেলেও তেমনি হয়। উঁরাও তেমনি। দয়াময় হরি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন শূকরের মতন না হই, কেবল দিল্‌দরিয়া হই। পরের সেবাতে জীবনটা উৎসর্গ করি, তা' হ'লে শরীরের চামড়াখানা সার্থক হ'বে, রক্ত মাংস সব সফল হ'বে। হরি, গরিবদের আজ দুটো পয়সা দিয়াছি, আমরা যেন জাঁক ক'রে এরূপ কথা না বলি। এই যেন মনে করি, বাপ পিতামহ উদ্ধার হ'য়ে গেলেন, এই এক মুটো চাল গরিবকে দেওয়াতে। মা, তুমি একেবারে স্বার্থশূন্যা, তুমি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সব ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছ; কেবল ছেলে মেয়ে কিসে ভাল হ'বে, জগজ্জন কিসে ভাল হ'বে, এই ভাব্‌ছ। একটি পাকা আঙ্গুর, একটি পাকা সুমিষ্ট ফল আপনি কখনও খাও না: বল, আমি কেন খাব, এ ছেলের জন্য। আমরাও যেন তোমার মত পরের জন্য সব করি। আমি যে কে, এ আর ভাবিব না। সব দিচ্চি পরকে। আর শূওরের মত হ'ব না। তা' হ'লে স্বর্গে যেতে পার্‌ব না। স্বার্থপর স্বর্গে যেতে পারে না। তার বড় কষ্ট। মা, তুমি যখন বিচারাসনে ব'সে বল্‌বে, ওরে, পরের জন্য কি করেছিস্? তখন কি বলিব? মা, আমরা যদি তোমার বিচারের সময় বলিতে পারি, কেবল পরোপকার করেছি, তুমি

অমনি সোণার মুকুট দিবে। তোমার মত নিঃস্বার্থ হইয়া যে পরোপকার করে, আমি নিশ্চয় জানি, স্বর্গে তাহার জন্য উচ্চ আসন আছে। হরি, পোকার মত যেন না থাকি, কেবল পরের সেবা করি। পাপী যারা, তাদের কাছে ভগবানের পবিত্র সুখ আসুক, এরা সুখী হউক, এই কেবল ভাবিব; যেন সব পরের জন্য দি, নিজের জন্য যেন না ভাবি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে থাকিয়া আমরা যেন নিঃস্বার্থ হই। স্বার্থপর হইয়া আর থাকিব না। পরের জন্য প্রাণ দিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান পাইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গরাজ্য

(হিমাচল, বুধবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
৬ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে স্বর্গরাজ, হৃদয়ের ভিতরে যে ছবি আঁকিয়া দিলে, তাহার ন্যায় বাহিরে তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনের ছবি কবে, ভগবান্, বাহিরে হইবে? ভিতরে এক প্রকার, ঠাকুর, বাহিরে আর এক প্রকার। কি মনোহর স্বর্গরাজ্যের ছবি ভাবুকের হৃদয়ে তুমি অঙ্কিত করিয়াছ। কিছু কাজ না থাকিলে তাই দেখি, আর ছবির ভিতর বেড়াই। হে পিতঃ, যখন বাহিরের কাজকর্ম্ম থাকে না, তখন কল্পনার রাজ্যে সেই ছবি দেখি। যখন পৃথিবী কষ্ট দেয়, তখন সেই ভাবী রাজ্যের দিকে দৃষ্টি করি। প্রেমময়, যখন বাহিরের সাধক ভক্ত কলহ করেন, তখন সেই মনের ভিতর শান্তি-পরিবারকে দেখি। যখন মনের ভিতর কষ্ট হয়, তখন হিমালয়ের শীতল বায়ুতে মনকে

ঠাণ্ডা করি। হরি, মনের ভিতর তো সব রেখেছ, তার সঙ্গে বাহিরের বড় তফাৎ। সে রাজ্য আর এ রাজ্যে অনেক তফাৎ। হৃদয়ের ভিতর সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিতেছেন, পরস্পরের কাঁধ ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখ, হে হরি, বাহিরে কি কলহ বিবাদ! অন্তরে যদি প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিলে, মা অন্তর্যামিণি, বাহিরেও তেমনি কর। একটু একটু, ঠাকুর, দেখিতে দাও; তোমার পায়ে ধরি, অনেক বৎসর গত হইল, সেই অন্তর রাজ্যের শিকির শিকি যদি বাহিরে দেখিতে পারি। সেই স্বর্গরাজ্য, দীনবন্ধো, বাহিরে কর। ভিতরে যদি এ রকম না থাকিত, কোথায় যাইতাম? তাইতে তোমাকে বলি, ঠাকুর, দুঃখ বিপদের সময় এমন একটা জায়গা ক'রে রেখেছ যে, সেখানে গেলে সুখ হয়। সেখানে কেবল মিলন। মা, তোমার পায়ে পড়ি, এই বেলা নববিধান এসেছেন, এই বেলা আরম্ভ কর। বাহিরে সে মিলন নাই; মা লক্ষ্মি, আমাদের পরিবার সংসার সেই রকম ক'রে দাও। তাহা হইলে গাঁ গাঁ শব্দে তোমার প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে হইবে। ঠাকুর, তোমার কি এই ইচ্ছা নয় যে, বাহিরে সেই রাজ্য হয়? হাঁ, তোমার ইচ্ছা বই কি। হে হরি, সকলকে এই কথা ব'লে দাও, যেন শীঘ্র শীঘ্র তোমার স্বর্গরাজ্য আনে। আমাদের মন সেই রাজ্যের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। হে পিতঃ, আমরা যেন ভিতরে তোমার স্বর্গরাজ্য লুকাইয়া না রাখি। আমরা যেন বাহিরে স্বর্গরাজ্য আনিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার শ্রীপদে পড়িয়া দেখি, সেই স্বর্গরাজ্য বাহিরে আসিতেছে, সকল নরনারী আনন্দধ্বনি করিতেছে; এই দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সদলে স্বর্গে গমন

হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
৭ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে পতিতপাবন, দলছাড়া আমরা তো কিছুই নই; আমাদের স্বতন্ত্রতা তো নাই। দীনবন্ধো, আমরা একা একা বৈকুণ্ঠের পথে যাইতে পারি না। এই যে সকল কলহ বিবাদ হিংসা দ্বেষ, এই সকল আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে যে, প্রভো, দলছাড়া কিছুই হইবে না। এরা সব এক রাস্তায় চলিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতেছে না। সকলে মনে করিতেছে, জীবনান্ত হইলে তোমার কাছে গিয়া বসিবে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব-যোগ নাই। একা একা যাইবার হইলে, ভগবান্, এত দিন কি কেউ স্বর্গে যাইত না? একত্র স্বর্গে যাওয়া যখন ঠিক্ হইল, তখন পরস্পরের সঙ্গে ইহারা কেন মিলন করিবে না? এরা যেন কোথা থেকে গুরুবাণী শুনেছে যে, জীবন শেষ হ'লেই ইহাদের জন্য স্বর্গ হইতে রথ আসিবে। মা, তবে এরা কেন আমার কথা শুনিবে, আমার উপদেশ মানিবে? এরা বলিবে, "মা আমাদের বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন, তুই কেন অমন কর্‌ছিস্। এই দেখ, আমরা ঝগড়া ক'রেও একতারা বাজাইতে বাজাইতে রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতেছি।" ভগবান্, এ স্বপ্নভাব এদের দূর কর। তোমার স্বর্গের দ্বার কি এমনি খোলা আছে যে, রাগ লোভ নিয়ে যাওয়া যায়? তোমার দ্বারী কি দরজা খুলে দেবে এদের? তবে কেন চোক বুঁজে যোগের ক্ষেত্রে ব'সে থাকিব? কেন হিমালয়ের উপর হিমে ব'সে যোগ শিক্ষা করিব? কেন আত্মবিনাশ করিব? বামন হ'য়ে চাঁদ ধরিতে পারি যদি, পাপী হ'য়ে স্বর্গে যাই যদি, তবে কেন কষ্ট করিব?

এ কথা ওদের কে বলেছে, এ কথা ওরা কোথায় শুনেছে ? ভগবতি, দেখিতেছ তো, মিথ্যা অপবিত্র বিশ্বাস থাকিলে কি হয়। নববিধান-বিশ্বাসী হইলেও, ঐ যে মনের ভিতর একটু বিষ ঢুকেছে, ওরা ভাবিতেছে, একা একা স্বর্গে যা'বে। মা, ধমক দিয়া ব'লে দাও, ওরকম ক'রে কাম, ক্রোধ, লোভ লইয়া যেতে পারবি নি। কি সাংঘাতিক রোগ !! মানুষে মিছি মিছি জাল কাগজে লিখেছে, এ সব লইয়া স্বর্গে যাইতে পাইবে, আর তাহাতে তোমার নাম সই ক'রে দিয়েছে। এ পাপগুলি না ছাড়িলে স্বর্গে যাওয়া হ'চ্চে না। হে দীনতারিণি, আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়া বুঝাইয়া দাও, এই পাপগুলি ধুয়ে তবে স্বর্গে যা'ব। পরিত্রাণটা ক'রে দাও আগে, তার পর স্বর্গে গমন। মা, আমাদের ভুল ভ্রান্তি দূর ক'রে দাও, তার পর আমরা ভাল হইব। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণে প'ড়ে থেকে, সকল পাপ দূর ক'রে, স্বর্গে যেতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পুণ্যবল

(হিমাচল, শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
৮ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে পবিত্র বিচারপতি, মাতৃক্রোড় বিচারের আসন, ইহা কি আমরা বুঝিতে পারি ? দয়াময়ী মা যিনি, তিনি কি আবার বিচার করেন ? বিচারের কথা মানুষ সহজে মনে করিতে চায় না, সেই জন্য কেবল তোমার দয়ার কথাই বলে। মা, তুমি যখন আমাদের পাঠাইলে, তখন বলিয়াছিলে, "তোমরা সত্যধর্ম্ম পালন করিবে, দয়াব্রত

সাধন করিবে।" তুমি প্রেমের সাগর, তা জানি। এইত ভবে আসিলাম, এইত সংসারে এত কাল কাজ করিলাম। কি কাজ করিলাম, ঠাকুর, একবার হিসাব লও দেখি। পরলোকের কাজ অতি অল্পই করিয়াছি। সকলেই এক দিন চলিয়া যাইবে। কে বিধবার উপকার করিল? পরসেবার জন্য কে কত পরিশ্রম করিল? আপনার সংসারের খাওয়া দাওয়া, মান মর্য্যাদা কে কত পরিমাণে পরের সুখের জন্য ছাড়িয়াছে? লক্ষ লক্ষ টাকা আসুক, মন টলিবে না, এ কে বলিতে পারে? জিহ্বা কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, কে এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারে? জীবন শেষ হইতে চলিল, এখন, হে জগদীশ্বর, আমাদিগের কি গতি হইবে? বার্দ্ধক্য মধ্যে এখন কি কেহ প্রেম পুণ্য অন্বেষণ করিবে? জগদীশ, এমন কে, বল দেখি যে, পুণ্য সাধনে মন দেবে? এ কি পূর্ণ যৌবনের অবস্থা? তবে কি ভবে আসা বৃথা হইল? আমাদের দলের লোক বিচারে উচ্চ আসন যদি না পাইলেন, তবে নববিধানের লোক কি করিল? আমার দলের লোক বলিবে, অন্ততঃ এক শত বিধবার সেবা করেছি, দুঃখী হয়েছি, যে অবস্থায় ছিলাম, তার চেয়ে অনেক নীচু হইয়াছি, পরের জন্য অনেক অপমান উৎপীড়ন সয়েছি। আমার প্রত্যেক বন্ধু যখন এই রকম করিবেন, তখন আমার মন প্রফুল্ল হইবে। মা, এরা বিচারকে ভয় করে না কেন? এখনি যদি তুমি বিচারের পরিচ্ছদ প'রে এসে বল, বল্ দেখি, তোরা স্বার্থপরতা ছেড়েছিস্? পঁচিশ বৎসর সাধন করিতেছিস্, এখনও কিছু হ'লো না? এই ব'লে যদি, মা, তুমি চটাস্ চটাস্ ক'রে চড় মার, আমরা আর তোমার বিচারের সিংহাসনের দিকে মুখ তুলিতে পারিব না। হরি, মৃত্যুর আগে আমাদের ভাল কর, আর পাপ যেন না করি। কত বড় বড় পাপ করি। তোমাকে কম ভালবাসি, ভাইয়ের সঙ্গে অমিল। এই যে পাপ রিপুগণ, ইহারা এখনও

আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। তোমার ছেলেগুলো এখনও রিপুপরতন্ত্র হ'য়ে ঝগড়া করে। ২৫।৩০ বৎসর সাধনের পরেও ইহাদের মনে হিংসা হয়, লোভ হয়। সাধন তবে ভিতরে পৌঁছয় নি। কত জল গায়ে ঢালিলে, তবুও শুদ্ধ হইল না, ঠাণ্ডা হইল না, নরকের আগুন নিবিল না। দীনবন্ধো, তবে বুঝিয়া দেখ, এদের ভাল করিতে কত দিন লাগিবে। মা, তোমার দয়ার ঝড় এনে এদের পাপগুলো উড়িয়ে দাও। আমরা, ভাবিতেছি, কোন রকমে জিতেন্দ্রিয় হয়েছি তো, আমরা ক'টি ভাই হরিপদ চাই, তাহা হইলেই হইল। লোভ টোভ সব যাবে। বল্‌বো, দেখ, ভাই, সাধনের বলে ভাল হয়েছি, রাগ লোভ সব ছেড়েছি, আমরা কেবল চুপ ক'রে ব'সে ব্রহ্মধ্যান করি। মা, আমাদের উদ্ধার কর। মা, আমরা যেন ভবে আসিয়া নিজের কাজগুলো করিয়া লইয়াছি, এইটি বুঝিতে পারি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার কাছে থেকে, শমনকে ফাঁকি দিয়া, কেবল ব্রহ্মসুখে সুখী হইয়া, কাল কাটাইতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

রূপদর্শন

(হিমাচল, শনিবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
৯ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে জননি, হে আনন্দময়ি, তুমি আমাদের দেবতা হইয়াছ, তুমি আমাদের আনন্দ এখনও হও নাই। তোমার পূজা করিতে শিখিয়াছি, তোমাতে সুখী হইতে শিখি নাই। কত বস্তুর সঙ্গে, হে হরি, তোমার তুলনা করি ; কখন চাঁদ বলি, কখন ফুল বলি, কখন সুধা বলি।

জগদীশ, এই সকল উপমা মৌখিক কি নয়? সুধা খেলে যেমন হয়, তেমনি কি তোমার উপাসনা করিলে হয়? ঈশ্বর, শীঘ্র আমাদের মিথ্যা কথা থেকে উদ্ধার কর। সাধু ভাষায় কথা কই, রূপক পদ্য সুললিত ভাষা মুখ দিয়ে আপনি বাহির হইতেছে। কিন্তু, মা, তোমাকে যদি আমরা দেখিতাম, তা' হ'লে আমাদের মন গ'লে যেতো। যে গোলাপের মত তোমাকে দেখে, তার কি দুঃখ থাকে? সে যে ধন্য। তবে এই যে রূপক তুলনাগুলো দি, তা যেন মিথ্যা না হয়। মা, তোমার মুখ দেখে বলি, ঠিক চাঁদের মতন। উপাসনা করিতে আসিলাম, তোমার মুখ দিয়া কি ঠিক চাঁদ দেখা যাইতেছে? আমরা দেখিতে পাই, যদি তোমায় একটি ফুলের মত বলি, তা' হ'লে মন কোমল হইবে। মা, এখনও তোমাকে একটু কাঠের মত ভাবি, তুমি তত নরম নও। এখন আমাদের সে রকম হয় নাই, এখন যেন পিতার হাত, একটু শক্ত। মা ব'লে ডাকিতেছি যখন, তখন সুকোমল ভাব পাইব ব'লে। হে হরি, তুমি মন ভোলানে শ্রীহরি হও। আমার মা যে ভারী শীতল, মন মুগ্ধ করেন, এই ভাবে দেখিতে দাও। চাঁদমুখ হও যদি, খুব ভাল ক'রে দেখিতে দাও। তোমার কাছে বসি, আর তোমাকে দেখি। সকলকে বলি, মা কেমন, যেমন লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুল ফুটেছে, তার সৌন্দর্য্য সৌরভ চারিদিকে বাহির হইতেছে। সুখের চাঁদ, সুখের বসন্ত, এই রকম মনে অনুভব করি। তাহা হইলে ছেলে যেমন মা ছেড়ে থাকতে পারে না, বন্ধু যেমন বন্ধু ছেড়ে থাকতে পারে না, আমরা তেমনি হই। কেবল তোমার কাছে থাকিব, আর ছাড়িব না। এই রকম হইলে ঠিক। আর এখন যে রকম, যেন ধর্ম্মের একখানা ছেঁড়া ভাঙ্গা ঘরে রহিয়াছি। এই পাহাড়ে দুই দিন একটা ভাড়া বাড়ীতে আছি, তোমাকে একটা ভাঙ্গা শালগ্রামের মত দেখিতে আসি। হে শ্রীহরি, কবে এ ভাব দেবে, এমনি

ক'রে মাতাবে, সে চাঁদকে কবে আনিবে ? সে সুধা কবে আমাদের মুখে ঢালিবে ? মা, তুমি প্রেমকুসুমবিকাসিনী, ভক্তহৃদয়বিলাসিনী। দেখিলেই প্রেমকুসুম ফুটে উঠিবে, দেখিলেই ভক্তহৃদয় প্রফুল্ল হইবে। মা, সেই রূপ কবে এই পাহাড়ে দেখাইবে। কবে, মা, কোমল হাতটি মাথায় লাগিবে, মাথা জুড়িয়ে যাবে, বুকে রাখিব, বুক জুড়াবে ? হাতের গহনাগুলি গায়ে ঠেকিবে, ঠিক বুঝিতে পারিব, তোমার আঁচল ধরেছি। মা, সুধামাখা রূপ দেখাও। হে অমৃতদায়িনি, একবার আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যেখানে কোটি চন্দ্র উঠেছে, সেইখানে যাই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে ডুবে যাব, মত্ত হ'ব, যে রূপ কখন দেখিনি সেই রূপ দেখিয়া শুদ্ধ হ'ব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরিদর্শন

(হিমাচল, রবিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১০ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে সচ্চিদানন্দ, যে পুতুল পূজা করে, সে পুতুল দর্শন করে। আমরা কি সত্য দেবকে পূজা করিয়া দেখিতে পাইব না ? আমাদের বিশ্বাস যদি পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা জ্বলন্ত না হইল, তবে আমাদিগের জন্ম বৃথা। আমাদের ইষ্ট দেবতাকে, প্রিয় পিতাকে দর্শন করিব না ? তবে কি করিতে ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম ? দুর্গা, কালীর মন্দিরে কেন প্রবেশ করিলাম না ? রাম, কৃষ্ণের কাছে কেন প্রাণ উৎসর্গ করিলাম না ? হে প্রেমস্বরূপ, বল, আমাদের কি হ'বে ? আমরা কি 'অভাগা' ? সকল দেবতা আপন আপন মন্দিরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ হইল,

কেবল ব্রহ্মদেবতা কোথায়ও নাই; এই কি আমাদের বিশ্বাস? এই জন্য কি আমরা এত বৎসর ঈশ্বর ঈশ্বর করিলাম? এই কি ব্রাহ্মসমাজের পরিপক্ক ফল? তবে ব্রাহ্মসমাজ দূর হউক। সকল ধর্ম্মের লোকেরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কেবল আমরা শোকের চিহ্ন পরিয়া রহিয়াছি? কারণ সকলে নিজ নিজ দেবতাকে দেখিয়াছে, কেবল আমরা দেখি নাই। সকলের ঈশ্বর হৃদয়সরোবরে দেখা দিলেন, কেবল আমাদের ঈশ্বর দেখা দিলেন না। আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলাম, সেই ডাকা ফিরিয়া আসিল। আর কত দিন তোমায় ছাড়িয়া থাকিব? এ অদর্শন-যন্ত্রণা যেন কাহারও না হয়। পৌত্তলিকের ঠাকুর পাথর, তাই সে তাহা দেখিয়া দেখিয়া হাসিতেছে। আর আমরা নিরাকার দেবতা বলিয়া কাঁদিতেছি। হে পিতঃ, এ কি উপহাসের কথা নয়? যখন তোমাকে মানিয়াছি, তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তখন অবশ্যই তোমাকে দেখিবই দেখিব। যদি বল, কিসে দেখ্‌বি? বিশ্বাসে। আমি নিরাকার, আমার রূপ নাই। চিন্তা করিয়া দেখ্‌বি? আমি বলিব, না। দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট করিয়া দেখিব না; আব্‌দারে ছেলে যেমন বলে, আমি এখনি দেখিব, আমাকে চাঁদ আনিয়া দাও, সেই দরের লোক আমরা। এখনি এস, কাছে বস, আমাদের দেখা দাও, আমরা কৃতার্থ হইব, সুখী হইব। বহু দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তীর্থ করিয়া, মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া যে দেখা, সে দেখা আমাদের নয়। এই তুমি, এই আমি, তোমার আবির্ভাব উজ্জ্বল, নয়নে স্নেহ, কাপড়খানি পুণ্যের, মাথায় মুকুট, প্রেমের হস্ত অনুরাগের সুকোমল বক্ষ ভালবাসার স্তনে সুশোভিত। এই যে মা, ইঁহাকে ভালবাসা ও দেখা একেবারেই হয়। যদি এই দেখা দেখাও, হরি, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সফল হ'ল, না হ'লে কাঠ পাথর খাওয়াই সার হ'ল। সকলে এত টাকা পাইল,

হরিধন কেবল পাইল না। মানুষ সব পাইল, কেবল সর্ব্বারাধ্য হরিকে পাইল না। পীড়ার সময় মা বলিয়া রোদনই সার? মা ঔষধ দেন না? আনন্দময়ি, তোমার পূজা শ্মশানে? জগদীশ্বর জগদীশ্বর ব'লে সকলের দুঃখ দূর হয়, তাহা যদি না হ'ল, তবে ধিক্ সকলকে। হরি, কোথায়? এস। কষ্ট করিয়া ডাকিলে এস না, তাহা হইলে মনে হইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া একটা মা বাহির করিলাম। পাছে কল্পনা করিয়া একটা রূপ দেখি, তাই বলি, যে রূপ সহজে পাইব, তাই দাও। আমার মা বলিতেছেন, এই যে তুই আমার কোলে, আয় স্তনের দুগ্ধ খাবি আয়। আমি বলিতেছি, কৈ. ভূত নাকি? মা, দেখ, এমনি অবিশ্বাসী ছেলে। ঘরে মা রহিয়াছেন, ছেলে বলে, কৈ। মা, এই করিয়া দাও, তোমাকে ছাড়িয়া যেন কোন কাজ না করি। তোমার সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে সকল কাজে দেখিব। দিন ফুরাইয়া গেল, কিছু হইল না। মা এক ঘণ্টা কাছে বসিয়া রহিয়াছেন, আমি দেখিতে পাইলাম না। কোথায় হৃদয়ের কমল? কোথায় নিরাকার হরি? কোথায় হৃদয়-বিলাসিনী? এ সব ভাবের কথা। দয়াময়ি, শীঘ্র শীঘ্র এস। এই যে কোটিসূর্য্যবিনিন্দিত রূপে তুমি বলিতেছ, এই আমি তোদের সম্মুখে, দেখ, দেখে আমার রূপসাগরে মগ্ন হও। এক মূষা সেই সাইনা পর্ব্বতে জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিলেন, আর শিষ্যেরা নিম্নে থাকিয়া নিরাশ হইয়া রহিল, দেখিতে পাইল না। মা, এ শতাব্দীতে যেন তাহা না হয়। যেখানে যারা তোমার নববিধানবিশ্বাসী, তাদের মধ্যে কেহ যেন তোমার দর্শনে বঞ্চিত না হয়। জগদ্ধাত্রি, এই কর, যে যখন তোমাকে ডাকিবে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, সকল সময়ে দেখা দিবে। আনন্দময়ি, এস, ভক্তদের সঙ্গে বস, আমাদের নববিধানবাদীরা যেন উপাসনার ঘরে অন্ধকার না দেখে। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার

মুখখানি দেখিয়া, তোমার কোমল রূপে তদ্গতচিত্ত হইয়া, আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জামাই ষষ্ঠী

(হিমাচল, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক ;
১১ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে গৃহদেবতা, তোমার গৃহ মধ্যে আজ অনুষ্ঠান হইতেছে। কোথায় বা পিতা মাতা থাকিত, কোথায় বা পুত্র কন্যা থাকিত, কোথায় বা শ্বশুর জামাতা থাকিত, ঈশ্বর, যদি তুমি নিজ মঙ্গলহস্তে এই শুভ জামাতৃ-অনুষ্ঠান না করিতে? হিন্দুস্থানে কে ইহা করিত? গৃহস্থের বাড়ীতে ইহা কে করিল? হরি বলিলেন, আমিই জামাতা আনিলাম, আমিই তাহাকে সুখের বস্তু করিলাম, আমিই তাহাকে পরিবারের মধ্যে নূতন সম্পর্ক করিলাম। পরমেশ্বর, পুত্র ঘরে থাকেন, তাহার সম্পর্ক ঘরের। কিন্তু যখন দেখি, বাহিরের সম্পর্ক ঘরের কর, তখনই আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন্ সমাজ, কোন্ দেশ, কোন্ জাতি, কোন্ পরিচয়ে পরিচিত, কেহ কিছুই জানে না। শুভ বিবাহের পূর্ব্বে কে জানে, কে আসিবে, কাহাকে কন্যা দিবে ; কিন্তু, হে হরি, পরিবারের কল্যাণের জন্য তুমি দূর দেশ হইতে জামাতা আনিয়া দাও। কেহ জানিত না, কে। না জানিয়া, না শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ভালবাসিল, স্নেহ করিল। হে ভগবন্, পারিবারিক সম্বন্ধ কি আশ্চর্য্য! অপরিচিতকে কেন এত ভালবাসা? এত আদর কেন? ইনি অতিথি নহেন, চিরদিন থাকিবার। এই জন্য, মা, তুমি শ্বশুর শাশুড়ীর মনে

স্নেহ মমতা উদ্দীপন করিলে, কন্যার মনে নূতন প্রণয়ের সঞ্চার করিলে। কন্যা জামাইয়ের যেরূপ নূতন সম্বন্ধ কর, সেইরূপ পিতা মাতাও নূতন সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। একটা নূতন প্রণয় সংঘটিত হইল। নূতন ফুল দেখে জামাই বলিয়া বাড়ীর লোকেরা সকলে আনন্দ করিতে লাগিল। ছোট ছেলেরা গিয়া কোলে উঠিল। পিতঃ, এ সব না ভাবিলে বুঝা যায় না; কিন্তু দেখিলে সব কাজে তোমার জ্ঞান ও নিগূঢ় প্রেম, দেখা যায়। সকলের ঘরে আজ, আনন্দময়ি, জামাতৃগণকে লইয়া শ্বশুর শাশুড়ী সুখী হউন, সকল মা বাপের হৃদয় আনন্দিত হউক। যাঁহারা কন্যাধন পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। নাথ, বিশেষ তোমার ভক্তের ঘরে এই জামাতৃসম্বন্ধ দিয়াছ। আমাদের তুমি মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কর নাই, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। আমাদের জামাতা কুচবিহারের রাজা। আমরা সেই কুচবিহার রাজ্যের আদর করিব। আমাদের কন্যার সঙ্গে জামাতার সম্বন্ধ হইল, আর, ঠাকুর, তোমার আদেশে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে কুচবিহারের বিবাহ হইল। ভগবন্, তোমার ভাব কে বুঝিবে? তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার আশীর্ব্বাদ কন্যা ও জামাতার মস্তকের উপর পড়ুক। দেশের সঙ্গে দেশের মিল হউক! এক রাজ্য কন্যা, আর এক রাজ্য জামাতা। দেশে দেশে বিবাহ হইল, দেশে দেশে মিল হইল, এই জন্য এই বিবাহ হইয়াছে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পিতা মাতা কন্যাকে স্নেহ করে, পুত্রকেই স্নেহ করে; কিন্তু আবার একটি আসিল, সন্তান না হইয়াও সন্তান, পুত্র না হইয়াও পুত্র। ভগবন্, এ প্রহেলিকার অর্থ কে বলিতে পারে? যে ছেলে নয়, সে কেন ছেলে হইবে? তবে নাকি, ঠাকুর, আমাদের ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই করি। তুমি যারে আদর কর, আমরা তাহাকে আদর করি। তুমি যাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আদেশ

কর, জানি না, শুনি না, তবু তাহাকে ঘরে লই, কন্যা তাহার হাতে দিই। মা যাহাকে আনিয়া দেন, তাহাকে গ্রহণ করি। অন্য সম্পর্ক মানুষে করে। শাবকের প্রতি স্নেহ সকলেই জানে। এ সম্পর্ক, হরি, বুঝা যায়। তার পর এই যে নূতন জামাতার সম্পর্ক, ইহা কি আর সামান্য মূর্খ জ্ঞানী বুঝিতে পারে? ভগবন্, তুমি স্বর্গ হইতে বলিতেছ, গৃহস্থ, এই যে নূতন মানুষ দিলাম, এ তোর জামাতা। জানিস্, না জানিস্, আমার জিনিষ গ্রহণ কর্। অমনি স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হইল। গৃহস্থ আনন্দিত হইয়া গ্রহণ করিল। ভগবন্, তুমি সব জান। ছোট ছোট পারিবারিক ব্যাপারে তোমাকে কেহ বুঝে না। ইহার ভিতর তোমার জ্ঞান দেখা যায়। সকল জামাইয়ের হৃদয় ধর্ম্মে পূর্ণ হউক। দয়াসিন্ধো, দয়া করিয়া তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এই জামাই ষষ্ঠী হিন্দুস্থানে শুভ ফল প্রদান করুক। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিবার ও দল

(হিমাচল, বুধবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৫ শক;
১৩ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে পরিত্রাতা, দুইটি জিনিষ ভাল হইলে, তবে জগতের ভাল হওয়া আশা করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয়, আর দলটি ভাল হয়, তাহা হইলে আশা করিব, পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক্। আর এ দুইটি যদি ভাল না হয়, তবে, হরি, কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ করিবে? পিতঃ, যাঁরা এত দিন তোমার পূজা করিলেন, তাঁরা যদি না ভাল হন, তবে কি হ'বে? সকলেই বলিবে যে, কোন্ বাড়ীতে ভগবানের

লীলা হইয়াছে, অমনি পৃথিবী চেঁচিয়ে বলিবে, এই বাড়ীতে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কোন্ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিমা বেশি পড়েছে, পৃথিবী বলিবে, এদের কাছে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে? মা, এ বাড়ীতে যদি পাপ, অবিশ্বাস, অধর্ম্ম ঢোকে, আর এই পরিবার ছারখার হ'য়ে যায়, কে বলিতে পারে, কি হইবে? আমার পরিবার যদি তোমার পরিবার হয়. আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হয়, তবে আমি সকলকে দেখাব. দেখ, আমার সকল বস্তুতে হরি,—চালে হরি, ডালে হরি, বিছানায় হরি। প্রেমের সুগন্ধ, পুণ্যের ধূপ ধূনো দেখ। আর আমার দল যদি তোমার হয়, তা' হ'লে পৃথিবীকে বলিব, দেখ, কত বিভিন্ন এক হইয়াছে। আর তা' যদি না হয়, পৃথিবী বলিবে, আগে আপনার দল সাম্‌লা, তবে আমাদের কাছে প্রচার করিস্। কত লোকের কাছে কত অপমান সহিব। এরা কি তোমার কাছে শুনেছে, ঘর অপরিষ্কার রেখো, খবরদার, ফুল এনো না, আমি যাতে তুষ্ট হই, তা' ক'রো না। মা, তুমি কি এ ব'লেছ? না, কখন তো বল নাই, ঘর অপরিষ্কার রাখিতে। চাঁড়ালদের মতন আমাদের ঘর। অবিশ্বাসের শাস্তি বজ্রধ্বনিতে এখানেও আসিবে। এরা আর কবে ভাল হ'বে? এরা তো অবিশ্বাসে তোমাকে অনায়াসে বলিতে পারে, ভগবতি, এ তোমার বাড়ী নয়, এ আমাদের বাড়ী। মা ভগবতি, আমি কত বার তোমাকে আনিলাম, আর এরা তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের কাছে কত কেঁদে কেটে পায়ে ধ'রে তোমাকে আনিলাম, আর এরাও তোমাকে তাড়িয়ে দিলে। মা, যে দু'টি সাক্ষী পা'ব, মনে করেছিলাম, তাহাদিগের কাহাকেও পেলাম না। ঘর আর দল। আমি পঁচিশ বৎসর সাধনের পর এদের বাবু করিলাম, আমার সম্মুখে এরা সকালবেলা তোমাকে ঘুসি দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে, মঙ্গলবাড়ী পরিষ্কার করে।

এরা ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে। মা, এরা তো নীচ কাজ করে না। মা, এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না? মা, সকল নরনারী তোমার কাজ করিবে, ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হ'বে, তবে তো নববিধান পূর্ণ হ'বে। মা, একটা দল প্রস্তুত কর, একটা ঘর প্রস্তুত কর, যা দেখিলে লোকে বল্‌বে, একটু ময়লা নাই, একটু পাপ নাই, একটু অধর্ম্ম নাই। একটি দলের লোক কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারের ঘর দেখ, একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র ছেলে মেয়েগুলি হাসিতেছে। এ বাড়ার লোকেরা যদি ভাল না হয়, তবেই গেলাম। দুইটি দল প্রস্তুত ক'রে আদালতে লইয়া গেলাম, কে বুঝি পয়সা দিয়েছে, কি বলেছে, অমনি তারা তোমাকে অস্বীকার করিল। মা, বড় বড় যোগ ভক্তি শিক্ষা দিতে বলিতেছি না; কিন্তু এরা যেন তোমার কাজকে নীচ কাজ না মনে করে। দয়াময়ি, ছেলে মেয়েদের মনে বড় অমঙ্গল ঢুকেছে। এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। মা, তোমার লোকদের, প্রেরিত প্রচারকদের বাবুয়ানা লাথি মেরে দূর ক'রে ফেলে দাও। আমাদের এই চামড়া গরুর চামড়ার মত, শূকরের চামড়ার মত, ইহা দিয়া যদি তোমার ঘরের সেবা করিতে পারি, তবে ইহা সার্থক হয়। তোমার লোকদের, তোমার পরিবারের এত অপরিষ্কার দুর্গন্ধ পাপ আর কি সহ্য হয়? মা, ইহাদের তোমার করিয়া লও। সেই আগে কথা ছিল, এই পরিবার তোমার হইবে, তাহাই হউক। হে পতিতপাবন, হে দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের দলটি আর পরিবারটি যেন তোমার করিয়া লই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া, তোমার এই পরিবার পবিত্র হইয়া সংহিতা পড়িতেছে, এই দেখিয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমে জখম

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১লা আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১৪ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল পুরুষ, হে সত্যশিবসুন্দর, তুমি যে যুগে যুগে ভক্তদিগকে মজাইয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেমেতে জখম হওয়া বড় শক্ত ; কিন্তু তাঁহারা তাহাতেই জখম হইয়াছেন। এত নাকাল কাহার জন্য ? সেই প্রেমস্বরূপের জন্য। বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত, হে হরি, যাকে ধরেছ, জখম ক'রেছ, নাকাল ক'রেছ ; তাহাকে প্রেমস্বরূপে ডুবাইয়াছ, তাহাকে পুণ্যের আগুনে পুড়াইয়াছ, নাকাল করিয়াছ। তোমার রূপে, হরি, একটি মনোরঞ্জন ভাব আছে, একটি মোহিনী শক্তি আছে, তাহাতেই জখম কর। ভক্তগণ উপাসনায় যাইবার সময় আগে বলেন, এই বার প্রেমের আগুনে পুড়িয়া জখম হইতে যাইতেছি। অমনি তুমি তাঁদের জখম কর। মা, সেই জন্য ইচ্ছা হয়, আমাদেরও ঐ রকম কর। আমাদের বিদ্বান্ হওয়া অপেক্ষা, তোমার কাছে নাকাল হইয়া বেহুস হইয়া থাকা ভাল। কেমন ক'রে নাকাল করিবে, কর না ? সেই যে তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপটি দেখাও। এই যে সব কত রংয়ের ফুল, এর চেয়ে নাকি তোমার মুখের রং, গায়ের রং আরও ভাল। সেই রূপ দেখিয়া ভক্তগণ মোহিত হন। প্রেমেতে পুণ্যেতে গুলে একটা দুধে আল্তার রং হয়েছে, সেই রং দেখাও, হরি। সেই রূপ একবার চক্ষের সমক্ষে ধর, আমরা সেই রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হই। প্রেমানন্দ, সত্যানন্দ, ভক্তেরা যে সেই রূপ দেখে কত আনন্দিত হন, আর কেমন জখম হন। নাথ, ভক্তেরা যে যুগে যুগে এই রকম হয়েছিলেন। তাঁরা তোমাতে আনন্দিত হইতেন, আর ভেঙ্গে যেতেন, আমরা আস্ত থাকি। সেই যে জখম হ'য়ে,

তোমার পা ধ'রে প'ড়ে থাকা, তা' আমাদের হইতেছে না, হরি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, একবার সকলে মিলে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প'ড়ে, যেন জখম হইতে পারি। তোমার ভালবাসাতে বেহুঁস হইব, হতচৈতন্য হইয়া দিন কাটাইব, মা, এই আশীর্ব্বাদ কর। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরি একমাত্র পরিত্রাতা

(হিমাচল, শুক্রবার, ২রা আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;

১৫ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে মুক্তিদাতা, জীবের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি, ইহা যেন কেহ ভুলিয়া না যায়। হে মঙ্গলস্বরূপ, তোমা বিনা পরিত্রাতা কোথাও নাই, পরিত্রাণের উপায় আর নাই, এমন দয়াও আর কোথাও নাই। কিরূপে মানুষ মানুষকে পাপ হইতে বাঁচাইবে এ সংসারে? অন্ধ কি অন্ধের পরিচালক হইবে? তা' হ'লে যে, ঠাকুর, দুই জনেই নরকে ডুবিবে। খোঁড়া কি খোঁড়াকে লইয়া যাইতে পারে? তা' হ'লেই পাপে পড়িবে। মানুষের ক্ষমতা নাই। পরিত্রাণের কেবল তুমি উপায়, জীব তরাইতে কেবল তুমি। কেবল যা পার, তুমিই পার; অতএব আমরা যেন বিশ্বাস করি, মানুষের একটি পাপ দূর করিতেও আমাদের ক্ষমতা নাই। আমরা কি করিতে পারি তবে? প্রার্থনা করিতে পারি। এইটি, মা, তুমি আমাদের হাতে দিয়েছ। যিনি বেদী হইতে উপদেশ দিতে যান, তিনি অকর্ম্মণ্য। যিনি দেশ বিদেশে প্রচার করিতে যান, তিনিও কিছু করিতে পারেন না। তাঁহাকে কে প্রচার করে, তার ঠিক নাই। উপদেশে কিছুই হয় না। শত সহস্র বার বলিলেও কিছু হয় না। কেবল তোমার

করুণাকটাক্ষ জীবকে পরিত্রাণ দিতে আসে। যার হাড়ের ভিতর পাপ, যে লোভী, তাকে কি গেরুয়া দিলেই সে বৈরাগী হইল? সংসারী ব্যক্তিকে কি রাগ ছাড়ান যায়? অবিশ্বাসীকে কি বিশ্বাসী করা যায়? হে ঈশ্বর, হৃদয়ের একটি সামান্য পাপ কেহ তো উৎপাটন করিতে পারিল না। পৃথিবীর পাপ না গেলে তো শান্তি হ'বে না। তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে হইবে। বোধ হয়, আমরা কাঁদি না, কাঁদিলে তো চক্ষের জলে পাপ ধুয়ে যায়। মা, তোমার কাছে যেন জগতের পরিত্রাণের জন্য কাঁদি। নিজে কিছু পারিব না, এই ব'লে যেন হতাশ হ'য়ে না যাই। রিপু প্রবল থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম হ'বে না। খুব গভীর প্রেমানন্দের ভিতর দিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য, মা, যদি রিপু সব না গেল, তবে সাধন ভজন সকলই বৃথা। প্রেমস্বরূপ, মানুষ যদি নীতিতে ভাল না হয়, তবে সব মিথ্যা। পৃথিবী যে রাগেতে লোভেতে গেল। কে এমন মানুষ আছে, যার একটু অহঙ্কার নাই, হিংসা নাই, রাগ নাই। মা, বই পড়িলেও কিছু হয় না, উপদেশ দিলেও কিছু হয় না, রিপু যে সব কামড়ে ধরে আছে। তবে উপাসনায় আনিলে কেন, হায়, যদি ভেড়ার মত হ'ব না, নির্লোভী হ'ব না? তবে কি তোমার রাজ্যে ঘাস কাটিতে এসেছি? হরি, তবে আমরা কি করিব? ব্যাকুল অন্তরে খুব কাঁদি। অমুক অমুক লোকের অহঙ্কার রাগ বিদ্বেষ যাক্, এ ব'লে না কাঁদিলে হ'বে না। কেহ কাঁদিবে না, মা দয়াময়ি, তবে কি জন্য ধর্ম্ম হইল? কি জন্য এই সাধন ভজন হইল? মা, তোমার চরণ ধ'রে এই ব'লে কাঁদিব—মা, রিপুপরতন্ত্র লোকদের ভাল কর, জগদ্বাসী সব লোকে পাপের আগুনে পুড়ে মরিল। দূর কর এই দলের সকল প্রকার অধর্ম্ম অত্যাচার। দাও, পুণ্য আনিয়া দাও! পাপীকে উদ্ধার করিতে পৃথিবীতে আর কে আছে তোমা বিনা? তোমার কৃপা বিনা কেহ জিতেন্দ্রিয় হয় না। হে প্রেমময়, পৃথিবীর গতি

করিয়া দাও। বাঁচাও সকলকে, হরি, বাঁচাও সকলকে। খুব পূজা দিব, খুব আদর করিব। দোহাই, দয়াল, দোহাই, দয়াল, এই দলটাকে ভাল কর। এই ছয়টা রিপুকে দূর ক'রে দাও। তোমার শ্রীচরণ বুকে, মাথায়, কাঁধে ধরিয়া থাকি। এই হ'লেই তোমার রাজ্য আসিবে। রাগিলেই হইল? পরের মুখ দেখিলে হিংসা করিলেই হইল? সংসারে আসক্ত হইলেই হইল? কেন হ'বে এ সকল? এ অসম্ভব, এ সকল ভাব থাকিবে না। আমাদের মন পাথরের মত হইবে, লক্ষ টাকা আনিলেও মন টলিবে না। হরি, আমাদের মনের ভিতর দেখিয়াছি, আমরা সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, রোজগার করিতেছি না, তবুও আমাদের এ রকম। তাই দেখিতেছি, রিপু ছাড়া বড় শক্ত। দোহাই, মঙ্গলময়, দোহাই, পতিতপাবন, পৃথিবীর আর কেহ যেন রিপুর বশীভূত না হয়। বালক, বৃদ্ধ, রাজা, প্রজা, যে যেখানে আছে, গৃহস্থই হউক, আর বড় লোকই হউক, আর যেন পাপ না করে। রিপুতে কি না করিতে পারে? এই তোমার বিধান আসিল, ঐ ছয়টা রিপু আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দিল। এমন রিপুর প্রাবল্য। মা, এই কয়টা লোককে ডাকিয়া বল, আগে তোরা রিপু পরাজয় কর্। বুকের ভিতর রিপু যার, তার নরক সব স্থানে। এই উপাসনায় বসিয়াছি, এখানে রিপু। বুকটা ধৌত কর, হরি। অন্ততঃ আপনার লোকগুলো যারা, ইহাদের মন হইতে রিপু দূর ক'রে দাও। তাহা হইলে, নাথ, পাপের দায় হইতে বাঁচা যায়। আমাদের মধ্যে আর রাগ হ'বে না, হিংসা হ'বে না। মা যখন দেখিলেন যে, তাঁর এত ছেলের এখনও রিপুপরাজয় হ'ল না, তখন তিনি তাঁর প্রেমকটাক্ষে কট্‌মট্‌ ক'রে এক বার তাকাইলেন, আর অমনি আমরা সকলে ভাল হ'য়ে গেলাম। মা, তোমার কৃপাকটাক্ষে আমাদের মনের রিপুগুলি ভস্ম কর। এই

আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণে থেকে, ষড়রিপুগুলিকে তাড়াইয়া দিতে পারি, এবং তোমার পবিত্র নামের গুণে পাপের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দলপতির প্রত্যাদেশে বিশ্বাস

(হিমাচল, শনিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১৬ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে দলপতি, কিসে তোমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবল হইবে, তাহা শীঘ্র বলিয়া দাও। স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম আসিল, ইহা দেখিলাম ; কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার হইল না। হৃদয়বন্ধো, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি এত বড় ভার দিলে? লোকে বিশ্বাস করে না, কেহই তো শোনে না। এরা মানে না, তাহার জন্ত আমি কেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব? আমি কেন বিধানকে ফেলে দেবো? যুগে যুগে তুমি কি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশা, সোণার পুতুল গৌরাঙ্গ, মুষা, শাক্য, ইঁহারা কি ক'রে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন? ভাল জীবন দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত। ভাল জীবন দেখিল না, তাই সামান্ত লোককে গ্রাহ্য করে না। হে ঈশ্বর, সমস্ত জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মানুষ দেখিল, কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিল না, সকলেই দোষ দেখাইতে যায়। হে ঈশ্বর, এই কথা শুনিতে শুনিতে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। হে দলপতি, এ একটি পরীক্ষা। তবে হৃদয়ে যদি শান্তি থাকে, তবেই ; নতুবা তুমি যদি বল, "তোর্ সব ভাণ, এ সকল তো আমার কথা নয়," যদি, হরি, তুমি এই ব'লে অবিশ্বাস কর, তবে স্বর্গেও লাঞ্ছনা, পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা। স্বর্গ

ছাড়িল, বন্ধু বান্ধবও ছাড়িলেন, পৃথিবীও ছাড়িল। হে জগদীশ্বর, এই কষ্ট, এই দুঃখ তোমার সাধকদের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ কষ্ট। কাহারও ভাল লাগে না আমাকে, কাহার এ মত ধরিতে ইচ্ছা করে না, এ বড় শক্ত, এ করিলে সংসার সাধন যায়। কাহারও ভাল লাগে না, কেমন সকলের অপছন্দ হইলাম। যদি হিন্দুসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, তা' হ'লে ব্রাহ্মসমাজের কাছে অপ্রিয় হইতাম; যদি ব্রাহ্মসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, প্রচারকদের কাছে অপ্রিয় হইতাম; ক্রমে সকলের কাছেই অপছন্দ হইলাম। দীনবন্ধো, দেখ, একে একে সব যাইতেছে। ছোট লোকের মত কেহ হইতে চায় না। আমি চাই, সকলে ঝাঁট দিবে। আমি চাই, প্রচারকদের জীবন সন্ন্যাসীদের মত হয়। তাঁরা আমাকে গালাগালি দেন। আমি যাহা দিতেছি, এঁরা লইতে হয় লউন, আমি চলিয়া যাইব। ইঁহারা আমার কথা মানেন না, সুতরাং, পিতঃ, এ সকল লোককে আমি চিনেছি, বুঝেছি। দয়াময় পিতঃ, আমি যা চাই, এঁরা তা' চান না। এঁরা বলেন, ক্ষমার পথ অতি নীচ, জঘন্য। লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ না করা কাপুরুষের কাজ, তাহা না হইলে সংসার চলিবে না। এই সকলের জন্য আগুনে পুড়িতে হইবে। আজ নয়, হরি, পঁচিশ বৎসর এই কথা শুনিতেছি। আরও যদি বাঁচি, আরও এঁদের অপ্রিয় হইব। না তপস্যার দিকে মন আছে, না আগুন খাবার দিকে মন আছে, না নীচ হ'য়ে ব্রহ্মের ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার দিকে মন আছে। সকলের ধোপ কাপড়। আমি অভদ্র হইলাম, নীচ হইলাম, দুর্ব্বল দলপতি নাম পাইলাম। এই রকম করিয়া কোন স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। যারা আগে দলকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত না, তাহারা এখন সুখী করিতে চেষ্টা করে। হরি, আমি যাহাদের এত করিলাম, তাহারা বলে, এ সকল ঠিক নয়, মন-গড়া, আমি নিজে বলি। লোকে যখন তর্ক

করিতে আসে, জানে না, তোমাকে তাহারা মারিতে আসে। আমি যাহা বলি, সমুদয় তোমার কথা। এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না। পৃথিবীর গতি কি ক'রে হ'বে, বলিয়া দিতে পার ? যদি পথ বদলাইয়া লইতে হয়, তো লই। মা, সকলে একবাক্য হ'য়ে যদি বলে যে, এ যা বলিতেছে, সকল ঠিক্, তা' হ'লেই হয়। আমার কথা যে অন্যায় বলে, তাহার যে ভয়ানক শাস্তি। আমার কথাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। তাহা হইলে গরীবদের কি করিয়া তোমার কাছে আনিব। মা, হাতে বল দাও, বুকে বল দাও, তোমার রাজ্য বিস্তার করি। মা, দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের নিজের মত আর না খাটাই ; এই সময়ে যে কোথা হইতে আদেশ আসিতেছে, এই দেখিয়া, তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোগপ্রধান ভারত

(হিমাচল, রবিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১৭ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে যোগেশ্বর, যিনি যথার্থ হিন্দু, তিনি স্বভাবতঃ যোগী। যাহার ভিতরে যথার্থ আর্য্যরক্ত আছে, তাহার ভিতরে যোগরক্ত আছে। যে যোগী নয়, সে হিন্দু নয়। এ দেশ যথার্থ যোগীর দেশ, হিমালয় পুণ্যালয়, যোগালয়। আমাদের আর কি আছে ? ভগবন্, এই মাতৃভূমি লইয়া আমরা গৌরব করি। কিন্তু মন্দ সময়ে আর্য্যের কি আছে ? টাকা আছে, না কড়ি আছে, না হাতী আছে, না বাড়ী আছে, না কি আছে ? কেবল যোগ আছে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ, আমাদের

পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের কি দিয়াছেন? যোগধন। তাঁহারা যাইবার আগে বলিয়া গিয়াছেন, "বৎসগণ, এই চন্দ্র সূর্য্য রহিল, এই যোগধন রাখিয়া গেলাম, এই যোগ-অন্ন দিয়া গেলাম, খাইও, বিতরণ করিও;" এই বলিয়া তাঁরা অন্তর্ধান হইলেন। পিতা যেমন পুত্রকে ধন দিয়া যান, তাঁরাও তেমনি আমাদের যোগধন দিয়াছেন। হিমালয় কত বড় যোগের স্থান। এ দেশের সমুদয় গিরিরাজ যোগেতে ব্যস্ত, এখানকার বৃক্ষসমুদয় যোগ করিতেছে। এ দেশের লোক কি দুঃখী? আমাদের পিতা পিতামহ যে ধন রাখিয়া গিয়াছেন, কত লোক আসিবে, যোগ-ধন খাইবে, তবুও ফুরাইবে না। এ দেশের লোক যদি সংসার সংসার করে, টাকা টাকা করে, তাহা হইলে এ দেশের কলঙ্ক হইল। তাঁহারা কোথায়? আসিয়া দেখুন, আর্য্যের মাথার মুকুট পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা যোগেতে হাসিতেন, ইহারা এখন সংসার সংসার করিয়া কাঁদিতেছে। এ কি সামান্য দেশ যে, যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিবে? চিরস্মরণীয় মহর্ষিগণ, যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে মন পবিত্র হয়, তাঁহারা কোথায়? তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা আজ আনন্দ-সংসারের কাল কীট হইয়া বেড়াইতেছি! ধিক্, মন, এত বড় বংশের সন্তান হইয়া তুমি কাঁদিতেছ! আজ যদি তুমি যোগ করিতে, হিমালয় কত তোমাকে যোগের টাকা দিত; তোমার দুঃখ দেখিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। হে পাপীর গতি, এ অধম সন্তানদের উদ্ধার করিবে কে? আমরা এক সময় কত বড় ছিলাম, যোগী ছিলাম, আমাদের বেদ বেদান্ত সকল দেশ দেশান্তরে বিলাতে প্রচারিত হইতেছে। "যোগ, যোগ" আবার এই কথা ভারতের এ সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হউক। হায় হিন্দু-সন্তান, মাথার মুকুট পদতলে ফেলিয়া দিয়াছ! লও মুকুট আবার মাথায় তুলিয়া রাখ, আবার হিমালয়ের উপর আসিয়া বস। হে দীনবন্ধো,

আমরা কাঁদি, বিদ্বান্ যিনি, তাঁর যোগ নাই, পঞ্জাবে যোগ নাই, মহারাষ্ট্রীয়-দের যোগ নাই। ভারতের যোগ কে লইল? আমাদের বক্ষের ধন কে হরণ করিল? হে যোগেশ্বর, কেবল যোগ দাও, আর কিছু চাই না। যোগে ব'সে কেবল আনন্দ সম্ভোগ করিব, আনন্দনীরে ভাসিব, আনন্দরস পান করিব। দেখ, হে ভগবন্, এখন ভারত মরিয়াছে। তবুও যদি একজন যোগী পর্ব্বতে বসিয়া যোগ করিতেছেন দেখে, তাহা হইলে ভারতের লোক বলিবে, আহা, কেমন যোগী ধ্যান করিতেছেন! তাহা হইলে ভারত আবার যোগবলে বাঁচিয়া উঠিবে। মা, তুমি আবার বল, পুত্রকে দেখা দিয়াছি, আমি যে দয়াময়ী, আমি দেখা দিব না? এই কথা বল, মা, আবার। হে বন্ধুগণ, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণের বন্ধুকে যোগে দেখি এবং কেবল বলি, যোগ, যোগ! হে নব্য যুবকগণ, এই বেলা হইতে যোগ কর। আমরা এই বেলা হইতে যোগ করি, তা' হ'লে বৃদ্ধ হইলে যোগ পরিপক্ব হইবে। হিমালয়, বল, কোথায় যোগীরা বসিতেন, কোথায় যোগের স্বর্ণ পাওয়া যায়? এই হিমালয়ে যোগের অমৃত কোন্ মানসসরোবরে গেলে পাওয়া যায়? প্রেমময়, আবার যোগের ধর্ম্ম খোল। হে কৃপাসিন্ধো, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আবার যোগের রাজ্য দেখিতে পারি। তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া মনের ভিতর সেই যোগরাজ্যে গিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে মিলিয়া, যোগানন্দ সম্ভোগ করিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরি ভক্তিডোরে বাঁধা

(হিমাচল, সোমবার, ৫ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১৮ই জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে ভক্তবৎসল, আকাশে বেদ বেদান্ত তোমাকে পাইল না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে ভক্তেরা তোমাকে পাইলেন। তুমি কৃপা-সিন্ধু, তোমাকে আবার ধরিবে কে ? তুমি আপনি ধরা দিবে। ভক্তের বাড়ীতে তুমি বাঁধা, চিরবন্দী, নিত্য সেবকের মত বাঁধা আছ। এমন ক'রে ধরা দিয়াছ যে, তোমাকে একেবারে ভক্তেরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তুমি দড়াদড়ি পছন্দ কর, যেখানে দড়ি নাই, তাহা তোমার পছন্দ নয়। সন্তান যখন তোমাকে বাঁধে, তুমি চুপ করিয়া হাস ; ভক্তেরা তোমার হাসি দেখিয়া বুঝিতে পারেন, তুমি বলিতেছ, আরও বাঁধ্। তাঁরা দড়ির উপরে দড়ি দিয়া বাঁধেন। চিরকালের জন্য বন্দী হইয়া ভক্তের বাড়ীতে ব'সে থাক। আর ভক্ত যত লোককে আনিয়া তোমাকে দেখান, সকলেই আশ্চর্য্য হয় ; যেন কি দোষ করিয়াছ, এই রকম করিয়া তুমি বাঁধা থাক। এমনি করিয়া গৌরাঙ্গ তোমায় বেঁধেছিলেন, এমনি করিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদ তোমাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়াছিলেন। মা, তুমি আপনি ধরা দাও ; বল, কেন আল্‌গা ক'রে বাঁধছিস্, খুব জোরে বাঁধ্। তোমার ইচ্ছা যে, আর ছাড়াছাড়ি না হয়। কত ব্রাহ্ম তোমাকে বাঁধে না। বলে, বাঁধিব কেন ? যখন দরকার হইবে, তখন ডাকিব। ওরা আনন্দময়ীর ভাবলীলা বুঝিতে পারে নাই। আর যাঁরা তোমার আসল ভক্ত, তাঁহারা আগে পয়সা লইয়া বাজারে প্রেমের দড়ি কিনিতে যান, তখন তুমি দেখিয়া কত হাস। যখন ভক্ত তোমাকে বাঁধিলেন, তখন তুমি হাসিতে হাসিতে প্রেমের উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠ। মা, এ পরিবারে

কি তুমি ঠিক মার মত বাঁধা আছ ? ছেলে বুড়ো এ বাড়ীর সকলে কি বলে, দাঁড়া না, আগে মাকে বাঁধি ? তাহা হইলে, মা, তুমি আমাদের। ঐ তুমি দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসিতেছ, ঐ ভাবে তোমাকে ভালবাসিব, আর তোমার পূজা করিব। মা, তোমার পায়ে বেড়ী দি, হৃদয়ের জেল-খানায় সোণার বেড়ী দিয়া বন্দী ক'রে রেখে দি। থাক, মা, বন্দী হ'য়ে পাপীর ঘরে। মা, তোমার হাত পা আমাদের দলের সঙ্গে বেশ ক'রে বেঁধে রেখে দি। মা দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, ঐ চরণে পড়িয়া থাকিব, আর হৃদয়ে তোমাকে প্রেমের ডোরে চিরদিন বন্দী করিয়া রাখিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিশ্বাসের পরাক্রম

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ৬ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১৯শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের রাজা, তোমার নিদ্রিত লোকদিগকে কৃপা করিয়া জাগ্রৎ কর। অল্পবিশ্বাসীরাই কি কেবল পৃথিবীতে কাজ করিবে, আর হাত দুলাইয়া বেড়াইবে, আর তোমার ভক্তবৃন্দ কি কাল-নিদ্রায় অচেতন থাকিবেন ? এত সকালে নিদ্রা আসিল, দিনের বেলায় ঘুম আসিয়া চক্ষুকে জড়িত করিল। এখনও কত পরিশ্রম করিব, কত লিখিব। ভাই বন্ধু সকল কার্য্য শেষ হইল বলিয়া, অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। এখন তো পরীক্ষার সময়, এখন তো পবিত্রাত্মার আগুন ছুটিতেছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কাহারও তো এখন নিদ্রার সময় হয় নাই। পিতঃ, এ বিষম বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার কর।

ঠাকুর, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, শত্রুদল তোমার বিজয়নিশান উড়াইল, জয়পতাকা উড়াইল। ঈশ্বর, ইহা তো আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সয়তান আপনার কীর্ত্তি স্থাপন করিল। কত লোক মরিবে, কত লোক মরিল ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, দেখিয়াও তো আমাদের জ্ঞান হইল না। যখন সৈন্যদল পরলোকে গেলেন, তখন সয়তান সুযোগ পাইয়া আপনার রাজ্য আনিল ; কিন্তু আমরা বাঁচিয়া থাকিতে, তোমার প্রেরিতগণ বাঁচিয়া থাকিতে সয়তান আসিল। সিংহের পূর্ণ পরাক্রম থাকিতে থাকিতে শৃগাল কি আসিতে পারে ? এখনও পর্য্যন্ত আমরা প্রবলতর হইতেছি না, পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি, আরও সয়তান আসিতেছে। আমরা কি না অহঙ্কার করিয়াছি, তাহার শাস্তি,—এরা দল মানিল না, অবাধ্য হইল। এমন সময়ে কি কর্ত্তব্য ? যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। সব মিথ্যা, যাহারা আক্রমণ করিল, তাহারা সোলার মত, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। যারা শুয়ে আছে, খড়্কের মত। ঠাকুর, এই সময়ে যদি আমাদের বল বিক্রম দাও, আমরা যদি শত্রুকে পরাজয় করিবই বলিয়া রণে যাই, আর তুমি আমাদের সহায় হও, তাহা হইলে সব ওদের সোলার মানুষকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দি। ওরা আগুনবাণ ছাড়ুক, আর আমরা বরুণবাণ ছাড়িয়া সব নিবাইয়া দি। মা, আমাদের অস্ত্রশিক্ষা দাও। মা, আমরা তোমার প্রসাদে সকল রণে জয়লাভ করিয়াছি। কেবল এইবারে সিংহকে শৃগাল আসিয়া ধরিয়াছে। আমরা ইন্দ্রজিৎ, সকল রণ জয় করিব। এবারে আমাদের শিবিরে কি হইয়াছে ? ঠাকুর, বল, ক্ষত্রিয় বংশের রণে পরাজয় ? ক্ষত্রিয়ের পরাস্ত জীবনে অসহ। তাহাই হউক! আমরা কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসরাজ্য স্থাপন করিব। মন্ত্রের সাধন, কি শরীর-পতন। আমরা সকলে এই কথা উৎসাহের সহিত বলিয়া রণে যাইব। ক্ষত্রিয়ের বংশ

কখন চাঁড়ালের হইতে দিব না, এই মন্ত্র সাধন করিয়া, তোমার শান্তিরাজ্য স্থাপন করিব। সকলে প্রবল পরাক্রমে উৎসাহী হইব, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরকৃতজ্ঞতা

(হিমাচল, বুধবার, ৭ই আষাঢ়, ১৯০৫ শক ;
২০শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনসহায়, হে প্রতিদিনের বন্ধো. যে দূরে তোমাকে খুঁজিতে যায়, সে আপনাকে আপনি ঠকায়। ঘরের ভিতরে যাহা রাখিয়াছ, তাহাই দেখি, প্রতিদিন যে করুণা দেখাইতেছ, তাহাই ভাল করিয়া স্মরণ করি। তাহা হইলে আর দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে না। বিশেষতঃ আমাদের মত যে, যাহাদের ঘরে হরি ছড়াছড়ি, তাহাদের কি বিদেশে যাইতে আছে ? তুমি সকলই দিতেছ ঘরের ভিতর, তবে কেন ঘর তীর্থস্থান হয় না ? গৃহস্থ ঘরে ঘরে ঢুকিয়া কেন মনে করে না যে, তীর্থস্থানে আসিলাম, দেবালয়ে আসিলাম ? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ছোট ছোট করুণা কত দিতেছ, যেন চিদাকাশ হইতে রাশি রাশি শিল পড়িতেছে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছেন। ঠাকুর, তোমার বড় দান কত আছে। মা, তুমি যদি একখানি ছোট চাদর দাও, গৃহস্থের মন উঠে না ; যদি একটি পয়সা দাও, তাহা হইলে তাহার মন উঠিবে না ; যদি লক্ষ টাকা দাও, তবেই তাহার মন সন্তুষ্ট হয়। বৃন্দাবনে গিয়া যদি গাছে অনেক আঁব দেখে, তার আহ্লাদ হয়। কিন্তু, মা, তুমি যদি ঘরের ভিতর লক্ষ আঁব দাও, গৃহস্থের মন উঠিবে না। আমরা কি এতই অহঙ্কারী হইয়াছি,

এতই পাষণ্ড হইয়াছি? আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য রোজ রোজ তোমার কত ছোট ছোট করুণা দেখিতেছি। তৃষ্ণার সময় জল পাইলাম, একটি ছোট বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া কত আরাম পাইলাম, তবু তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম না! ঈশ্বর, আমাদের মতন লোক বড় অকৃতজ্ঞ। এমন মা কোথায় পাব, যাঁর ক্রোড়ে অষ্টপ্রহর বসিয়া আছি। এমন দাতা কোথায় পাব, যিনি চব্বিশ ঘণ্টা শিলাবৃষ্টির মতন দান নিক্ষেপ করিতেছেন, অন্ন বস্ত্র টাকা কড়ি দিতেছেন। হরি, যে তোমার এই সব ছোট ছোট দানকে গ্রাহ্য করে না, সে অবিশ্বাসী। তোমার চরণ ধোয়া এক ফোঁটা জল ভক্তেরা সুধা ব'লে পান করেন, একটি পয়সাকে লক্ষ টাকা মনে করেন। এই রকম, হরি, আমাদের কর, নতুবা তোমার ভক্তদল তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার দানের প্রতি যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে পাপে পুড়ে মরিবে। আমরা বড় বড় আচার্য্য যোগী প্রেরিত, আমাদের এ সকল মনে লাগে না। বিনা কড়িতে পাইতেছি ব'লে, দেখ, নাথ, কত তাচ্ছিল্য। রোজ রোজ পাপীর ঘরে আসিতেছ বলিয়া, এখন আর একখানা আসনও পাও না। রোজ রোজ মুটে মজুরের মত খাটিতেছ বলিয়া, কেউ গ্রাহ্যও করে না। এ বিষম পাপ হইতে মুক্ত কর, পিতঃ। প্রতিদিন যে সব দান করিতেছ, তাহা তোমাকে প্রণাম করিয়া গ্রহণ করিব। যে অন্ন বস্ত্রের জন্য কৃতজ্ঞ হয় না, সে চতুষ্পদের পরিত্রাণ কোথায়, ঠাকুর? তোমার প্রেমদৃষ্টি ঝুপঝাপ করিয়া পড়িতেছে, আর থামে না। এই পরিবারে তোমার প্রেম দিন রাত পড়িতেছে। ইহাতে থাকিয়া যেন পরিত্রাণ পাই, ঠাকুর, ইহা দেখিয়া যেন বৈকুণ্ঠ লাভ করি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের বাড়ীতে তোমার দয়া দিন রাত পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া, যেন অন্তরের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা তোমাকে দি; তোমার চরণে থাকিয়া, যা কিছু আমাদের

দিতেছ, একটি ধূলিরেণুকেও স্বর্ণরেণু মনে করিয়া, তোমার দান গ্রহণ করিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ঈশ্বরের শত্রু

হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২১শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে অনন্তক্ষমা, যদি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাই, তোমার লোক হই, তোমারই হই, তাহা হইলে আমার নিজের আর তো শত্রু মিত্র থাকে না। আর তুমি যদি আমাদের সর্ব্বস্ব হও, তাহা হইলে তোমার মিত্রই আমাদের মিত্র হয়। নাথ, যদি প্রাণ তোমাকে ভালবাসে, তাহা হইলে যারা তোমাকে ভালবাসে না, তোমার শত্রু হয়, তাদের দেখিলে আমাদের দুঃখ হইবে। আর যাহারা তোমাকে ভালবাসে, তাহাদের দেখিলে আমাদের প্রাণ আনন্দিত হইবে। তোমার বন্ধু কি আমাদের বন্ধু নয়? হরি, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হইয়া, আমাদের আমিত্ব বিনাশ করিয়া, যেন তোমারই হইতে পারি। অনেক শত্রু আছে, হে নাথ, এই পৃথিবীতে যদি তাদের সঙ্গে এই মিত্রদের সমান করি, তা' হ'লে এদের অমিত্র হইতে হইল। মা, তুমি যদি বল, এই আমার মিত্র, ইহাদের ভালবাসিবে, আদর করিবে, মা, আমরা অমনি তাঁদের লইয়া আসিয়া তাঁদের আতিথ্য করিব। আমার হৃদয়বন্ধুর বন্ধুকে পাইয়া কত আদর করিব। যাই দেখিব তোমার প্রিয় ঈশা, মুষা, গোরাঙ্গ, শাক্যকে, অমনি বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁদের লইয়া আসিব। তুমি বলিতেছ,

এঁরা আমার সখা, ইঁহাদের ভালবাসো। হে ঈশ্বর, তোমার বন্ধু ছাড়া আমরা তো আর কাহাকেও বন্ধু বলিতে পারি না। আনন্দময়ি, তোমাকে যাঁরা ভালবাসেন, আমরা তাঁহাদের গলায় বন্ধুর মালা দিব। আর তোমার যারা শত্রু, তোমার নববিধানের যারা শত্রু, তারা যদি সয়তানের সঙ্গে যোগ দেয়, তা' হ'লে আমাদেরও শত্রু তাহারা। তোমার শত্রু, যারা তোমাকে গালাগালি দেয়, তাদের কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিব। তোমাকে যারা গালাগালি দেয়, প্রাণের হরি, তাদের সঙ্গে আর মিত্রতা রাখিব না। আর আমাদের শত্রু কে? যে আমাদের মাকে গালাগালি দেয়। তারা আর কিসের শত্রু? মা, তোমার সোণার অঙ্গে যারা লাঠি মারে, তারাই আমাদের যথার্থ শত্রু। মা, যারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যারা ভাবিতেছে, নববিধানকে লাথি মেরে ফেলে দেবে, তাদের কি হ'বে? দয়াময়ি, আমরা তোমাকে ভালবাসি, তোমার শত্রুর সঙ্গে আমরা বন্ধুতা রাখিব না। তোমার নাম রাখিব বলিয়া তাদের ডোবাব। যখন সয়তান খানিকটা রাজ্য করিতেছে, তুমি খানিকটা রাজ্য করিতেছ, তখন তো আহ্লাদ হইবে না। কিন্তু যখন দেখিব, সব তোমার রাজ্য, তখন খুব আহ্লাদ হইবে। যখন দেখিব, দলে দলে তোমার লোক নব-বিধানের নিশান লইয়া বেড়াইতেছে, তখন যথার্থ আমাদের সুদিন হইবে। মা, আর যেন তোমার শত্রু না থাকে। সমুদয় ভক্তদল আসুন, আর তোমার রাজ্য পৃথিবীতে আসুক। আমরা যদি দেখি, তোমার সব টাকা কড়ি ভক্তদের শত্রু লইয়া যাইতেছে, আর আমরা বসিয়া আছি, তা' হ'লে হইবে না। আগে আমরা শত্রুগণকে তাড়াইয়া দি, আর নিষ্কণ্টক হই। তোমার শত্রুগণকে দূর করিয়া দিয়া, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ ধ্যান করিয়া, নিষ্কণ্টকে থাকিতে পারি, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর; আমরা যেন তোমার শত্রুদের তাড়াইয়া তোমার বন্ধুদের সঙ্গে হরিগুণ

গান করিয়া, এই পৃথিবীতে পুণ্যরাজ্য, শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [সা —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের বল

(হিমাচল, শুক্রবার, ৯ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২২শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে পাপীর পরিত্রাতা, সকল বিধানেই দেখা গেল যে, খুব বল, সিংহের আস্ফালন, দলপতির প্রাধান্য, দুর্জ্জয় সহায়তাপূর্ণ বিশ্বাস। এবার কেন বলহীন তোমার বিধান, এবার জাগ্রৎ সিংহ কেন নিদ্রিত ? যদি বল থাকে, তবে কেন তাহা অপ্রকাশিত ? হে দীননাথ, এবারকার শাস্ত্র কেন দুর্ব্বল ? লোকের কাছে সংহিতা যায়, তাহারা পড়ে, পড়িয়া ফেলিয়া রাখে। বজ্রধ্বনিতে কেন সংহিতা যায় না ? কারণ কি, হেতু কি, বলিয়া দাও। এই তো স্বর্গের বিধান আসিল, যাহা যুগে যুগে আসিত। সেবারও পরিত্রাণ, এবারও পরিত্রাণ ; কিন্তু এবারে এ রকম কেন ? প্রেমস্বরূপ, এবার প্রেম আসিল, ভক্তি আসিল, বল আসিল না কেন ? উৎসাহের সহিত আমরা লম্ফ ঝম্ফ করি না কেন ? মহর্ষি ঈশার ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি দল যেন সিংহের দল, মহম্মদের কথা যেন আগুন। হরি, সে সব কোথায় গেল, বলিতে গেলে দুঃখ হয়। ঢাকেতে শব্দ হইতেছে বটে, কিন্তু খুব জল পড়িয়া ভিজে ঢাকে কাটি পড়িলে যেমন চ্যাপ চ্যাপ করে, তেমনি। হরি, যে রকম জ্বলন্ত আগুন তখন জ্বলিতেছিল, এখন সে রকম আর নাই। লোকে বইও পড়ে, উপদেশও শোনে, হাইও তোলে, ঘুমিয়েও পড়ে। পিতঃ, বর্ত্তমান বিধান

তোমার নিদ্রিত নিস্তেজ লোকদের হাতে পড়িয়া মারা গেল। হে হরি, তোমার বিধানের এত অপমান, তোমার আদেশ লোকে মানিবে না? তোমার আগুনের মত আদেশের উপর জল ঢেলে দিলে? তুমি তো নির্জ্জীব নও, তোমার আদেশ তো নির্জ্জীব নয়। তোমার এক একটি কথা জ্বলন্ত আগুনের মত আসে। প্রিয় পিতঃ, তোমার মানুষদের জাগাও, তোমার দলের লোকদের চুল ধ'রে উঠাও। এখনকার লোকের মধ্যে আর সে রকম নাই, এক একটা সংহিতার কথা জ্বলন্ত আগুনের মত। মা, নববিধানের লোকদের ঘুম হইতে উঠাও। দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এ সময়ে আর না ঘুমাই। আগে যেমন ব্রহ্মবাণী আসিত, আমরাও তেমনি সেই বাণী শুনিব। ব্রহ্মবাণী রোজ শুনিতেছি, আর কাঁপিতেছি ও সতেজ হইতেছি, মা, আমাদের এই রকম কর। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উজ্জ্বলতর দর্শন

(হিমাচল, শনিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক;
২৩শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে বিনীতবৎসল, হে ভক্তসখা, এ দর্শনে হৃদয়ের সাধ মিটিল না। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মধুরতর দর্শন যদি দাও, তবেই বাঁচিব। দিবে না কেন, দিতে পার না কেন, ইহাই বা কে বলিবে? যুগে যুগে ভক্তগণে ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক উজ্জ্বল আবির্ভাব দেখাইয়াছ। তবে, হে ঈশ্বর, আমাকে দিবে না, দিতে পার না, ইহা বলিব না; দিতেই হইবে, না দিলে পাপ যাইবে না। ঋষিদিগের মত বৈকুণ্ঠধাম এখন তো

হয় নাই। কবে হ'বে ঋষিদিগের সঙ্গে বাস ? যবে দেখা দিবে। একবার দেখিতে চাই ভাল করিয়া। কবে আশা হ'বে পূরণ ? হ'বে যে দিন দরশন। আমি সেই আশায় বসিয়া আছি ; পর্ব্বত, ফল, ফুল, নদী সব তাতে আমি তোমাকে দেখিব। যেমন বাক্সের ডালা খুলে যায়, পিতঃ, যেমন ঝনাৎ ক'রে দরজা খুলে যায়, তেমনি সব খুলে যাবে, নয়নের পুতুল, হৃদয়ের পুতুলকে দেখিব। এই যাবতীয় বস্তু আছে, পৃথিবীতে এই সমুদয়ের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিব। সেই যে দেখা ঋষিদের দেখা, তখনই হিমালয়ে আসা সফল হইবে। তোমার নাম গান করিতে থাকিব। হিমালয় আমার সঙ্গে গম্ভীরভাবে যোগ দিবে, সকলে মিলে আমরা তোমার নাম গান করিব, আর তোমাকে দেখিব। আর দেখাতে এমনি হ'বে, প্রেমময়, তোমাকে দেখ্‌চি দেখ্‌চি, আর তোমার রূপে ডুবে যাচ্চি। কত লোক তোমাকে অমনি দেখ্‌চে, আমরাও তেমনি মাকে দেখ্‌চি, কিন্তু মার মত হচ্চিনি। জলের ভিতর ডুবিতেছি, ঠাণ্ডা হচ্চিনি, আগুনের ভিতর ডুবিতেছি, তেজ পাচ্চিনি ; এ কি কাজের কথা ? মা, দেবি, সুখ দিতেছ, তা' মানি, খুব মাতিয়েছ, তা' মানি। কিন্তু যে দিকে তাকাইব, অমনি পাহাড়ের উপর ধক্ ধক্ করিতেছ, সব তাতে তোমাকে দেখিব। একটি সরিষা হাতে লইব, অমনি ডালাটি উঠিয়া গেল, আর তোমাকে দেখিলাম। পাহাড়ের উপর ব্রহ্মজ্যোতি, সরিষার ভিতর আনন্দময়ী। হরি, আমার নয়নতারা, এমনি ক'রে দেখিতে দেখিতে সব পাপ রিপু চ'লে যা'বে। আর এমনি হ'বে, যেখানে থাকি না কেন, মা আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা হইতেছে। এখনও সে রকম দেখা হয় নাই। মা, দয়া ক'রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন যেখানে থাকি, সব স্থানে তোমাকে দেখি। ব্রহ্মজ্যোতি সকল বস্তুতে দেখিব, কেবল মা মা করিয়া দিন দিন শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা—] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ঋষিভাব

(হিমাচল, যক্ষপর্ব্বত, রবিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২৪শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

হে প্রেমস্বরূপ, হে ধর্ম্মরাজ, পর্ব্বতে আসিলে শরীর তোমার নিকটবর্ত্তী হয়। এ মিথ্যা কথা নয় কেন? এই যে পবিত্র জায়গায় বসিয়াছি, ইহার নিম্নে তাকাইলেও দেশ দেখা যায় না। সেই কোলাহলপূর্ণ নগর কোথায় রহিল, চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না ; স্বর্গের ধ্যান, স্বর্গের তপস্যা এই সমুদয় গিরিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য বলি, দেব, মন তোমার অতি নিকটে। তুমি সর্ব্বদা তোমার দাসকে নিকটে পাও না, তাই স্বর্গের ফাঁদ পাতিয়াছ, তোমার যোগের ফাঁদ। হিমালয়ে সত্যের জাল পাতিয়া বসিয়া আছ, জীব-মীনকে ধরিবে বলিয়া বসিয়া আছ ; কিন্তু জীব তো আসে না। তাই বলি, আর তোমার ফাঁদকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দিও না। এত কাছে আসিয়া আবার যদি ছাড়িয়া যাইতে হয়, তবে তোমার ভক্তের কি আর উচ্চ আশা পূর্ণ হইবে? চণ্ডাল হইতে হইবে। হে প্রেমময়, চণ্ডালজীবন হইতে উদ্ধার কর। পাখী হইয়াছি যদি, জালে পড়ি। এই সকল কারাগারে তোমার যোগী ঋষিগণ প'ড়েছিলেন। যত যোগী ঋষি এখানে বন্দী। তোমার যত বড় বড় যোগী ঋষিরা সংসার ছাড়িয়া যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তুমি তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রেছিলে। মন, যেখানে বড় বড় যোগী যোগচক্রে পড়িয়াছিলেন, তুমি সেখান হইতে পলাইতে চাও? এখান হইতে কখন পলাইতে পার না ; ইহার চারিদিকে কারাগার। প্রেমময়

এখানে যে যে আসে, সে নাকি তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে। আমাদের মত ঋষিরা এসে বলিতেছেন, "ভাই, আমরাও সংসার ছাড়িয়া এখানে এসেছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, খাওয়া দাওয়া করিয়া চলিয়া যাইব, কিন্তু তা হ'ল না। প্রেমময়ের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া আর পলাইতে পারিলাম না, একেবারে যোগের চক্রে পড়িয়াছি। তবে দাও, ভাই, হাত দুইটি বাঁধি।" ভাই, আমাদের হাতে ধরেছ কেন? ছাড় না, আমাদের যে বাড়ী আছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, টাকা কড়ি আছে, সংসার কে ভাবিবে? ভাই, আমরা বেড়াইতে এসেছি যে, আমরা এখানে খাব, খেয়ে দেয়ে চ'লে যা'ব। তোমরা ঋষি যোগী বন্দী হ'য়েছ ব'লে, আমরাও বুঝি বন্দী হ'ব? জোর কর কেন? ছাড় না; কে তোমাদের রাজা? এখানকার রাজা কে? হরি, অন্যায় দেখ একবার। আমরা তো তোমার পূজা করি, যোগ সাধন করি বাড়ীতে। এঁরা কে? এ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষগুলো কে? কয়েদী, এঁদের হাতে যে প্রেমের হাতকড়ি। এঁরা কে গা? তুমি যে আবার এঁদের সঙ্গে যোগ দিলে। ভগবন্, রক্ষা কর, বাড়ী ফিরে যেতে দাও। যদি মারা যাই, খবর দিবে না। ধ'রে নিয়ে যায় যে গো, কেন ধ'রে নিলে? টান কেন? মার কেন? ঐ যে জেলখানায় ধ'রে নিয়ে গেল। প্রাণেশ্বর, এই বেলা ছেড়ে দিতে বল, পালিয়ে যাই। হে প্রেমময়, আমাদের হাতে যে কি দিচ্চে, পা যে গেল। হাত বেঁধেছিস্, বেঁধেছিস্; আর পা বাঁধিস্ নি। এতেও, প্রাণেশ্বর, তোমার মন উঠিল না। উচ্ছিষ্ট প্রেম তুমি লও না। ওরা আবার হাস্‌ছে যে, ওদের দল বাড়িল ব'লে। জ্বালাতন ক'রে তুষ্ট হও নাই? আবার ঘোরাচ্চে, আবার যে গো ঘোরাচ্চে?

কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম! ঋষি ভাই, কোটী কোটী নমস্কার তোমাদের পায়ে, তোমরা বন্দী করেছ, সেই জন্য। চিরদিন

এইখানে বন্দী হ'য়ে থাকি। কি চমৎকার দৃশ্য! এখানে একটা আশ্রম, ওখানে আশ্রম, আশ্রম মায়ের জেলখানা। এমনি ক'রে, আনন্দময়ি, সমস্ত ভারতবর্ষকে বন্দী কর। চিরকাল তোমারই হ'য়ে থাকিব, নরনারী সকলকে তুমি খুব আশীর্ব্বাদ কর। একবার তুমি সেই প্রাচীনকালের ঋষিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, এইখানে আমাদের রেখে দাও। ঋষি আমাদের চিরকালের বন্ধু, হিমালয় আমাদের যোগের স্থান হউক, কেবল ঋষিদের কাছেই থাকি। এ চমৎকার এক নূতন রাজ্য! এইখানে আমাদের চিরকাল বন্দী ক'রে রাখ। যদি আজ এই কয়জনকে আনিলে, তবে যেন চিরকাল এই ঋষিদের কাছে থাকিতে পারি, মা, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। এই হিমালয় আমাদের যোগের স্থান হইল, আমরা চিরকাল তোমার শ্রীচরণে প'ড়ে ঋষিজীবন লাভ ক'রে শুদ্ধ হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরির শুদ্ধতা

(হিমাচল, সোমবার, ১২ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;

২৫শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াবান্, হে ভক্তের হরি, আমরা কেবল বাহিরে শুদ্ধ হইতে তো চাই না আমরা চিত্তশুদ্ধি দেখিতে চাই। আমরা চাই যে, অন্তরের অন্তরে একটিও পাপ হইবে না; কিন্তু আমাদের কুবুদ্ধি, আমাদের পাপ আমরা বুঝিতে পারি না। তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি যদি পাপ দেখাইয়া না দাও, তা' হ'লে মানুষ যে পাপ দেখিতে পায় না। ভাল হইবে কিরূপে মানুষের জীবন, যদি পাপ কুচিন্তা মানুষের জীবনকে না ছাড়ে। যারা

পাপ করে, বন্ধু বান্ধব তাদের ব'লে দিতে এলেও বিরক্ত হয়। পিতঃ, যদি তোমার পুণ্যজলে একবার গা ধুয়ে দাও, তবেই ভাল হই। ভাল হইল এরা ভাব্‌ছে। আমি বেশ সাধু হ'য়েছি—এই ব'লে ব'সে থাকে; তবে কি ক'রে তারা ভাল হইবে? যদি একটু শীঘ্র ক'রে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও যে, "তোরা এখনও অনেক বড় বড় পাপের দাস হ'য়ে আছিস্", তবে আমরা সতর্ক হইতে পারি। আমাদের মাথার চুল যত, পাপ তত। অবিশ্বাস, অহঙ্কার, ব্যভিচার সমুদয় মনের ভিতর পোকার মত বিজ্ বিজ্ করিতেছে। সমুদ্রধারের বালি যেমন, আমাদের পাপ তেমনি। তোমার তো খাতায় যে কত পাপের দাগ আছে, তুমি বিচারাসনে ব'সে কত পাপ আমাদের লিখিতেছ। যে ভাবে, আমি পাপ করি না, সে যে কপট ভ্রষ্টাচারী, সে যে ভয়ানক তোমাকে অবিশ্বাস করে। তুমি বুঝিয়ে দাও, আমাদের মাথার চুলের মত আমাদের মনের ভিতরে পাপ আছে। তাহা না হইলে এরা কি ক'রে ভাল হ'বে, ভিতরে যে সব পাপ, সে কিরূপে যাইবে? তুমি একবার পুণ্যজলে প্রক্ষালন ক'রে দাও, মনের ভিতর প্রেমের বৃন্দাবন আনিয়া দাও, কেবল যোগীদের দেখি, শুদ্ধতার গঙ্গাজলে নাড়ী পর্য্যন্ত ধুয়ে গেল, আর কাল দাগ নাই। হরি, এই রকম ক'রে যাদের শুদ্ধ কর, তারাই যথার্থ শুদ্ধ। কিন্তু যারা মনে করে, আমি খুব শুদ্ধ, তারা দাম্ভিক। যাদের তুমি শুদ্ধ করেছ, তাদের হাড়ের ভিতর একটিও পাপ নাই। কল্যাণদায়িনি, মুক্তিদায়িনি, যদি মুক্তি দিবে, তো এই রকম কর। যারা যথার্থ শুদ্ধ, তারা বল্‌বে, এই দেখ, বুকের ভিতর একটি পাপ দেখ্‌তে পাচ্চিস্? পৃথিবী বলিবে, না; এইবারে যথার্থ শুদ্ধ হয়েছ। এই রকম কর, হরি, যে দিকে দেখিব, তোমার ধর্ম্মরাজ্য, পুণ্যরাজ্য, সব সাদা। সব ভালই দেখ্‌চি, সব ভালই ভাব্‌চি, এ রকম কাদের হয়, যাদের হৃদয়ে পুণ্যসমুদ্র রেখেচ।

দেবতাদের ভাব কেবলই সাদা সাদা ফুল. কেবলই ভিতর পর্য্যন্ত সাদা। যখন সকলে বলিবে—তুই বলিতেছিস্ সাদা, কিন্তু তোর ভিতরে পাপ আছে। কিন্তু যখন পৃথিবী বলিবে, হাঁ, যথার্থ হাড়গুলো পর্য্যন্ত সাদা, যেন আগরার সাদা পাথরের বাড়ী। মা, যখন এই রকম হ'ব, তখনই যথার্থ শুদ্ধ হইব। হরি, আমাদের সব ভিতরের কাল দূর কর। মা, মঙ্গলময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন অহঙ্কার না করি। দিন দিন সমুদয় পাপ গরলকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধানের জয়

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২৬শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মুক্তিদাতা, হে অধমতারণ, অন্ধকার শেষ হইবার, রজনী শেষ হইবার তো সময় আসে নাই। তোমার নববিধান বারংবার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেছেন, ইঁহার জয়লাভ কখন হ'বে? বোধ হয়, যেন পূর্ব্বদিকে একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে। যে সময়ে আমরা তোমার নববিধানকে দেশের স্থাপক বলিয়া আলিঙ্গন করিব, যেন আস্তে আস্তে সেই সময় আসিতেছে। এই সময় তাঁহার লোকদের সতর্ক কর, জাগ্রৎ কর। দীনবন্ধো, তাঁহাদিগকে এই সময় সুমতি দাও, খুব সতর্ক কর, তাঁদের কাজ তাঁরা করুন। যদি দুঃখের সময় চলিয়া যাইতেছে, তবে আমরা তোমার কার্য্য করি। যদি আমরা শুদ্ধচরিত্র না হই, যদি আমরা এখনও ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, তা' হ'লে পৃথিবী বলিবে, পিতা যে কয়টা লোককে কাজ করিতে দিয়াছিলেন, তাহারা তাহার উপযুক্ত

হয় নাই। হে দীনদয়াল, হে প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার এই কয়েকটা লোককে তুমি কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া আনিলে। তুমি ভাবিলে, এদের হাড় ভাঙ্গিল, এখন পুরস্কার দি, এই বলিয়া নববিধানকে দেশে দেশে মহিমান্বিত করিলে। মা, ইঁহার গৌরব বাড়ুক, আমাদের শান্তি হইবে। ইনি যদি পৃথিবীতে রাজত্ব করেন, আমাদের খুব আনন্দ হইবে। যদি নববিধান রাজ্য করেন, তা' হ'লে দুঃখী পৃথিবীর দুঃখ দূর হইবে। আমরা যেন সকল দুঃখ দূর করিয়া, তোমার নববিধানকে মহিমান্বিত করি, আর আমরা উৎসাহিত হই। আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া, এই সময় এই সুবাতাস হইতেছে, এই সুপ্রভাত হইতেছে, দেখিয়া, তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করিব, ইঁহার প্রজা হইয়া আমরা দিন দিন শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের আশা

(হিমাচল, বুধবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২৭শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে শান্তিস্বরূপ, আশা বিনা কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না; যদি করে, তাহার জীবন অত্যন্ত অসুখী। ধার্ম্মিকেরা যদি এই রকম হন, তাঁহাদেরও জীবন অত্যন্ত অসুখী হয়। এই রকম করিয়া, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্ত "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ আসিতেছে", এই বলিয়া আশা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। হে ঈশ্বর, তুমি তাঁহাদের চক্ষুকে এমনি করেছিলে যে, তাঁহারা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন

না। হে ঈশ্বর, আমরা কি এ রকম করিয়া বসিয়া থাকিব না? তা' হ'লে নববিধানের কি হইবে? এই রকম ক'রে কত লোক চ'লে গেছে,; যারা একটু একটু নিরাশ হ'চ্চে, তারা কি আর সুখের পরিবার হ'বে? হে পিতঃ, এই রকম ক'রে বৎসরে বৎসরে দু-পা, এক-পা ক'রে চ'লে যা'চ্চে। পরমেশ্বর, তোমার সাধুসন্তান ঈশা তাঁহার লোকগুলোকে খুব আশা দিতেন, বলিতেন, ঐ এলো এলো। আর আমাদের যে সব লোক বলে, আর পিতার রাজ্য এসেছে! নাথ, এইরূপ পশ্চাৎ গমন বড় সাঙ্ঘাতিক, তোমার নববিধানে। নাথ, আমাদের এই কর, আমরা যেন তোমার ঈশার মত উৎসাহী হই, আর বলি, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। এই বলিয়া আশা করিব, আমাদের কত কালের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমাদের নববিধানের মহিমা দেশ দেশান্তরে বাড়িবে। প্রেমিকের ধন, আশার রতন, মা, খুব আশা-ধন দাও, যে দিন আশা যাইবে, সেই দিন মৃত্যু; জঘন্য নিরাশা মৃত্যুর দ্বার। নিরাশ কেন হ'ব? পিতা আস্চেন, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, কেবল এই বলিব। হৃদয়ের সেই পূর্ব্বজ্ঞান কি হৃদয়ে দেখিতে পাইব না, ঠাকুর? মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা নিরাশার আগুন দূর করিয়া দিয়া, মনে মনে আশা করিব, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে; ঐ রাজ্যের দিকে তাকাইয়া, বিশ্বাসনয়নে, আশা-নয়নে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া সুখী হইব। [সা—]।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মুখদর্শনে সুখ

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২৮শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াবান্ হরি, হে ভক্তের সখা, ভক্তের আহ্লাদ হইলে তোমার আহ্লাদ হয়, ইহা জানি। যদি ভক্ত নৃত্য করেন, তবে ভক্তবৎসলও নৃত্য করেন। আবার তুমি যাহাতে তুষ্ট হও, ভক্ত তাহাতেই তুষ্ট হন। যদি কোন কাজ করিলে, নাথ, তোমার মুখে হাসি হয়, ভক্ত সকল কাজ রেখে সেই কাজ করেন। তিনি বলেন, আমার যে কাজে মার সুখ হ'বে, আমি সব কাজ ফেলে আগে সেই কাজ করিব। দীনবন্ধো হে, তোমার ভক্তের মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তোমার ভক্ত পুরাণ জানেন না, বেদও জানেন না। তিনি কেবল তোমার মুখের হাসি জানেন ; তোমার মুখের হাসিই তাঁহার বেদ পুরাণ। ভক্ত তোমার কাছে এসে বসেন, গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম করেন, আর বলেন, মা, তুমি কি চাও আমার কাছে ? মা বলেন, আমি এইটি চাই, তিনি অমনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল খুঁজে সেইটি করেন। মা, আমাদের সকলের জীবন এমনি হউক। মা, যে কাজ করিলে তুমি সুখী হও, আমরা সকল কাজ ফেলে যেন সেই কাজই করি। মা হেসেছেন, তবে আমাদের মুক্তি। এই তো বৈকুণ্ঠ। মা, আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে দূর ক'রে দাও। কি তোমার রুচি, তোমার মন কিসে প্রসন্ন হয়, এই কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া, এই শাস্ত্রে জীবন শেষ করি। আর কোন কাজ আমরা চাই না। দয়াসিন্ধো, দীনবন্ধো, ইচ্ছাগুলো আমাদের তুমি একেবারে শেষ কর, কেবল আমার কিসে ভাল হ'বে, এ যেন আর না ভাবি।

মার মুখেই আমাদের সুখ, আমি সুখী হয়েছি কেবল মার মুখ দেখে।

মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা চিরদিন তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া, তোমার সুখে সুখী হইয়া দিন কাটাইব, আর তোমার সুখে মগ্ন হইয়া জীবন সফল করিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অটল যোগ

(হিমাচল, মুসাবুরা, শনিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৩০শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে শান্তিদাতা, যেমন সংসারের ঝড় তুফানের মাঝে তোমার সাধক তোমার কোলে ধ্যানে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকেন, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমাদের শান্ত কর। এই যে হিমালয় অটল অচল হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাথার উপর শোঁ শোঁ করিয়া ঝড় বহিতেছে, কিন্তু তবু হেলে না, দোলে না। তোমার গিরি এমনি সুশিক্ষিত, তার মাথা টলেও না, দোলেও না, শান্ত আর স্থির, বায়ুবিকম্পিত হয় না, ঠিক যেন সিদ্ধ মহাপুরুষ বসিয়া আছেন ধ্যানে। আমরা সামান্য বাতাসে হেলি দুলি। আমাদের মন তো সিদ্ধ নয়। আমরা ছিলাম ভাল, এখন পাপে ভ্রষ্ট হইয়াছি। যোগভ্রষ্ট বাঙ্গালী সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতেছে। দীনবন্ধো, হিমালয়ে আনিলে যদি, আমাদের ঠিক কর। ঝড়ে যেন ঠিক থাকিতে পারি। ইন্দ্রিয়ের ঝড়ে, সাংসারিক অবস্থার ঝড়ে, এই সবের মধ্যে সুস্থির থাকিব। হিমালয়ের একটু ধূলি মাথায় দিব। ইনি যে অটল অচল হইয়া বসিয়া আছেন। হিমালয়, তোমার প্রশংসা করি। চাঞ্চল্যবিহীন যোগসিদ্ধ তোমার গুণ গান করি। হে ঈশ্বর, হে হিমালয়ের ঈশ্বর, গরীব দুঃখী দুঃখিনীদিগকে যদি দয়া ক'রে আনিলে, তবে

হিমালয়ের সমাহিত ভাব যোগ যেন হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া লইতে পারি। ভগবন্, হিমালয়কে দেখিলে যে ভয় করে, এখনও কত শিখিবার বাকি আছে। ঝড় দেখিয়া আমাদের বুক যে কেমন কেমন করিতেছে, আর গিরির ইহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কৈলাসের মহাদেব, এই যে সব কিঙ্কর আসিয়াছে। যদি তুমি বল দাও, আমরা কেন এ ঝড় সহ্য করিতে পারিব না? মহেশ্বর, সিদ্ধিদাতা, দাও আশীর্ব্বাদ, ঝড়কে রথ করিয়া তাহার উপর চড়িব। পতিতপাবন, আমাদের হীনতা হইতে রক্ষা কর। লোভী না হইয়া, রাগী না হইয়া, আমরা হিমালয়ের বংশ হইয়া, যোগেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিব। সব ছাড়িয়া এখানে থাকিব, কেবল তোমাকেই কিন্তু ছাড়িব না। কৈলাসে যিনি একবার আসিলেন, তিনিই তার ভাব পাইলেন। দীনবন্ধো, গরীবদের যদি দয়া ক'রে আনিলে, তবে এই কর, যেন স্থিরহৃদয় হইতে পারি। এই যে গিরি, কারও নিন্দা সুখ্যাতি শুনেন না। ইঁহারা একেবারে যেন সিদ্ধ হইয়াছেন; তোমাতে যেন বিলীন, সংসারকে চান না। তুমিও তেমনি স্থান দিয়াছ। যোগগিরি, তুমি নাম-সাধন-যোগে মহেশ্বরকে ডাক। হে ভগবন্, এখানে আসিয়া যেন শূন্যমনে না যাই। এই কর, এই গিরির সরল ভাব, গম্ভীর ভাব, যোগ-ভাব যেন পাই। হরি হে, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই হিমালয়-বিদ্যালয়ে যোগ শিক্ষা করিতে পারি। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গরাজ্যের আগমনে বিশ্বাস

(হিমাচল, রবিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১লা জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনশরণ, স্বর্গরাজ্যের রাজা, নীচ প্রসঙ্গ, নীচ কথোপকথন এ সমুদয় তুমি দূর কর এবং ধর্ম্মের কথা আমাদের বলিতে দাও। হে ঈশ্বর, ভক্তের রসনা এক প্রকার, ভক্তের কাণ এক প্রকার ভাবেতে গঠিত, আমাদের কাণ আর এক প্রকারে গঠিত। এই পৃথিবীতে ভক্তেরা আসেন, তাঁরা কি বলেন, কি দেখেন, আমরা কি বলি, কি দেখি। তাঁহারা দেখেন, এই পৃথিবীতে সুপ্রভাত হইল, স্বর্গের পরীরা নামিতেছেন। তাঁহারা দেখেন, এক নূতন রাজ্য বাহির হইতেছে। যেমন গগনবিহারী দূরদর্শী পক্ষী দেখে, তেমনি তোমার ভক্ত এই সকল দেখেন। আমরা কি দেখি, হরিনাম উঠিয়া গেল, হিমালয় নামিয়া গেল, মুনি ঋষিরা নাই, সূর্য্য গেল, রাত্রি আসিল, অন্ধকার হইল। আর কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ? উঠিয়া গেল। পঁচিশ বৎসর ধ্যান করিয়া আমাদের এই বিশ্বাস ? আমরা দেখিতেছি, ঐ অধর্ম্ম আসিতেছে, ঐ সয়তান আসিতেছে। ঐ পাপ রিপু, ঐ আমাদের মৃত্যু। চক্ষু নিরাশ, কর্ণ নিরাশ ; ঐ যেন কে বলিতেছে, যা দেশে যা, যা পঞ্জাবে ফিরিয়া যা, অবিশ্বাসীদের জয় হইবে। কেন আর চক্ষু বুঁজিয়া ধ্যান করিস্ ? যা, চ'লে যা সংসারে। এ সময়ে যোগ ধ্যান করিতে পারিবি না। আর কেন ? দেখ্ না, বিলাতে আমেরিকাতে সব সংসারী। আগে এক একজন তবু ধার্ম্মিক ছিল, এখন সকল ধর্ম্ম শেষ হইল। তোমাদের কথা মিথ্যা হইল, ধর্ম্ম সমন্বয় করিবে বলিলে, হইল না, পৃথিবীতে সাধু নাই, যাও তোমরা। হে ঈশ্বর, এ সকল কথা আমরা বলি। বাধা দিলে ভক্তের ভক্তি বাড়ে,

কিন্তু অবিশ্বাসীর যেটুকু ধর্ম্ম ছিল, তাহাও চলিয়া যায়। বাধা পাইলে উৎসাহীর বল বাড়ে, কিন্তু গরীব লোকের ভয় হয়। হে হরি, আমাদের এ চক্ষু দুটো ফেলে দিয়ে ভক্তের চক্ষু দাও। ইঁহারা দেখিতেছেন, সত্য-ধর্ম্ম চলিয়া গেল, ভগবান্ শ্মশানে মরিয়া গিয়াছেন। ঈশা বলিতেন কি? ঐ দেখ, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া দেখ, জলন্ত জ্যোতিতে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। আমরাও তো, ঠাকুর, একদিন বলিয়াছি, তোমার সত্যরাজ্য আসিতেছে। এখন ইহারা নববিধানকে জড়সড় করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। হে মহাপ্রভো, আমি তাই হাতযোড় করিয়া তোমার কাছে বলিতেছি, যদি পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবে, তবে অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস চূর্ণ কর, ইহাদের অবিশ্বাসী চক্ষুকে উৎপাটন করিয়া বিশ্বাস-চক্ষু দাও। ভক্তেরা ভীরু, অবিশ্বাসী? না। আমরা একবার এই চক্ষু দুটোকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সেই ঈশা মুষার চক্ষু লই, আর দেখি, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ সব যোগী ঋষিরা আসিতেছেন। আমরা পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া বীরপ্রধান পরমেশ্বরকে দেখিব। এইখানে সেই ভক্ত হনুমান ছিলেন, যিনি পাহাড় তুলিয়াছিলেন। এখানে ভীরুরা আসিতে পারে না। আমরা এই পাহাড় তুলিয়া অবিশ্বাসীদের গায়ে ফেলি, এই পর্ব্বত আমাদের অস্ত্র হইবে। হে হরি, যা হইয়া গিয়াছে, তা হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদের বিশ্বাসী কর। হরি, আমরা নববিধানের বিবাহ দিব, পাত্র পাত্রীকে খুব সাজাইব। মহারাজ ব্রহ্মাণ্ডপতির সঙ্গে আমাদের নববিধানের বিবাহ হইবে। সকল ঋষি মুনি নিমন্ত্রিত হইবেন, সকলে আনন্দে গান করিবেন, আনন্দধ্বনি করিবেন। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা কেবল স্বর্গের কথা শুনিব, কেবল স্বর্গরাজ্য দেখিব, কেবল আশা করিব, পৃথিবীর পরিত্রাণের দিন আসিতেছে, যে দিন আর দুঃখ

থাকিবে না ; আমরা এই আশা করিয়া, চিরদিন তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

উপাসনাতে সুখ

(হিমাচল, সোমবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
২রা জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে সুখের হরি, হে পূর্ণানন্দ, এই জ্ঞান যেন আমার থাকে যে, তুমি কেবল সুখ এবং শান্তি। উপাসনার আরম্ভ, উপাসনার শেষ সকলেই যেন কেবল মধুবর্ষণ হয়। একজন লোক পাইয়াছি, যেখানে কেবল সুখ, ইহাই যেন আমার মনে থাকে। যখন প্রেমানন্দের সুখ বলিয়াছি, তখন আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। তোমার কাছে আসিলে কেবল সুখ হয়। কে তুমি? তোমার নাম কি? যে হও, সে হও তুমি, এইখানটায় বসিলে যেন প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ আর কিছুই থাকে না, কেমন একটা অপূর্ব্ব শান্তিরস কোথা হইতে আসে। কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয়, উনিও সুখী, আমিও সুখী। কৈ রোগ, শোক, বিপদ? অভিধানে কতকগুলো কথা আছে, হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রণা বেদনা বলিয়া, গভীর মৃত্যু-ক্লেশ, প্রাণ ছটফট করে ; কিন্তু এই জায়গায় বসিলে, কোথায় রোগ শোক যায়, আমাকে রেখে যায় সুখনদীর ধারে। যত অসুর, যত দানব, যত ব্রহ্মদৈত্য এই উপাসনার শাঁক বাজিলে সব দৌড় মারে। তখন আমি পাপী কি ধার্ম্মিক, তোমাকে বুঝি কি না, ভাবি কি না, এ সব কোথায় যায় ; তখন ভাবি, দুঃখ কোথায়? পাছে ভগবানের ছেলের দুঃখ হয়, পাছে কেহ বলে যে, মানসিক

যন্ত্রণার শেষ নাই, পাছে কেহ বলে, একতারা বাজাইলেও সব দুঃখ যায় না, তাই তুমি এই রকম করিলে। সুখ হইল, একটা শান্তির বিছানায় বসিল, ভক্তবৎসল যিনি, ভক্তকে লইয়া বসিলেন, আর সব দুঃখ গেল। আর দুঃখ নাই, তোমার শান্তিসমুদ্রে উঠিতেছি, নামিতেছি, কেবল শান্তিরস। দয়াময়, এই যে উপাসনাকে প্রশংসা করি, এই উপাসনাতে গতি করিয়া দিয়াছ, ইহাতে শান্তি বটে। এখন এই কর, দীনবন্ধো হে, জ্বালা যন্ত্রণা আর না থাকে, কোন রকম অশান্তি আর না থাকে, কেবল এমনি ক'রে তোমার কাছে বসি, আর সুখ হউক, আর না হউক। গরীবকে তুমি সুখী করিতে পার, একবার চাঁদমুখে হাসিলেই হইল। ভক্তকে পুলকিত করিতে পার এক মুহূর্ত্তে। হে গতিনাথ, সংসারে গতি দিতে পার অনায়াসে। তোমার কাছে এমন অমৃত রয়েছে, এমন সুখ রয়েছে, অনায়াসে তুমি তাহা দিতে পার। অনেক দুঃখিনী কন্যা তোমার আসিয়াছে। কেবল উপাসনাতেই সুখ। 'হরি ব'লে ডাক রসনা', 'কেবল হরিচরণ বুকে রাখ', এই বলিলে সব দুঃখ চ'লে যাবে, এই বলিতে বলিতে আমাদের সকল দুঃখ দূরে যাবে। হে মঙ্গল-দাতা, বিধাতা, কৃপা ক'রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সব দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া, দুঃখের আগুনে জল ঢালিয়া, কেবল শান্তিসুধা পান করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বেতন

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২০শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৩রা জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, বিধানের রাজা, আমরা তোমার দাস দাসী, তাহাতে ভুল নাই। দাস দাসীর একটি নিয়ম থাকে, মাস গেলে তাহারা বেতন পায়। কিন্তু আমাদের বেতন কৈ ? আমরা রাত্রিতে খাটি, দিনে খাটি, মাহিনা কৈ ? এরা কেবল ব্যাগার খাটে, এদের মাহিনা নাই। কিন্তু রাজন্ তোমার খাতা খুলিয়া দেখি, এদের প্রাপ্য কিছুই নাই। স্বর্গেতে, হে মহাপ্রভো, ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর নীতি থাকিবে, কিন্তু আরও নীচতর নীতি দেখিতে পাই। আমাদের খাটিয়ে মার, টাকা দাও না কেন ? হে হরি, বলিতে গেলে ধমক খাইতে হয়। এত পাপ করি, তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করি, তাইতে সব বেতন কেটে গেল। কোথায় বেতন পাইব, না, হরির কাছে ঋণী হইলাম। তোমার দোষ নয়, প্রভো হে, তুমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে মাহিনা দাও। এরা ছ'মাসের বেতনের আশা ক'রে ব'সে আছে। ঈশ্বর, মাহিনা না পাইলে হয় না, স্ত্রী পুত্রদের খাওয়াব কি ? আমরা কি মাহিনা চাই ? তোমার রাজ্য বাড়ুক, তোমার প্রজা বাড়ুক। আমরা খাটিতেছি তোমার পুণ্যরাজ্য, প্রেমের রাজ্য বাড়িবে বলিয়া, তবে আমরা মাহিনা পাইব। তবে ছাই মিথ্যা খাটিতেছি, আর তোমার রাজ্য কিছুই বাড়িতেছে না, ইহাতে কি হইবে, হরি ? যে কয়টা লোক ছিল, তাহারাও অরাজক দেখে চলিয়া যাইতেছে। হরি, তুমি আমাদের হাতে দড়ি বেঁধে বিচারাসনের কাছে লইয়া গেলে, বলিলে, হ্যাঁরে, তোরা এই কাজ করলি, আমার প্রজা সব উঠিয়ে দিলি। শেষে আমাদের মাহিনা পাওয়া দূরে থাকুক, কারাগারে

যাইতে হইল। এই কয় মাস হইতে মাহিনা বন্ধ হয়েছে, আর টাকা কড়ি নাই, আর মানুষধন বাড়ে না। এই সকল কি সহ্য করিবে, নাথ? শুদ্ধ ধর্ম্মরাজ তুমি চাকরের গাফিলি দেখে চুপ ক'রে থাকিবে? মেয়েরা খুব মেয়ে আনিতেছে না কেন? বালকেরা খুব বালক আনিতেছে না কেন? প্রচারকেরা কেন অসংখ্য লোক আনিতেছে না, হরি? গোলামের মাহিনাটি দাও, তা না হইলে আর চলিবে না, কাজকর্ম্ম বন্ধ হ'বে। এরা সব চুপ ক'রে ঘর বন্ধ ক'রে শুইয়া থাকিবে, আর ভগবানের রাজ্য আসিবে না, এই ব'লে নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। হরি, তুমি বুঝিতেছ না, ঐ টাকা ক'টি আনি আর খাই। তা' না হ'লে আর তোমার দাস দাসী না খেয়ে বাঁচিবে না। খুব ধূমধাম হইতেছে, এদেশ হইতে ওদেশ হইতে লোক আসিতেছে, এ না হইলে আর তোমার বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাঁচিবে না। হে কৃপাসিন্ধো, দয়া ক'রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার উপযুক্ত দাস দাসী হ'য়ে, তোমার রাজ্যকে বাড়াইয়া মাহিনা লইতে পারি, মাহিনা আরও বাড়াইয়া লইয়া তোমার কাজ করিয়া শুদ্ধ হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উন্মত্ততা

(হিমাচল, বুধবার, ২১শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৪ঠা জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াবান্ হে রূপবান্, তোমার ব্রাহ্মেরা সকলই পারে, কেবল মত্ত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মদের আর সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মত্ততা দেখা যায় না। তোমার রূপে গুণে একেবারে মাতিয়া

গেল, এ রকম হয় না। বন্ধু তা'কে বলি, আলাপ করিতে ইচ্ছা হয় যার সঙ্গে। এমন লোক কৈ? মাতে কৈ? প্রাণটার মায়া একেবারে কেহ ছাড়িতে পারে না। সাধুই বল, ঋষিই বল, প্রাণটা তোমাকে দিতে পারে না। হাত দিয়া ধরিয়াছে তোমার চরণ, কমলার চরণ, লুকিয়ে লুকিয়ে আর এক হাত দিয়া সংসার ধরিয়াছে। এক হাতে কমলার সুন্দর চরণ ধরেছে, আর এক হাতে সংসারের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কাল পা ধরেছে। চারি সহস্র বৎসর আগে, ভগবন্, যথার্থ তোমার লোক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সাধু হ'ব, প্রচারক হ'ব, এ সব ভাবিতেন না, কেবল মাতিব আর মাতাব, এই ভাবিতেন। হরি হে, সে ভাব আর এ ভাব! বৃন্দাবনের ভাবের সঙ্গে ইহা কত তফাৎ। বৃন্দাবনের সে এক বাঁশীতে লক্ষ লোককে ভুলিয়ে দেয়। বুঝি মার আর সে মোহিনী শক্তি নাই। দয়াময়ী মা, তোমাকে নাকাল করিল তোমার ভক্তেরা। যদি মাতিলাম না পাছে কাপড়খানা ভেজে এই ভয়ে, ইহাতে বোঝা যাইতেছে, এখনও সয়তান রিপুরা আমাকে ছাড়ে নাই। ব্রাহ্মদের কিছু হইল না, তোমার বাড়ীর কাছে গিয়াও যায় না। তোমার বাড়ীর কাছে গিয়া রথে উঠে উঠে, হইল না। দয়াময়ি, যদি এই যুগে তোমার ভক্তদের মাতাও, তবে আমরা সিংহের মত হইয়া উঠি। ইহারা মেতেও মাতে না, দেখিলে রাগ হয়। এসেছিস্ মাতাতে, আবার আড়ে আড়ে দেখেছিস্, পাছে স্ত্রী পুত্রদের ভগবানের ঘরে লইয়া যায়। মা, তোমার অনেক ছেলে বাহিরে আসিয়াছে, কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে পারিতেছে না। তোমার কাছে আসিল, নেশা ছুটে গেল, পালিয়ে গেল। দেখ না, কত লোক আসিল, আবার ভোর হইতে না হইতে চলিয়া যাইতেছে। ওরে ভাই, এত দূর এলি বা কেন? বৃন্দাবনে এসে, বলি, কুঞ্জবন না দেখে চ'লে যাইতেছিস্? এলি যদি, বাঁশী না শুনে যাইতেছিস্ কেন? দেখ্ না,

এই সব মাতাল প'ড়ে রয়েছে বাঁশী শুনে। সাধন করিলে কি মাতে? চল্লিশ বৎসর সাধনেও মত্ত হয় না। আমার হরি, অদৃষ্টে কি আমার এই দুঃখ আছে, ক্রমে ক্রমে দুটি একটি ক'রে সকলে চ'লে যা'বে? আমার বংশীধারীর বাঁশী শুনিতে পেলে না? দেশে গেলে লোকে বলিবে, ওরে, বৃন্দাবনে গিয়া বংশীধারীর বাঁশী শুনিতে পেলিনি? এই কথা শুনে আর কেহ আসিবে না। কলিকাতায়, মা, তোমার বড় নিন্দা। সকলে বলে, মার মাথায় আর এখন মুকুট নাই, আগে দেখিতাম বটে, কিন্তু এখন নাই। হরি, একবার দেখাও এখনকার সুরার কি জোর। আমার মার কি এমন রূপ যে, পাঁচ মিনিট তোমাকে দেখিয়া মাতিলাম না? এ কি গিল্টি করা সোণা? কেহ বলিবে, আমি সাত ঘণ্টা উপাসনা করিয়া মাতিলাম না। তবে সে উপাসনা আল্‌গা উপাসনা। মাকে দেখিতেছি, কত বার মার কাছে আসিতেছি, তবু নেশা হয় না। উপাসনা কি এমনি জিনিষ যে, সাত বৎসরেও নেশা হয় না? হে দেবি, ভক্ত ছোঁড়াগুলোকে যদি মত্ত করিবে, তবে তোমার মত্ততার রূপ দেখাও। যে উপাসনাতে মত্ততা নাই, সে গিল্টি করা উপাসনা, তাড়িয়ে দাও। হে মত্ততার দেবি, তুমি এস। এ সব ব্রহ্মের, ভগবানের কাজ নয়। একবার রণে দেবী নাম তো। এদের চিৎ ক'রে ফেলে গলার ভিতর সুধা ঢেলে দাও। ঠাকুর, আমার মনে একবার একবার আশা হয় যে, এই পাঁচ বৎসরের পরে আবার সব মিল হইবে। পাঁচ বৎসরের সুদ শুদ্ধ এবারে আদায় করিব। পরলোকে যাইবার আগে আবার মাতাই। হরি, যদি সুদিন দাও, কত আহ্লাদ হইবে। কেন না, তারা আর থাকিতে পারিল না, দলে দলে আসিতেছে। এবারে দেবী আসিতেছেন কি না, তাই তাহারা কেহ থাকিতে পারিল না। দেবি, আবার মাতাও, নবদ্বীপের ভক্তদের

মত মাতাও। মা, এবারে মত্ত হইয়া তোমার সকল লোককে কাঁপাই, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া, প্রেমে মত্ত হইয়া, সকলকে মাতাইব, আর মাতিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পরীক্ষামধ্যে আশ্বস্ততা

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৫ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে আমাদের আত্মার পরীক্ষক, আমাদের দুর্ব্বল মন পরীক্ষাকে ভয় করে, বিপদ আপদ দেখিলে ডরায়। কিন্তু, দয়াল, তোমার ভক্তেরা বলিতেন, পরীক্ষা বড় মিষ্ট, ফলেতে মিষ্ট, শেষে মিষ্ট। দয়াময়, এই জীবনকে, আমাদের এই দলকে, কত প্রকারে তুমি পরীক্ষায় ফেলিতেছ। বিচ্ছেদের কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, লোকের গঞ্জনা, ভয়ানক পীড়ন, এই সব আমাদের মনকে কষ্ট দিতেছে। এক একবার মনে হয়, মা কি ছেলেকে এত দুঃখ দিতে পারেন ? তা তো সত্যই, এ সব মঙ্গল। কত লোক বলে, মা কেন দুঃখ দেন, কেন পরীক্ষায় ফেলেন ? আমি বলি, এ কি দুঃখ ? মা কত শাসন করেন, মা তো আর ছেলেকে বইয়ে দিতে পারেন না। মার অনেক কাজ সন্তানসম্বন্ধে, তবে কেমন ক'রে মাকে দোষ দিব ? পাঁচজন যদি দোষ দেয়, তবে কি ক'রে চুপ ক'রে থাকিব ? মা আমায় শাসনও করেন, আবার আদরও করেন। মা, ছেলে ভাল করা তোমার কাজ। বিপদগুলো যে বন্ধু! কতবার দেখিলাম, ঠাকুর, ভারি ভারি বিপদগুলো, শেষে কত শান্তি। নববিধানের জন্মই এই আন্দোলনে। এখন সেই পাষণ্ডভায়ারা কোথায় রহিলেন ?

যাহাকে পাষণ্ডেরা বিপদ পরীক্ষা বলেন, সে সব মঙ্গল। এই পৃথিবীতে কত দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু সে দুঃখ একটিও অমঙ্গল করিতে পারে নাই। স্বর্গের একটি একটি বিপদে কত শান্তি দেয়, কত সুখ দেয়। মা, কেহ যেন তোমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া বদ্‌নাম না দেয়। তুমি কত মার্‌ছো ধ'র্‌ছো, আবার সন্তানকে লইয়া মুখচুম্বন কর্‌ছ। যে এই সব প্রেমের রহস্য বুঝিয়াছে, সেই যথার্থ সুখী। মা, খাওয়া পরা, সুখ সম্পদ তো দিয়াছ, কিন্তু ইহাতে যত সুখ না হয়, পরীক্ষা বিপদে আরও সুখ। লোকে বলে, এত বিপদ পরীক্ষা, গেল গেল এইবার নৌকা ডুবিল, আমি বলি, না, ডুবিবে না। দেখিতে দেখিতে সব মেঘ ঝড় কোথায় গেল, নদী আকাশ পর্ব্বত বলিল, হরি হরি বল। এখন দেখ, কেমন তোমার নববিধানের নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে। যাহারা বলিয়াছিল নৌকা ডুবিল, তাহারা এখন কেমন সুখে যাইতেছে। মা, আমাদের বিশ্বাস দাও, আমরা বলি, আমাদের দুঃখ কিছুতে হইবে না। মার প্রেরিত দুঃখ, ভক্তজনের অনিষ্ট হইবে না। মা যে আমাদের চেনেন, এ দল যে মার, আমরা যে মার খাই, কেন আমাদের দুর্গতি হ'বে। কিছুতে অমঙ্গল হ'বে না তো, যদি ঐ শ্রীপাদপদ্মে মাথা দিয়া পড়িয়া থাকি। আমি কিনা মা দুঃখ দেন বলিব? আমার মা মঙ্গলময়ী, তিনি কখন অমঙ্গল করেন না, তিনি তো অমঙ্গল করিতে পারেন না, এই কেবল বলিব। মা মঙ্গলময়ি, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কাছে বিশ্বাসী হইয়া থাকিব, মা যাহা দিতেছেন, সকলই মঙ্গলের জন্য, এই বলিয়া শুদ্ধ হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাত্ত্বিকতা

(হিমাচল, শুক্রবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৬ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে গুরুদেব, এখনও তুমি অনেক দূরে, ইচ্ছা হয়, তোমাকে আরও নিকটে আনি। পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা আরও অগ্রসর হইবার কথা ছিল। পুরাতন বিধান অতিক্রম করিয়া নববিধান আরও অগ্রে যাইবে, তাহা তো আমরা পারিলাম না। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া সব তাতে হরি, তাঁদের গায়ে হরিনাম। তাঁদের সকল বস্তুতে তুমি ছিলে। আমরা উপাসনাটি যে করি, এইটি, ঠাকুর, ধন্য। তার পর সমস্ত দিনের কর্ম্ম তো আর দেখা যায় না। তাঁহারা বিছানা হইতে উঠিয়াই আবার কম্মেতে যাইতেন। তাঁরা জলেতে আকাশে সব জায়গায় তোমাকে দেখিতেন। আমরা এত উচ্চ বংশের সন্তান হইয়া কেন এ রকম? ঠাকুর, দয়া করিয়া তাঁদের মত আমাদের কর। হরিনাম ভিন্ন কোন খাবার খাইব না। অন্ততঃ যেগুলি প্রতিদিনের কাজ, তাহাতে হরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। কতকগুলো হয় তো সয়তানের, কতকগুলো হয় তো আমার, তাহার ভিতর তোমারও একটা একটা কোথায় ঢুকে থাকে। তাঁদের ওঠা বসা সব ধর্ম্মেতে। ঠাকুর, আমাদের আরও উচ্চ হইতে দাও। তাঁদের ছুঁলে হৃদয় উচ্চ হয়। কার জিনিষ খাইতেছি, কার জিনিষ লইতেছি, তার ঠিক নাই। এই একবার উপাসনার সময় তোমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যা'ব আজকের মত। কিন্তু তাঁহারা, মেঘ ডাকিতেছে, তাইতে ব্রহ্মধ্বনি শুনিতেন। হরি, আমাদেরও এই উচ্চ স্বভাব দাও। আমরা শুইতেছি যে বিছানায়, জঘন্য ইন্দ্রিয় তাহাতে। এই তো গেল শরীর। মা, কার জিনিষ

ছুঁইতেছি? মড়ার জিনিষ? শেষে নাস্তিকের যা' তা' ছুঁইতেছি? ব্রহ্মতনয়ের মত আমরা সাত্ত্বিক হইব। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক সব। কাগজে দোয়াতে সব হরি, যা' ছুঁইতেছি, অমনি ব্রহ্ম চড়াৎ করিয়া উঠিতেছেন, এই হইলে তবে আমরা সাত্ত্বিক হইব। সব জিনিষে হরিকে দেখি। জিনিষ আমার নয়, সয়তানের নয়, সব নববিধানের হরির জিনিষ। এই সকল জিনিষ লইয়া আমরা সাত্ত্বিক হইব। আমাদের এই জিনিষ যেন সর্ব্বদা শুদ্ধতাতে রাখিয়া দেয়, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের সব অসাত্ত্বিক ভাব দূর করিয়া দিয়া, নববিধানের সাত্ত্বিক ভাব ধরিয়া দিন দিন শুদ্ধ হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বিধি-স্বীকার

(হিমাচল, শনিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ,
৭ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে ধর্ম্মরাজ, গৃহস্থের বিধি তুমি যদি প্রচার করিতেছ, তবে গৃহস্থকে বল দাও, যেন সে সেই বিধি পালন করিতে পারে। আমরা, হে ঈশ্বর, কেন অশুদ্ধ থাকিব, কেন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইব, যদি গরীব বলিয়া, যে যেখানে আছে, সকলকে তুমি বিধি দাও। জননি, এই বিধিতে কেবল আমরা ভাল হইব, তাহা নয়, তোমার পুত্র কন্যা যে যেখানে থাকিবে, লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া লইব। সেবকের ধন, সেবকদের তোমার বিধি দাও, আর পাপাচার না হয়, স্বেচ্ছাচার না হয়। এইটি তুমি চাও, প্রত্যেক গৃহস্থ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঠিক নিয়মগুলি পালন করেন। তোমার মনে বড় সাধ ছিল যে, আমার গৃহস্থগুলিকে

আমি চিনিয়া লইব। সেই দিন তো আসিয়াছে, ঠাকুর। এইবার অনায়াসে বাঁধিতে পার, এইবার তো অনায়াসে পৃথিবীকে দেখাইতে পার তোমার লোকদিগকে। এইবার আমরা তোমার বিধিতে তোমার ঘর সাজাই। সাধকের ধন, হে ঈশ্বর, যদি এ নিয়ম সত্ত্বেও সাধকেরা যা' ইচ্ছা তা'ই করে, তা' হ'লে বুঝিব, দয়াসিন্ধু আমাদের রাজা নন। কাগজে পর্য্যন্ত যখন লেখা হইল, তখন তো আর ওজর করিতে পারে না যে, কি করিব? যেখানে নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত লেখা হইল, এখন দেখুন সকলে, তোমার কি বিধি। একবার পৃথিবীকে দেখাইয়া দিন, তা' হ'লে বল্‌বে, এরাই স্বর্গের লোক। আহা এমন ঘরের নিয়ম, এমন খাওয়া দাওয়ার বিধি, এমন আর কোথায় দেখিব? এরা মা দেবীকে যথার্থ দেখিয়াছে। আর তুমি মনে মনে হাসিতেছ, আর বলিতেছ, আরও পরিবার হউক। এইবার, মা, এদের টেনে লও। সদাচার-ব্রহ্মচারী যাহারা, তাঁহারা এই নিয়ম লউন। আর যদি, দেবি, তোমার নিয়ম লেখাই রহিল, কেহ মানিল না, তা' হ'লে লোকে বলিবে, মা নিয়ম করিলেন, কিন্তু কেহ লইল না। মা, তাই বলিতেছি, সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তোমার এই বিধি লউন। মা, একবার তুমি মহারাণী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া, আদেশ প্রচার কর। মা, আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সমুদয় স্বেচ্ছাচার অবিশ্বাস দূর করিয়া, তুমি যাহা বলিবে, যাহা লিখে দিবে, সব গ্রহণ করিয়া, সদাচারের পথে থাকিয়া, দিন দিন শুদ্ধ ও পবিত্র হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পরলোকগৃহ

(হিমাচল, রবিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
৮ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, হে বৈকুণ্ঠপতি, বিশ্বাস করিব, বিশ্বাস বিনা পরিত্রাণ হয় না। বিশ্বাস করিব, তোমার স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। দুঃখী সেই লোক, যে পৃথিবীর সকলই দেখিতেছে, তোমার স্বর্গরাজ্য দেখে নাই! তুমি যে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতেছ আমাদের জন্য, তাহা দেখে নাই; ভগবন্, সেই বাড়ীতে কে কি করিবেন, তাহাও ঠিক আছে। হে হরি, তুমি যখন এত ঠিক করেছ, তখন অবিশ্বাসী বিশ্বাস করিবে না? এত বড় কারখানা করিতেছ, হরি, ভারতের এক দিক হইতে আর দিক পর্য্যন্ত কত লোক খাটিতেছে। আমার ঘর ঐ, ঐ ভ্রাতার ঘর, ঐ বন্ধুদের ঘর, ঐ আমাদের জন্য তুমি ধ্রুবলোক প্রস্তুত করেছ। কাণা দেখিতে পায় না, বলে, কৈ? অপ্রেমিক চান, আমার ঘর ঐ, ও যাইতে পাইবে না। অবিশ্বাসী জানে না, একটি স্নানের ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি ফুলের বাগান, তুমি প্রতিজনের জন্য করেছ। এ দেশের লোকের, ও দেশের লোকের জন্য, সকলের জন্য তুমি একটি একটি ছোট ঘর, বড় ঘর প্রস্তুত করেছ। দ্বিজপতি, তুমি নববিধানের লোকের জন্য সব একটি একটি প্রস্তুত করেছ। আমরা যে দিন যাইব, কত আনন্দ হইবে। একটি দুঃখের কথা শুন, হরি, আমাদের ভিতর এত অপ্রেম কেন? ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। কেহ ছোট সুরে, কেহ বড় সুরে, নারীরা ছোট সুরে। হে শ্রীহরি, একজন গেলে তো হবে না; প্রত্যেকে একটি একটি যন্ত্র বাজাইব। অত্যন্ত মনোহর সুমিষ্ট বাদ্যগানে ঘর পূর্ণ হইবে। জননি, কাহারও

আছে ভাল সুর, কাহারও সুর ভাল নয়, এইটি, হরি, এঁরা বোঝেন না। সকলে না গেলে হয় তো মোটা সুর থাকিবে না, হয় তো সরু সুর থাকিবে না, নয় তো যোগ থাকিবে না, নয় তো ভক্তি থাকিবে না। হে হরি, তুমি আমাদের জন্য কত প্রস্তুত করিলে, এখনও এরা কলহ করে। বাজাইব, আমোদ করিব; কেন কলহ করিব, ঠাকুর। অতি দীনহীন গরীব, তার ঘরও সাজান হয়েছে, তার ঘরেও নববিধান আছেন। কি পরিপাটী, হরি, তুমি তার জন্য একটি একতারা রেখেছ, একখানি গেরুয়া রেখেছ, তারও জন্য একটি ছোট যোগের ঘর আছে। তারও জন্য সোণার কলসীতে অমৃত রেখেছ। এতগুলি লোকের জন্য এত ঘর ক'রে রেখেছ। পঞ্জাবের লোকদের জন্য সেই রকম ঘর, মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য সেই রকম ঘর, ব্রহ্মপুত্রের লোকদের জন্য তাহাদের মত ঘর প্রস্তুত করেছ। যাহার যেমন প্রয়োজন, তেমনি রেখেছ। হরি, ঐ আমার বাড়ী, ঐ নববিধান। সকলে ঝগড়া কলহ দূর করিয়া, আনন্দের সহিত ঐ বাড়ীতে যাই। হে দয়াময়ি, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে ঐ ঘরের উপযুক্ত হইয়া, সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, ঐ বাড়ীতে যাই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া, সকলে আনন্দিত হইয়া, ঐ শান্তিনিকেতনে যেন স্থান পাই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সুখের দিন

(হিমাচল, বুধবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক ;
১১ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, ভক্তসহায়, আমার মনেই বা এত আশা, এত আনন্দ হইতেছে কেন, আর অন্যদের মনেই বা এত অন্ধকার, এত নিরাশা হইতেছে কেন? ভগবন্, আমি বলিতেছি, সকাল হইতেছে, তারা বলিতেছে, রাত্রি হইতেছে। আমি বলিতেছি, ঠাকুর, স্বর্গরাজ্য দেখা দিতেছে, তারা বলিতেছে, স্বর্গরাজ্য দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি বলিতেছি, এই ত আমোদ করিবার সময়, তারা বলিতেছে, এই ত কাঁদিবার সময়। পিতঃ, এ মতভেদ কেন? আমার কথা মিথ্যা, না, তাহাদের কথা অমূলক? বিশ্বেশ্বর, বিশেষ করিয়া এ বিষয় শিক্ষা দাও। স্বর্গে যাবার সময় যদি সকলে বলে, গেলাম মরিলাম, শুনে প্রাণ যে চমকিয়া উঠে। এ কি? স্বর্গের দ্বার খুলিল, কোথায় আমরা সেখানে গিয়া সুখী হইব, না, কান্না? স্বর্গের প্রসব হইল, না, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া! উৎসবক্ষেত্র, না, শ্মশান! মা, জননি, আমি তোমার কাছে যাহা শুনি, তাই বলি, তোমার উৎসাহে উৎসাহী। আমার প্রাণের হরি, আমার বয়স বাড়িতেছে, আমার বিশ্বাস বাড়িতেছে। আগে আমি, মা, তোমাকে কেবল উপাসনায় দেখিতাম, এখন আহারে স্নানে, এখানে ওখানে, তোমার সঙ্গেও আলাপ হয়। আমি বলিতেছি, ছেলে মেয়ে সব সুখী হও, বর আসিতেছে, ঢাক বাজাও। ওরা কাঁদে কেন? দেবি, বিয়ের ঘরে কাঁদে কেন? রোদন কেন, হাহাকার কেন? উঠ, গান গাও, সতীর বর আসিতেছে আনন্দবর্দ্ধনের জন্য। হরি, আমার দ্বারা কি হ'তে পারে? তুমি এস, কান্না থামাও। মা, আনন্দের দিন এল, সুখ এল, অন্যেরা

কেন বলে না? কাঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুদের বনিবনাও হ'ল না কেন? হরি, কি দোষে দোষী হ'লাম তব চরণে? সুখের দিনে কোথায় হাসিব, নাচিব, না, এ কি হ'ল? যাও, নিরাশা যাও। আমার স্বর্গ আসিতেছে, আমার সোণার ভগবান্ সোণার রথে চড়িয়া আসিতেছেন আমি কেবল এই বিশ্বাস করিব। হরি হে, দয়া কর, এই সুখের সময় সকলকে সুখী কর। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, নর, নারী সকলে এই সুখের কাপড় পরিয়া আমোদ করুক। মা, বলিয়া দাও, এই সুখের দিনে যে আমোদ না করিবে, তাহাকে আমি নিরপরাধী মনে করিব না। সকলকে প্রেমসুরা পান করাইয়া দাও, সকলকে বিশ্বাসী করিয়া দাও, লালেলাল করিয়া দাও। মা, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সুখের দিনে সকলে মিলে উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি। [সু —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নূতনত্ব

(হিমাচল, রবিবার, ৩২শে আষাঢ়, ১৮০৫ শক,
১৫ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে হৃদয়ের নূতন রত্ন, বর্ত্তমান সময়ে তুমি যাহা দেখাইতেছ, ইহা নূতন। চক্ষের পক্ষে নূতন, হৃদয়ের পক্ষে নূতন, আমাদের প্রতিজনের পক্ষে নূতন, ভারতের পক্ষে নূতন, পিতঃ, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে নূতন। কি নূতন? বল, ভগবন্ কি নূতন? সকলেই বলে, ধর্ম্ম নূতন। কিন্তু, কি নূতন? কথা বলিতে গেলে মনের দরিদ্রতা প্রকাশ পায়, ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। যদি তোমার নববিধান প্রকাশ করিলে, বল,

এ বর্ত্তমান বিধিতে কি নূতন? মন কিছু জানে না, কি নূতন, হরি? সমুদয় নূতন। কিন্তু, কি নূতন? হরি নূতন, পূজা নূতন, নাম নূতন, সাধন নূতন, জল নূতন, বায়ু নূতন, পাহাড় নূতন, সমস্ত নূতন, আর পৃথিবী নূতন, স্বর্গ নূতন। এই পর্য্যন্ত? আর কি? ঈশা নূতন, মুষা নূতন, শাক্য নূতন, গৌরাঙ্গ নূতন। বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণ সমুদায় নূতন। আর কি, হরি? পিতা মাতা নূতন, ভাই ভগিনী নূতন, পুত্র কন্যা নূতন, স্বামী স্ত্রী নূতন, ভৃত্যেরা নূতন, প্রভুরা নূতন। হে পরমেশ্বর, বাহিরে সমস্ত নূতন, ভিতরে সমস্ত নূতন। এই যাবতীয় নূতন একত্র করিলে কি হয়? নূতন বিধান। যার পিতা, মাতা, ভার্য্যা পুরাতন, তারা কখন নববিধানবাদী নহে। কিন্তু সমুদয় যার নূতন, সেই, হে ঈশ্বর, তোমার নূতন বিধিতে দীক্ষিত। হে প্রেমময়, যখন তুমি সেই ঈশাকে জর্ডন নদীতে স্নান করাইয়া দেবনন্দন হইতে আদেশ করিলে, তখন কত আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। যখন তিনি স্নান করিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, আকাশ খুলিল, স্বর্গ দেখা দিল। তখন তুমি বলিলে, "হে পুত্র, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম।" যদি এই গঙ্গা যমুনার জল আমার কাছে পুরাতন হইল, তবে কেন আমি জন্মিয়া মরিলাম না? আমি সেই পুরাণ বাড়ীতেই থাকি, আমি যে গেলাসে জল খাই, তাতে হরি লেখা নাই, আমি যে থালে ভাত খাই, তাতে হরির নাম নাই, আমি যে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, সকলই পুরাতন। তবে, হে নববিধান, বিদায় দাও। প্রবঞ্চককে তুমি রেখো না। তুমি এ সকল লোক লইয়া কিছু করিতে পারিবে না; তুমি চাও সকল সরস তেজাল। আমরা সব নববিধান মানি; কিন্তু কৈ, ঈশার মতন আকাশ দেখি নাই। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে বলিতে পারে, এ থালা ছিল পৃথিবীর, আমি এই থালা হরির নামে করিলাম। কে বলিতে পারে, আগে পূর্ব্বপুরুষেরা

অন্ন খাইতেন, আজ আমি ব্রহ্ম-অন্ন খাইব। এ নববিধানে প্রবঞ্চকেরা থাকিতে পারে না; এ নবীনের ঘর, প্রাচীনের ঘর নয়। নবীন হ'য়ে নবীন হরির সেবা করিতে হয়। এখানে সকলে এস। গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত নবীন। পুরাতন নৃত্য এখানে হ'বে না। যে টাকাতে হাত দেয় প্রাচীনের মত, সে হরির ঘরে, কুবেরের ভাণ্ডারে ডাকাতি করে। এখানে সব নবীন। হরি, আমাদের এই নবীন ধর্ম্ম শিখাইবে কি? সমস্ত পৃথিবী নবীন। সে সূর্য্য চন্দ্র আর নাই; নবীন সব। যোগ নবীন সাধন নবীন, নূতনতা উত্থানে। নবীন হরির সেবা করিব, থাকৃব না আর পুরাতন সংসারে। হরি, রক্ষা কর, পুরাতন দুর্গন্ধ সংসার হইতে রক্ষা কর। সুগন্ধ নূতন সংসারে লইয়া চল। নূতন সাহস দাও, বল দাও। নদী হইতে উঠিয়া যেন দেখিতে পাই, সে আকাশ আর নাই; নূতন আকাশে হরিচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। যদি তা' না হয়, তবে সব পুরাতন, স্বর্গও পুরাতন। হে নবীন প্রেমের আকর, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পুরাতন, নীরস সংসার, দুর্গন্ধ নিরুৎসাহ দূর করিয়া দিয়া, নবীন হরির নবীন ঘরে নবীন প্রেমে মত্ত হইয়া সুখী হইতে পারি। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পূর্ণ সাধন

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮০৫ শক,
১৯শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কাতরশরণ, হে ভক্তের হরি, এক জন তোমার ভক্ত হয়, ইহা সহজ, সপরিবারে তোমার ভক্ত হয়, ইহা কঠিন, সদলে তোমার ভক্ত হয়,

ইহা আরও কঠিন। পিতঃ, একজন কোন রকমে তোমাকে জানিয়া শুনিয়া তোমার প্রেমে মজিল। তাহাতে কি হ'ল ? ঘর সংসারে জঞ্জাল করিয়া রাখিল। স্বার্থপর হইয়া তোমার ঘরে বসিয়া হরিনাম সাধন করিতে লাগিল। সে কিরূপে শ্রদ্ধেয় হইবে ? অল্পবিশ্বাসীকে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে দাও না। চাও তুমি, সুপ্রসন্ন ভগবন্, পরিবার সব তোমার হয়, সব কাজে তোমার নাম হয়, সব বস্তুতে তোমার অধিষ্ঠান হয়, আর সমস্ত দিন, সমস্ত বৎসর তোমার সাধন হয়। সেইটি হ'লে তোমার সাধ পূর্ণ হয়। যদি ভা'ল করিয়া না খাইলাম, স্নান না করিলাম হরিনামে, তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট হও ? হও না ত ? খাইব, নাইব, শুইব, সব হরিতে, তা' হ'লে তোমার মনটি প্রসন্ন থাকে। দয়াল, যদি তোমার কাছে একটিকে আনি, দুইটি ছেলে রাখিয়া দুইটিকে আনি, মেয়েটীকে রাখিয়া স্ত্রীটীকে আনি, তোমার বিরক্ত মুখ বলে, "লইব না।" যদি পরিবারটি আনি, তুমি বল, "দলটি কৈ ?" প্রাণান্ত হইল এই ভজন সাধনে ! জগদীশ, পূর্ণ সাধন হইবে কবে ? উপাসনার ঘরে কেবল হরিনাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, আর সব দেয়াল খালি রহিয়াছে। তোমার মন কিছুতেই উঠে না। সব ঘরে বিশ্বাসের পিটুলি দিয়া লক্ষ্মীচরণ আঁকিয়াছি, কেবল দুইটা ঘর খালি রহিয়াছে, বলিলে, আমি ও বাড়ী যাব না, ও যে লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী। প্রেমিকের ধন, তোমাকে ষোল আনা প্রেম না দিলে, কিছুতেই তোমার মন প্রসন্ন হইবে না। আমার ভগবান্ তষ্টিদার, পূর্ণ করিয়া না দিলে ছাড়্‌বেন না। সাড়ে পনের আনা দিলেই দুই পয়সার জন্য তুমি ধস্তাধস্তি কর। সমস্ত যে তোমাকে দিতে হইবে। বিশেষ আমার সব জিনিষ তোমাকে আগে দিতে হইবে। আমাকে যে তুমি ঢের দিয়েছ, আমি যদি কম দিই, অন্যে যে আরও কম দিবে ! পিতঃ, এ বাড়ীতে যেন আর ঝগড়া না আসে। যে দিন

প্রলোভন স্বার্থপরতা আসিবে, সে দিন শয়তান রাজা হইবে. আর ভগবান্ পাশ দরজা দিয়া চলিয়া যাইবেন। ভগবন্, যদি তোমার ধর্ম্ম লইয়াছি, তবে পূর্ণ সাধন করিব। যে বাড়ীতে লোভ আর রাগ সর্ব্বদা থাকে, সেখানে তোমাকে কখন পাইব না। হে দেব, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই পরিবার, এই টাকা কড়ি, সব তোমার চরণে দিয়া, সকল জিনিষে তোমার নাম অঙ্কিত করিয়া সুখী হই। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বন্ধন

(হিমাচল, রবিবার, ৭ই শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
২২শে জুলাই. ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রসন্ন ভগবন্, হে মুক্তিদাতা, অবিদ্যা আমাদিগকে মুক্তি দিল না, স্বেচ্ছাচারী করিল। আমরা স্বেচ্ছাচার চাই না, মুক্তি চাই। কিন্তু যখন ভাবি, মুক্তি কি, তখন দেখি, এক রকম বন্ধন। ইহা ত মুক্তি নহে, ইহা যে বন্ধন। যত ব্রাহ্ম আছে, ইচ্ছা হইতেছে, মহাপ্রভো, তোমার আজ্ঞায় ইহাদের বাঁধি। ইহাদের যৌবনে বাঁধি, ধর্ম্মে বাঁধি, সংসারে বাঁধি, কর্ম্মে বাঁধি। ইহাদের অষ্টবন্ধনে বন্ধন করি, তবেই সাধ মিটে ; নতুবা, পরমেশ্বর, দলপতি হইবার কোন সুখ নাই। এই সব, হে ভগবন্, ভারতবর্ষের চারি দিকে বেড়ায়। ইহারা ধর্ম্মকর্ম্ম মানিবে না, পলায়ন করিতে চায়, দুঃখ হয়, পরমেশ্বর, ইহাদের কি হ'বে। ইহাদের ডানা দিলে স্বর্গে যাইবে না, ইহারা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে বেড়াইতেছে। এই ত মানুষের গৌরব যে, প্রেমময়ের প্রেমে বন্দী হইয়া থাকিতে পারে। ব্যভিচারী কি আমাদের আদর্শ হইল ? সতী বলেন, বদ্ধ থাকিয়া তিনি

বড় সুখী। সতী ত প্রেমে বদ্ধ, তাই তাঁর এত সুখ। যে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার সুখ নাই, কত লোক অন্যের বন্ধনে বাঁধা আছে। হরি হে, কোথায় আসিলাম, অসতীর দেশে? পিতঃ, ইহারা এখন মরে নাই, ইহাদের বুকে পাথর চাপা, মাথায় শাসন চাপা। আমরা তোমার কয়েদিখানায় থাকি। তুমি যা বলাবে, তাই বলিব, যা করাবে, তাই করিব। আর কিছু চাহি না, ভক্তবৎসল, আর কিছু চাহি না, মুক্তিও, চাহি না, কেবল তোমার প্রেমে বদ্ধ থাকিব। প্রেমময়, তোমার প্রেমে এমনি মত্ত হইব যে আর বাড়ী ছাড়িতে পারিব না। যাহারা হরিপ্রেমে মত্ত, তাহারা আর কোথাও যায় না। আমাদের এমনি হ'বে যে দিন, চারিদিকে হরি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না। সকালে উঠিয়া দেখিব প্রেমের কারাগার। হে ঈশ্বর, কয়টা ব্রাহ্ম তোমার বন্ধন লইয়াছে? কেবল বলে, এটা করিব, ওটা করিব। যে তোমার দাস, সে কোথাও যায় না। আমরা যদি বলি, বন্ধো, এই সুখের বাগানে এক বার এস, তিনি বলেন—আমার হরি কি কোথাও যেতে দিবেন, এই দেখ না, এক শত দড়ি দিয়া বাঁধা। আমরা বলিলাম, এই বই খানা পড়, তিনি বলেন—ভগবান্ ভাগবত ছাড়া আর কিছু আমাকে পড়িতে বারণ করিয়াছেন, যদি পড়ি, তিনি প্রাণে ব্যথা পাবেন। আমরা বলিলাম, ভক্ত, একটু সংসারের সুখ পাইবে এস, তিনি বলেন— আমার হরিপ্রেমসুধাপান ছাড়া আর সুখ নাই। ভগবন্, এই তোমার মানুষ। হরি হে, দয়া কর, দয়া কর, ভয়ানক স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা কর, সংসারের সহস্র বন্ধন ছেড়ে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধ। হরিপ্রেমরস পান করাও, হরি-সঙ্গে বন্ধন কর। এই বার উৎসব আসিতেছে, তাহার আগে এই কর, যেন আমাদের নিজ নিজ ইচ্ছা ছাড়িয়া তোমার কাছে থাকি। যখন ফুলের মধু মধুকরকে মত্ত করে, সে আর কোথাও যাইতে

পারে না। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। দয়াময়, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সতীর মত তোমার প্রেম বদ্ধ হইয়া, তোমার পাদপদ্মে চিরবন্দী হইয়া পড়িয়া থাকি। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মত্ততা

(হিমাচল, শনিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
৪ঠা আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে চিদানন্দ, হে সুশ্রী ভগবন্, তোমার প্রেমমুখ কি যথার্থই কোন ভক্ত দর্শন করিয়াছেন ? এই পাহাড়ে আসিয়া কি কোন যোগী প্রেম ভক্তিতে নয়নকে অনুরঞ্জিত করিয়া তোমার মুখ দেখিয়াছেন ? পুণ্যের আগুন পাপচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় তোমার কাছে যাইতে ভয় পায়। এক মুষা কেবল তোমার কাছে গিয়াছিলেন, আর সহস্র সঙ্গী পর্ব্বতের নীচে বসিয়া রহিলেন, তোমার দেখা পাইলেন না। হে ঈশ্বর, ইহা সত্য, তোমার মুখ কোটি সূর্য্যের মত, আমার মলিন চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। পৃথিবী ইহার মানে জানে না, কিন্তু যেন এই কথাটা পৃথিবী জানে, মার কাছে যাওয়া যায়। ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না, কিন্তু প্রেমময়ী মার কাছে যাওয়া যায়। পিতার দরজা খোলা। প্রখর সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না, কিন্তু চাঁদের দিকে তাকাইলে, আর অন্য দিকে চক্ষু ফিরান যায় না। সূর্য্য বলে, চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, চাঁদ বলে, আয় আয়। হে ঠাকুর, তোমার কাছে আমার বক্তব্য এই যে, অসহ্য প্রেম কিন্তু আর সহ্য হয় না। প্রেম কাঁদিয়ে মারিয়ে ফেলে। চাঁদ যদি পাগল করে, তাহা হইলে

তোমার প্রেমও পাগল করে। পাপী, মার কাছে যাও। আমিও, ব্রাহ্মদের যে মা, তাঁর কাছে বস্‌তে পারি; কিন্তু ঐ যে আসল মা হিমালয়ের উপরে বসিয়া আছেন, যাহার রূপে সমস্ত পৃথিবী স্বর্ণময় হয়, তাঁহাকে আমি ভাব্‌তে পারি না। যে দিন তাঁহাকে ভাবিব, সেই দিনই যথার্থ স্বর্গ লাভ করিব। সকলে অম্‌নি একটি একটি শান্ত মার ছবি লইয়া যাইতেছে, কিন্তু মার কান্না রোদন তো শুনিতে পাইতেছে না। পৃথিবীর মা যদি সন্তানের জন্য কাঁদে, পাড়ার লোক সে কান্নায় কাতর হয়। মার প্রাণের গভীর স্নেহ যদি ক্রন্দনে বাহির হয়, তখন কাহার সাধ্য, সে কান্নার কাছে দাঁড়ায়? এই ত পৃথিবীর মার কান্না। আর জগন্মাতা, যখন তুমি আমার হস্ত ধরিয়া, দাড়ি ধরিয়া বল—আমি তোকে এত দিলাম, তোর জন্য এত করিলাম, তবু তুই আমার কাছে এলি নি? এই বলিয়া যখন তুমি কাঁদ, আমি আর থাক্‌তে পারি না। হে প্রেমময়ি, হে আনন্দময়ি, তোমার কান্না পৃথিবী শোনেনি; যে দিন তোমার কান্না শুন্‌বে, সব তোমার প্রেমে পাগল হইয়া যাইবে। যখন পাগল হইয়া ঈশা, মুষা, শাক্য সব কাঁদবে, আর তাহার সঙ্গে, মা, তোমার হৃদয়ভেদী বিলাপধ্বনি শুনিব, তখন, হে প্রাণেশ্বরি, কে আর স্থির হইয়া থাক্‌বে? আমাদের জন্য তোমার এত কেন? জননী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার দুঃখ হইল? আমাদের জন্য এত দুঃখ? পামরগুলো বলে যে, মার কাছে উপাসনা করা খুব সুখ। হে পরমেশ্বরি, পামরগুলকে একবার এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কান্না শুনিয়া পাগল হয়। যে আমার মাকে দেখিয়াছে, আর পাগল হয় নি, সে ত, প্রেমময়ি, তোমাকে দেখে নি। আমি এক বার ঐ ঘোম্‌টা তুলিয়া দেখ্‌তে গিয়া, আমার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতেই তোমাকে দেখা ভাল। হে করুণাময়, প্রেমের বন্যা যখন আসিল, তখন আর আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, আর আবখানা

মাকে লইয়া থাকিতে পারিব না। প্রেমময়ি, আর তোকে অবহেলা কর্ব্ব না। তোকে আর এমন করিয়া রাখিব না। মা পাগলিনি, পাগল করিয়া দে না। মা, আমি তোর হ'ব—নিশ্চয়ই হ'ব। এই বল যে, আর কাঁদ্‌বে না। মা প্রেমময়ি, তোমার সোণার রূপখানি খুব দেখিব, তোমার রোদন খুব শুনিব, শুনিয়া তোমার প্রেমে পাগল হইয়া, তোমার চরণে মরিয়া যাইব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [সু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধানের নূতন

(হিমাচল, রবিবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
৫ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমাত্মা, হে অন্তরাত্মা, মুখে আমরা বিধান মানি, হৃদয়ে কি মানি? নববিধান অবশ্যই নূতন। যে পুরাতন বস্তুকে নূতন বলিয়া মানে, সে তোমার নববিধান মানে না। নিশ্চয় কোন নূতন বস্তু হরি পাঠাইয়াছেন। যদি আগে যাহা ছিল, তাহাই আসিল, তবে আমরা কেন আসিলাম, নিশান কেন উড়িল, পাপীর কেন আশা হইল? তাহা বুঝি গুপ্ত রহিল। আমরা যে পূজা করি, পরকাল মানি, নীতিতে শুদ্ধ, যোগী ভক্ত হ'ব, দলমধ্যে ভ্রাতৃভাব হ'বে, এ সব পুরাতন। সকল ধর্ম্ম হইতে সার লইয়া উদারতার পরিচয় দিব, সকল ইতিহাসে আছে। সকলই যদি পুরাতন হইল, তবে, হৃদয়েশ্বর, আমরা তোমাকে বিদায় দিয়াছি। নববিধানকে মানি, অথচ মানি না। অবশ্যই নূতন আছে তোমার শাস্ত্রে, নতুবা এত আন্দোলন হইত না। সেই নূতন ভ্রাতাদিগকে দেখাও দেখি। যাহা হইতেছে, পুরাতন শাস্ত্রের অনুগত। সকলই তো পুরাতন। আমার

মন কাঁদিতেছে, আকাশ হইতে নূতন বাণী আসিবে, আসিল না। নূতন প্রার্থনা নাই, নূতন পরিত্রাণের পথ নাই। ঈশ্বর, কাছে বস, উত্তর দাও, কি নূতন? এ নিশান কত লোকে উড়াইয়াছে। গম্ভীর ধ্যানে দশ ঘণ্টা নিমগ্ন কত সাধু হয়েছেন। আমরা পাহাড়ের কাছে পিপীলিকা এ বিষয়ে। হে হরি, নূতন কিছু দেখাইলাম না। তুমি এখানে আছ, তাহা ঠিক, আমি যদি তোমার কথা নিরাকার মুখ হইতে শুনাই, ইহাই নূতন। ভগবান্‌কে দেখিতেছি, ইহা হৃদয়ভেদী নূতন। আমি নূতন দেখাইয়াছি, এই যে তোমাকে দেখা যায়, কাণের কাছে মুখ দিয়ে তুমি কথা কও, এ কোন শাস্ত্রে নাই। এই যে মেঘের মধ্যে বাণী, সে তোমার, মা। এই যে তোমার পা ধরিতেছি, এই যে স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধ খাইতেছি। এ যে সহজ, অলৌকিক নাই। সামান্য লৌকিক কথা। এ যে সামান্য কথা। পাপী কুজনের কাছে যে হরির মিষ্ট কথা আসে, এ কি নূতন নহে? বসিয়া আছি সংসারের মধ্যে, ঈশ্বরের চিঠি পাইলাম, তাঁর হাতের। জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্দার করিলাম, হাত ধরিয়া টানিলাম, ধরাধরি করিলাম, গুরো, তুমি মানে বোঝাও, এরূপ ভগবানের সঙ্গে যে নিকট যোগ, এই যদি তোমার প্রত্যেক দাস হরিদাস নাম লইয়া সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবেই নূতন। গৌরাঙ্গদাসেরা কতই না ভক্তির রঙ্গ দেখাইয়াছেন। আমাদের দেখান এই গরীবের মা বসিয়া রহিয়াছেন অষ্টপ্রহর। হাতে আঁকা দুর্গার চেয়ে এই কৈলাসপুরীর নিরাকারা দেবী উজ্জ্বল হইয়াছেন। অভিধানে যে সকল মানে পাওয়া যায়, মার অভিধানের কথা তাহা হইতে পরিষ্কার। জড় অপেক্ষা মাতার মুখ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। এই মা তুমি উপস্থিত, জিজ্ঞাসা কর। তুমি বলিলে, "আমি তখনই ভাবিলাম যে, নববিধান পাঠাই; যখন লোকে নববিধানকে লইল না, তখন আমার মনে আহ্লাদ হ'লো না। তারা বলিল, ঢাকের বাদ্য

আমার কথা হইতে স্পষ্ট।” আর যাদের রেখেছ, মা, তাদের মধ্যেও কেহ কেহ চ'লে যাবে। ওরা কি কালা? মা, আমি বাক্যবিহীন। তোমার সহিত দ্বার বন্ধ ক'রে কথা কহিব, অবিশ্রান্ত অখণ্ড তরঙ্গরাশির ন্যায়, সচ্চিদানন্দের লহরীর ন্যায়। এখন যাহা লোকে নববিধান বলে, তাতে আধমরা ভগবান। তোমার সঙ্গে শোব, খাব, আর তোমার স্বর্গে ছাপান সংবাদপত্র পড়িব। এই দেখা আর শুনা, এই ক'রে তোমাকে বেঁধে রাখিব। হে প্রভো, আমি সাক্ষী করিয়া পৃথিবীকে বলিব, দেখিয়াছি, কথা শুনিয়াছি। আমি বলিব. আমার বন্ধু ভ্রাতা সকলে বলিবে। সাকার হইতে নিরাকার উজ্জ্বল। প্রকাণ্ড এক এক কথা, কার সাধ্য বাধা দেয়, অস্বীকার করে? অবিবেকীর চৈতন্য হইল। ভয় নাই, ভগবন্, এই নূতন কথা রাখিয়া যাইব। এবার দেখিব, শুনিব, বগল বাজাইব, এই নূতন। এমন দেখা, এমন শোনা! হৃদয়ের পুতুল ফেলিব না গঙ্গার জলে! মার কথা এমন মিষ্ট, যত প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে, কোথায় লাগে? মার মুখের একটি সুর সপ্ত সুরের চেয়ে সুমিষ্ট। শোন্ রে ভাই—মত্ত হ'য়ে যা—একবার শোন্, ঐ রূপ চেয়ে দেখ্। আমরা যতদিন বাঁচিব, এই নববিধানের ভিতরে বসিয়া অরূপ রূপমাধুরী দেখিয়াছি ও তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, এই বলিয়া তোমার নববিধানকে পৃথিবীতে জয়শীল করিব। মা, তোমার সুকোমল শ্রীচরণ আমাদের মস্তকের উপরে স্থাপন কর। মা, তোমার পাদপদ্মে পড়িয়া থাকিব, আনন্দমুখ দর্শন করিব, কাণ প্রমুক্ত রেখে মার কথা শুনিব। মা, এইরূপে দেখে শুনে অন্তরের অন্তরে স্বর্গের বিমল আনন্দ ভোগ করিব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে আমরা সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [করুণাচন্দ্র]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্থির বিশ্বাস

(হিমাচল, সোমবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
৬ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, যদি কখন কোন কারণে সমস্ত জীবন আন্দোলিত হয়, তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে, ভাল সাধন হয় নাই। যদি বাতাসে গাছের ডাল নড়ে, কিন্তু গাছটি ঠিক থাকে, তাহা হইলে বলা যায়, গাছটি ঠিক বসান আছে। শান্তিদাতা, তুমি যে শান্তি দাও, সে শান্তি প্রাণের গভীর স্থানে থাকে। তাহা না হইলে একটু শোক, একটু সামান্য পরীক্ষায় বুক ভেঙ্গে দেয়, উপাসনা বন্ধ ক'রে দেয়, লোকের সঙ্গে চটাচটি করিয়ে দেয়, পীড়াতে মানুষকে জখম ক'রে দেয়; আজও কর্‌ছে। রোগেতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী হইয়াছে। তোমার নববিধানেও হইতেছে। রোগে শোকে মানুষের জীবনতরী কোথায় গিয়া পড়ে। সাধকহৃদয়ে নির্ব্বাণ পাঠাও। দুঃখের জন্যে তো জন্মিয়াছি। সুখও নেব, দুঃখও নিতে হ'বে। কাঁদ্‌ব, অবসন্ন হ'ব, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর, এ সব চঞ্চলতা বাহিরে ডাল পালাতে থাকিবে। খুব প্রাচীন গাছ যেমন বদ্ধমূল অচল হ'য়ে ব'সে আছে, ভগবন্, তেমনি হ'য়ে, বিশ্বাসপাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমরা থাকিব। ঝড়ে কিছু হ'বে না। একটু মানের হানি হ'লো, একটু মনস্তাপ হ'ল, তার পর? গোড়াটি অচল রহিল। আমি চাই, তোমাকে প্রেম দিব। এমনি ক'রে বিশ্বাসপাহাড়ের ন্যায় থাকিব। ঝড় বলে, নড়, পাহাড় নড়ে না। তবে নাকি সংসারে আছি, বাতাসে পাতা টাতা নড়ে। আজ পয়সা গেল, আজ রোগ হ'ল, এই সকল কারণে সামান্য অস্থিরতা হউক; কিন্তু বিশ্বাসীর প্রাণের গভীর স্থান বিচলিত যেন না হয়। ভিতরে সেই রকম ক'রে দাও। এ বিশ্বাস বুড়ো গাছের

বিশ্বাস, বৃদ্ধ সাধকের সিদ্ধ বিশ্বাস, এ কি টলে? যাকে নিয়ে গর্ত্তের ভিতর যাব, সেখানে, মা, কিছু গোল নাই। বাহিরে ঝড়, বজ্র। ভগবানের অনন্তকালের সেই নির্ব্বাণের মধ্যে ফেলে দাও। এ সকল নিকৃষ্ট শোকের মধ্যে রেখ না, এখন এক রকম গর্ত্তের ভিতরে ল'য়ে যাও। সেখানে সচ্চিদানন্দের কাছে বসি। প্রাণেশ্বর, ভগবন্, দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, রোগ শোকের পরীক্ষার ভিতরে পড়িয়াও শান্তি যেন পাই। হে জননি, তোমার সুকোমল সুনির্ম্মল হস্ত আমাদের এই অশান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর। জীবনের মূল বিশ্বাসের পাহাড়ে বদ্ধমূল ক'রে, মার চরণে এই মস্তকটিকে দৃঢ় ক'রে বেঁধে আর নড়িতে দিব না, এই আশা ক'রে সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার আমরা প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগ-ভক্তিরজ্জু

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
৯ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পরমপিতা, ভক্তজনসহায়, যে রজ্জুতে বাঁধিলাম, সে রজ্জু ছিঁড়িল। ঠাকুর, বিশ্বাস করিলাম, এখানে যে রজ্জু বহুমূল্য বলিয়া বিক্রয় হয়, তাহা অতি সামান্য। তাই তোমার সঙ্গে যে বন্ধনে বদ্ধ হইলাম, হরি, সে বন্ধন থাকিল না। বাঁধিবার সময় মনে হয়, খুব বাঁধিলাম—আজ যে বুকে বাঁধিয়াছি ভগবানের মুক্তিপ্রদ চরণ, এ যাবে না—এবারকার বন্ধনটি সার, সুদৃঢ়, চিরস্থায়ী। কিন্তু যাই সংসার আসিয়া টানাটানি করিল, পুট্ করিয়া বন্ধনটি ছিঁড়িয়া গেল। তুমি যেখানকার সেখানে, আমি দুই শত

হাত নীচে। এই জন্য যোগের পর বিয়োগ। খবর পেয়েছি, এক সঙ্কেত আছে, যে দুটি বন্ধন স্বর্গ হইতে আসে হাটের দিনে—শুভ মঙ্গলবারের হাটে, সে দুটি রজ্জু যদি পাওয়া যায়, তবেই ভগবান্‌কে বাঁধা যায়। একটি যোগের, একটি ভক্তির রজ্জু, আসল তোমার কাছে থেকে আসে। তাহা যদি কোন রকমে পাই, ভয় ভাবনা হইতে নিস্তার পাই; ছাড়াছাড়ি হয় না। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, পাখীর গানের ভিতর দিয়ে, ফুলের গাছের ভিতর দিয়ে তোমার সহিত যোগ। এ যে এক রকম যোগ হ'ল, এ কি আর যায়? প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ের ভিতর দিয়ে ভগবানকে দেখা যায়। আর, হরি, তুমি নাচ, কর্ম্ম কর, বেড়াও, কাচের ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়। পাহাড় কাচ, গাছ কাচ, আকাশ কাচ। আনন্দময়ীর দরশন কেবল ভাগ্যবান্ পুরুষের কাছেই হয়। কে ভাগ্যবান্? হাটে যে সেই দুই রজ্জু কিনিয়াছে। ভগবানকে সকলে মিলে দেখে ফেল্‌ছে। তোমার লুকাইবার চেষ্টা হোক্ না কেন, তোমার প্রকৃতি তোমাকে দেখিয়ে দিবেই দিবে। যেখানে সেখানে মুক্তিময়ী, প্রাণময়ী ছড়াছড়ি। জগৎভরা জগন্নাথে; ব্রহ্মাণ্ডভরা ব্রহ্মেতে। যতদিন দুটি চোখ আছে, নয়ন ভ'রে তোমায় দেখ্‌ব। বুকের ভিতর, শরীরের ভিতর কাচ হ'য়ে দেখা যাচ্চে। মানুষ কত আর না দেখে থাক্‌বে? দমাস্ ক'রে প্রকৃতির দরজা খুলে গেল, আর জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তোমায় প্রকাশ করিল। যোগেতে লাগে যদি ভক্তি, সোণায় সোহাগা! যদি হৃদয়টা একেবারে প্রেমেতে মেতে যায়, তা' হ'লেই এ যাত্রায় আর বড় কিছু বাকি রহিল না। মহাদেব থাকিলেই ভূত সঙ্গে থাকিবে। ঐ মহাদেবকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মত্ত, প্রেমে পাগল! যেখানে সেখানে হরি দেখি, কথা কই, হাসি, গাই আর নাচি। শুকুনো উপাসনা আর এ জন্মে হ'বার কোন সম্ভাবনা নাই। এ যে মত্ততা ফুরায় না কেন?

যে মজে এ প্রেমে, একদিনও তার উপাসনা কেন শুষ্ক হয় না? সোণার দড়ি বেরিয়েছে, যাহা চায়, তাই দিয়ে কিনি। আবার কবে সেই হাট হ'বে, দু'শ পাঁচশ হাজার বৎসর পরে আর একটা বিধান আস্‌বে, অপেক্ষা কত্তে হ'বে। এই দুই রজ্জু, ভগবন্‌, কিনে দাও। তা' হ'লে বল্‌ব সকলকে, ব্রহ্মের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আর কিছুতেই হ'বে না। আর যতবার দেখা হ'বে তোমার সঙ্গে, মদ খাওয়াবে, ছাড়্‌বে না, বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাবে, আমোদ কর্‌বে, নাচ্‌বে সকলকে নিয়ে। এই বাঁধাবাঁধি যাদের হ'ল, ভবসমুদ্রের ঢেউকে তারা ফাঁকি দিল। এবার, দীনবন্ধো, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর পৃথিবীর উপাসনার বন্ধনে সন্তুষ্ট না হই। এমন সোণার হাটে দুটি যে বন্ধন বিক্রী হচ্চে, তাই দিয়ে তোমার চরণের সহিত আমাদের বাঁধ্‌ব। মা, আর যাতে বিচ্ছেদ হয়, এমন আর হ'তে দেব না। মার চরণ বুকে চিরদিনের জন্য ঐ দ্বিবিধ রজ্জুতে বেঁধে রাখ্‌ব এবং প্রাণ মন জীবন তোমার ঐ চরণের সঙ্গে বেঁধে, চিরকাল শুদ্ধ ও সুখী হ'ব, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোগের অন্ধকার

(হিমাচল, শুক্রবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
১০ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হৃদয়বন্ধো, হে যোগেশ্বর, অন্ধকার না হইলে হীরকের উজ্জ্বলতা দেখা যায় না। দিনের বেলা রত্নশোভা কে কোথায় দেখিল, ঠাকুর? সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বলতা যে ঢাকিল, দেখা দিল না তো। হে পিতঃ, আশ্চর্য্য কথা, যে সূর্য্যালোক সকলই প্রকাশ করিল, সেই সূর্য্যালোক

হীরককে ঢাকিল, ম্লান করিল। পৃথিবীর আলোক নিবাইলাম, অন্ধকার ঘরে থাকিলাম। খাঁটি জিনিষের জ্যোতি আরও দেখিতে পাই। হৃদয়-মণি, অন্য মণি যদি অন্ধকার বিনা না দেখা যায়, তোমায় দেখিব কিরূপে অন্ধকার বিনা? যত বুদ্ধি জ্ঞানের আলোক বাহির করি, তত তুমি অন্তর্হিত হইতে থাক। অন্ধকারে, প্রেমমণি, তুমি জ্বলিবে। ইহা ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিবে? বহির্বিষয় সকল আলোক দিয়া শত্রুতা সাধন করিতেছে। বাহির হইতে একটিও আলোক আসিতে দিব না। মায়ার আলো শত্রু, স্ত্রী পুত্র পরিবার পৃথিবীর যত চাকচিক্য জিনিষ, সকলই আমার শত্রু। দেখ, হে হৃদয়সখা, কি গভীর বিরোধ, কি সাংঘাতিক আক্রমণ। সমস্ত নিবাইলাম, আবার জ্বেলে দিলে। যত ইন্দ্রিয়কে নির্ব্বাণ করিলাম, আবার একটি একটি জ্বেলে দিলে। কতকাল এ সকল চক্ চক্ করবে। আমি উপাসনার সময় নিমীলিতচক্ষে পৃথিবীর অসার জিনিষ দেখি, ব্রহ্মমণি দেখি না, তাহা হইলে, পরমেশ্বর, তোমার কাছ থেকে আমি তো অনেক দূরে রহিলাম। যে উপাসনার সময় স্ত্রী পুত্রকে দেখে আসে, তার কি আর যোগ হয়েছে, না, সে তোমায় চিনেছে? যে উপাসনা হইতে উঠে যায়, সে কি তোমায় বুঝেছে? এতটুকু রত্নখানি বড় নহে! হৃদয়ের অন্ধকার ঘরের ভিতর যেন পূর্ণিমার চাঁদ জ্বল্‌ছে! আর আজ যদি তোমায় দেখি, কাল আরও উজ্জ্বল, ক্রমশঃ উজ্জ্বল অধিকতর হচ্চে, তা' হ'লে তোমাকে সুলভ ক'রে ফেল্লাম। যে দিন সমস্ত চোখ নাক্ মুখ হাঁ ক'রে থাক্‌বে, সে দিন আর ব্রহ্মকে দেখ্‌তে পাব না। কাঁদিয়া বলিব, হে হরি, আজ বুঝি তোমায় আর দেখিতে পেলাম না, বাহিরের আলোক আসিতেছে। আজ, নয়নমণি, কোথায় গেলে? হৃদয়ের হরি, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমাদেরই হইবে, হৃদয়ঘর অন্ধকার ক'রে রাখ। ভারি জেল্লা তোমার রঙ্গের, কাল সাটিনের উপর

খুব খোলে। চাঁদের জ্যোৎস্না দেখি ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে, দিনে দেখা যায় না। মনের যত কিছু অসার আলোক আছে, নিবাইয়া দাও। হে অসার জগতের মধ্যে সার ব্রহ্মধন, ও আলোক না দেখিলে সকলই মিথ্যা। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পাপ অন্ধকার মৃত্যুভয় হ'তে রক্ষা পাই। কোটিসূর্য্যাবনিন্দিত মুখ—সেই জ্যোতিতে প্রবেশ করিব। এই অবিশ্বাসীকে আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন যোগবিহীন না থাকি, যোগনয়নে তোমাকে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে দেখিয়া জীবনকে সার্থক করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সহজ সাধন

(হিমাচল, শনিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
১১ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ভক্তবন্ধো, স্বর্গেতে বেগার নাই, এ কথা খুব সত্য, যত বেগার এই পৃথিবীতে। ধ'রে বেঁধে পূজা করান, সাধন, প্রেম করান, চোখ বুঝিয়ে যোগী করান, কঠোর শাসন ক'রে শুদ্ধ করান, এ সকল পৃথিবীতে। আমরা যেমন সহজে নিশ্বাস ফেলি, স্বর্গের লোকে তেমনি সহজে যোগ করেন। কষ্ট নাই, বড় একটা সাধনের গোলমাল নাই, কষ্টে ভাল হওয়া তো নিয়ম নাই। ইচ্ছা হয়, ঠাকুর, একবার পাশ থেকে দেখি, দেবতারা করেন কি। ইচ্ছা হয়, প্রাণের ভাই যাঁরা বৈকুণ্ঠধামে গেছেন, তাঁদের সুখের অবস্থা দেখে প্রাণকে সুখী করি। স্বর্গে এমন গাছ নাই, যার বীজ পৃথিবীতে পোঁতা হয় নাই। এই বলিলাম, এই দেখিলাম! এই মাতলাম, এই মাতাল হ'লাম! আমাদের যদি এ না হ'ল, তা' হ'লে

তোমায় বেগারের ঠাকুর বল্‌ব। উপাসনার স্থান যদি বেগারের স্থান থাকে চিরদিন, তা' হ'লে তুমি ইহা বন্ধ ক'রে দাও। আর কুড়ি বৎসরে যদি এ না হয়, তবে, শ্রীহরি, আশা ভরসা সব ফুরাবে। উপাসনায় বস্‌লাম, ধ্যানস্থ হ'তে হ'বে ; ঠাকুর, পঞ্চাশ বার ভাবিতেছি, যোগী হ'ব মনে কচ্চি, অম্‌নি মনে হ'ল—ঐ, আস্‌বার সময় দেখা ক'রে আসিনি, ছেলেগুলোকে দেখে আসিনি! দৈত্য দানব বাড়ী ক'রেছে মনের ভিতরে, ওরা কি চুপ্‌ চুপ্‌ করিলেই থামিবে? একেবারে যে সিদ্ধ অবস্থার সহজ ধর্ম্ম, সে তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে। ফুলটা দেখ্‌লাম, আবার মোহিত হ'বার দেরী হ'বে? যাকে দেখ্‌লাম, আর যার পায় প্রণাম কর্‌ব, গড়িয়ে পড়্‌ব কাল সকালে? ধিক্‌ সে দর্শনকে! এ বেগারঠেলা প্রেম, যোগ, চিত্তশুদ্ধি দরকার নাই। যার চরণকমল বিস্তৃত রয়েছে, শুয়ে পড়্‌লাম, যোগভক্তি সকলই আসিয়া পড়িল। চিরকালই কষ্ট নেব? যখন মজেছি তোমাতে, তখনও এই রকম? সর্ব্বদা মাতৃস্নেহ ক্রমাগত কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। বর্ত্তমান বিশ্বাস কত্তে দাও। পরমেশ্বর, এক মিনিটের ভিতর যোগ সাধন, প্রেমের মত্ততা, বৈকুণ্ঠে গমন। হয় তো দাও এই জিনিষ, নয় তো পুরাতন ব্রাহ্মদের উপাসনা ফিরাইয়া নাও। মা, কি ভয়ানক ব্যাপার দেখ, একেবারে চারিদিকে ফুল ফুট্‌তে লাগ্‌ল, পাখী ডাক্‌তে লাগ্‌ল, এই তো বৈকুণ্ঠ! এই বসেছি, আর অমনি দেখ্‌ছি, এমন উপায় কর দেখি। "বেগারঠেলা প্রেম আমি নেব কেন? আমাকে একেবারে মা ব'লে ডাক্‌ না, একেবারে মেতে যা না।" হে জননি, এই ধিক্কার তোমার শোনাও আমাদের। হে মঙ্গলময়ি, তপস্যার কষ্ট, আর যত্ন পরিশ্রমের সাধন ত্যাগ ক'রে, সহজে তোমাকে মা ব'লে বৈকুণ্ঠ-ধামে চ'লে যাব, মা, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বস্ব-হরণ

(হিমাচল, রবিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
১২ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হৃদয়রঞ্জন, হে চিত্তবিনোদন, যে ভক্ত প্রথমে তোমাকে চিত্তহারী নাম দিলেন, তাঁহার মনে অবশ্যই ভয়ানক প্রমাদ ঘটিয়াছিল। চিত্তহরণ নাম সহজে কেহ কাহাকে দিতে পারে না। সর্ব্বস্ব অপহৃত না হইলে, হরণ কথা কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। যুগে যুগে ভক্ত তোমায় ভালবাসিলেন, হৃদয় হরণ কৈ হ'ল না তো? ভক্তহরণ, যোগিহরণ, গৃহহরণ, প্রাণহরণ এ সমুদয় ব্যাপার কবে পৃথিবীতে সংঘটিত হ'ল, ভগবন্? কার বাড়ীতে প্রথমে তুমি সিঁদকাটি লাগাইলে? কে সেই ভক্ত, যার বাড়ীর ধন সম্পদ দেখে, ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার মনে লালসা হ'ল? কবে তুমি জীবলোভে লোভী হইয়া জীব হরণ করিতে লাগিলে? যোগ ভক্তি কিছু কিছু বুঝিলাম ; কিন্তু সন্তানের ঘরে বাপ চোর, সতীর ঘরে পতির অপহরণের চেষ্টা, দীন কাঙ্গালের বাড়ীতে হরি লোভী হইয়া রাত্রিবাস করিয়া সব সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এ সব রহস্য তো গীতায় নাই, কোথাও লেখা নাই। একটু সুযোগ পাইলেই হরি অমনি আসেন, যা কিছু পান, অল্পক্ষণ মধ্যে স্থানান্তর করেন। যাঁর বাড়ীতে যে দিন লক্ষ্য কর, আর সে গৃহস্থের গতি নাই। ভয়ানক সতর্কতা অবলম্বন করুন, রেহাই নাই—তাঁর রেহাই নাই। যার উপর তোমার চোখ পড়ে নাই, সে আছে ভাল, আর যার উপর তোমার লালছ হয়েছে, সে গেছে,—যেখানেই থাকুক না কেন, সে গেছে। সন্ধ্যার সময়টা ফাঁক করছে, আর একটু অন্ধকার হ'লেই সে গেল। দীননাথ, কি যে প্রেমের চক্ষু, তোমার একবার দৃষ্টি দিলেই গেল। এত বড় মহাজন ছিল, কত লোক

জন, তালুক, মুলুক—কাল বড় ধনী, আজ ছেঁড়া কাপড় প'রে দেখা কত্তে এল। কি হয়েছে? হরি আর তার কিছুই রাখেন নি। "আমার যা ছিল, সমস্তই নিয়েছে। আমার সংসারের আর একটি কড়িও নাই।" বলিস্ কি, ভাই? কাল ছিল সৌভাগ্য, আজ হ'ল এই দশা! "আর, ভাই, কি বল্‌ব। পাঁচ মিনিটের ভিতর একবার এসে ছুঁলে, আর সমস্ত চ'লে গেল।"

এক বার এস, হরি, সিমলার দিকে। কতকগুলি ধনী আছে, নির্ভয় হ'য়ে নিদ্রা যাচ্চে; চিত্তহারী, একবার বিক্রম দেখাও এদের উপরে। পাছে ধর্ম্মের জন্য একখানি কিছু দিতে হয়, পাছে হৃদয়ের একটু প্রেমভাব কাহাকেও দিতে হয়, এরা সদাই ভীত। যথার্থ প্রেমচোর যদি হ'য়ে থাক, আর দেরী ক'র না। একবার পাহাড়ে এসে চুরি ক'রে যাও। একবার এস। চিত্তহরণ, একবার এসে বাহাদুরী দেখিয়ে যাও। আমাদের ঘরে যে ভয়ানক সংসারী, বৈরাগ্যের নামটী যার বাড়ীতে নাই, ইচ্ছা হয়, তাহার বাড়ীতে তুমি একবার চুরি কর। আমরা আহ্লাদ ক'রে বল্‌ব—কি ভাই, বড় যে ব'লেছিলে, "কাহাকেও আস্‌তে দিব না।" সমস্ত রাত্রি যে ধন সম্পত্তি নিয়ে জেগে ছিলে, এখন কি হ'ল? ব্রাহ্মদের মধ্যে শেয়ানা লোক এমন অনেক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, হরি. একেবারে, তাহাদের যা' আছে, সমস্ত তুমি নাও, কিছু রেখ না। একেবারে নিঃস্ব ক'রে দাও তাদের। কবে আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে হরি চোর এসে নিঃস্ব ক'রে দেবে? সমস্ত জানালা খুলে দেব, আর ভয়ানক অন্ধকার-যোগরাত্রিতে চুরি কত্তে এস। সমস্ত প্রাণ মন ছাদের উপরে রেখে দেব, নিয়ে যেও। বড় বড় মহাজনের বাড়ীতে চুরি হ'য়ে গেছে। আমরা গোটাকতক কাঙ্গাল, আমাদের অসার প্রাণের উপর তোমার লোভটা পড়ুক। দীনবন্ধো,

দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, আর সংসারের আসক্তি রাখ্‌ব না, সমস্ত ছেড়ে দেব, যা কিছু আছে, সমস্ত হরি কেড়ে নেবেন, নিঃস্ব হ'য়েছি ব'লে আহ্লাদে নৃত্য করব। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিরসুখ

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমানন্দ, হে গভীর সুখ, এ ধর্ম্মে স্বর্গ নগদ, ধারে নয়। সাধন তো কেবল তপস্যা নয়, এ ধর্ম্মে সাধন আনন্দ। আমি এখানে কেবল তোমায় ডাকিয়া গেলাম, অন্য লোকে উত্তর পাব? ভক্তপরিতোষের জন্য অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তুমি প্রেম দান করিতেছ। দীনেশ্বর, জীবের দীনতা দূর করিবার জন্য নগদ দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ। অতি অধম আমরা, আমাদের জন্য যখন এত সুবিধা করিয়াছ, উৎকৃষ্ট জীব যাঁহারা, তাঁহাদের জন্য তা' হ'লে কতই সুব্যবস্থা। যদি নয়নতারা কেহ তোমায় বলিল, বুঝাল যে, নয়নের সুখ যে কি, তাহা সে বুঝিয়াছে। হে ঈশ্বর, আর এখন হ'তে কেবল কঠোর তপস্যা নয়, আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকিব তোমাকে ল'য়ে। যে বলিবে, আছ কেমন?—বলিব, মুখ দেখিয়া ঠিক কর। একটি প্রকাণ্ড সুধাসাগরে যত ভক্তদিগের হাত ধরিয়া কেলি করিব, ইহ-পরলোকের সুখ সম্ভোগ করিব। আর যত নীচ উঞ্ছ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দাও। যখন টান্ প'ড়েছে, যখন ভক্তিনদী একটানা ভাঙ্গার মত হ'য়েছে, তখন আর তো সে দিন মনে থাক্‌বে না। ভাদ্র মাসে কি আর সে ভাবে ভাঁটা আস্‌বে কখন, বাতাস অনুকূল হ'বে কখন? এ

সকল ভাবনা কি ভক্ত ভাবেন? এ আনন্দবৃন্দাবন হ'তে বিচ্যুতি হ'বে না। ভক্তদের সঙ্গে বুকে বুকে আলিঙ্গন, এ আর থামিবে না। এ নদী চলুক, চলুক। দয়া কর, ঠাকুর, কোন উপাসক যেন মলিন বদন দেখাইয়া মনুষ্যের মনে শেল বিদ্ধ না করে। আনন্দময়ি, আনন্দরথে এস, আনন্দের বাজার খোল। দুঃখ যন্ত্রণাকে চিরদিনের জন্য ফাঁকি দিয়ে চিরসুখে সুখী হই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প'ড়ে দুঃখ গেল, সুখ এল, সুখেতে পাগল হ'য়ে তোমার কাছেই প'ড়ে থাকিব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুরের মিল

(হিমাচল, বুধবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৮০৫ শক ;
১৫ই, আগষ্ট ১৮৮৩ খৃঃ)

হে বিনীতবৎসল, হে আত্মার চিরসুমিষ্টতা, অনেক সুরে মন খারাপ হইল, হৃদয়যন্ত্র সুখদায়ক হইল না। মনুষ্যজাতির এই আক্ষেপ, যখন সংসার করে, তখনও সতের আনা সুর, আর যখন পূজা করে, তখনও সুর ঝগড়া করে। প্রত্যেক লালসা আপনার একতারায় আপনার সুর চড়ায়। এ কেবল, ঠাকুর, সংসারে নয়, উপাসনার সময়েও মানুষ বুঝিতে পারে। তুমি ধরেছ এক সুর, আমরা ধ'রেছি অন্য সুর। দুই বাজিয়ে এক সুরে না বাজালে কখনও মধুর আলাপ হয় না। তুমি যখন যাও পূর্ব্ব দিকে, আমি তখন যাই পশ্চিমে। তুমি যখন ধর নরম সুর, আমি এমনি অজ্ঞান মূর্খ, ঠিক সেই সময় আমার যত দূর চড়া সুর আছে, তাই ধরি। গম্ভীর যোগী যিনি, তিনি তোমার কাছে নির্জ্জনে ব'সে সুর ঠিক

করেন। লালসাগুলির কাণ ম'লে তোমার সঙ্গে সুরের ঠিক মিল হ'ল দেখে ছেড়ে দেন। মা, তোমার সুর বল্লেও হয়. আর তোমার ছেলের সুর বল্লেও হয়। পিতা পুত্রে মিলন হ'বে। তোমার সুর ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধ সুর দোরস্ত হোক্। বাড়িতে ছেলে পিলের গোল, বাহিরে গেলে লালসার গোল। এই জন্য ইচ্ছা হয়, যোগতন্ত্রী ধ'রে তোমার সঙ্গে সুরে মিলিত হই। যদি ঢোল বাজাই, তোমার হাত আমার ঢোল বাজাক। আর যদি আমার সেতার হয়, আমি ধ'রে থাক্‌ব, তোমার হাত পিড়িং পিড়িং করুক আমার সেতারে। ঐ যে মজার একটি সুর আছে, যাতে জীবের পরিত্রাণ হয়, ঐ সুর ছড়াছড়ি পৃথিবীতে, কাণকে স্তম্ভিত ক'রে রেখেছে। প্রাণটি একতারা, এক সুরে। পরিত্রাণে দুইটা সুর নাই। যে ওতে অন্য সুর মিশায়, সে গাধা। মনে করে, সে সুর বোঝে। বংশীধর, সদা কাছে ব'সে মনোহর বংশীধ্বনি কচ্ছ, কে বা শোনে! বাজারের গোলমাল, লালসার হট্টগোল কত কাল আর তোমার সুরটিকে ঢেকে রাখ্‌বে। সংসার, তোর ঝঙ্কার নিস্তব্ধ হোক। মা হিমালয়ে বসিয়া একতারা বাজান, আমরা শুনে যাই। ভগবতি, বাড়ী গিয়ে গল্প কর্‌ব, সুর শুনেছি। আর যার সঙ্গে মিল্‌বে না, তার কাণ ম'লে সুর ঠিক ক'রে দেব, বল্‌ব, "বস্ দেখি, একবার সুরটা মেলাই। সুর ঠিক না হ'লে. আরাধনা ধ্যান কিছুই হয় না। মনে কল্লে দুই ঘণ্টা পরে উঠিয়া গিয়া, বড় উপাসনা হ'ল, কিছুই হ'ল না।" এ গোলমেলে লোক তাড়িয়ে দাও, এই সংসারে শব্দ নিস্তব্ধ হোক; তুমি উপাসনার সময় বীণা বাজাও যখন, ঠিক সুরে সুরে, প্রাণে প্রাণে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিল, তখন আর তপস্যার দরকার নাই। সরস্বতীর বাড়ীতে না কি এক দণ্ডের জন্যও সুর থামে না। মা, সুপ্রসন্ন হ'য়ে এই সকল বিজাতীয় সুরকে তোমার সুরে মিলাইয়া লও। যত রকম

বিরোধ আছে, সকল মিটিয়ে নিয়ে, তারে তারে একসুর ক'রে পৃথিবীতে চিরসুখী হ'তে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতিতে ঈশ্বর-দর্শন

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল, হে প্রকৃতিপতি, এই যে তোমার বিশ্ব, ইহা মানুষকে নাস্তিক করে, আবার মানুষকে আস্তিকও করে। এই বিশ্ব দেখে চক্ষু ক্ষরে যায়, যেটুকু আস্তিকতা ছিল, তাহাও চ'লে যায়। আর এই তোমার বিশ্বমন্দির দেখিতে দেখিতে কাহারও স্বর্গ ভোগ হয়। তুমি বলিলে, "জীব, আমি তোমাকে একটি নূতন বাগান দি।" দরজা বন্ধ, কি হ'বে? বলিলে, "রত্ন পোরা আছে, এই বাক্স দিলাম।" কিন্তু চাবি নাই,—কি হ'বে? যার জীবন যোগনয়নবিহীন, হে ঠাকুর, তাকে যদি বল্লে, নববিধান এয়েছে, তাহার কাছে তো সকলি পুরাতন। চাবি বন্ধ, কি করবে সে? বাক্সটি পেয়ে মানুষ হাসে, কিন্তু হাসি কান্নাতে পরিণত হয়, যখন দেখে চাবি নাই। আর সে হাসি দশগুণ বাড়ে, যখন বাক্স খুলে গহনা প'রে স্বর্ণালঙ্কারের অধিকারী হয়। ও হিমালয়, তোমার দেবীকে খোল। ছয় মাস কত প্রার্থনা করিল, নিষ্ঠুর পাহাড় বুকের ভিতরে দেবীকে লুকাইয়া রাখিল, কিছুতেই বাহির করিল না। কত লোক পাহাড় দেখ্‌ছে, আর কাণা তথাপি। পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, টিব্বায় উঠিলাম, খড়ে নামিলাম, কৈ, দেবীকে তো কোথাও দেখিলাম

না। যখন যোগের অবস্থায় বলি, পাহাড়, খুলে যাও, আমার দেবীকে বাহির কর, অমনি ঝণাৎ ক'রে পাহাড় খুলে গেল, দেবী দেখা দিলেন। যখন পাহাড়ে দেখ্‌লাম, তবে জলে কেন দেখ্‌ব না? পাথরের দরজা খোলা বড় শক্ত। যেমন প্রকৃতি, তেমনি প্রকৃতিপতি, এখানে দুইজনেই বিরাজ করিতেছেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈলাস কোন স্থান?" আমি হাসিলাম। কৈলাস যে সকল হিমালয়। পাথর চাপা। এ পাথর সরায় কে? এ পাথরের দরজা খোলে কে? খোলে যোগী, আমাদের মত নববিধানীরা। এই দুর্গোৎসবের সময় তুমি দেখা দিবে, এই কৈলাসে তুমি লুকিয়ে রইলে। একবার, ঈশ্বরি, কাছে যেতে দাও গো। অরণ্যে রোদন অপেক্ষা পাহাড়ে রোদন কষ্টকর। আর হ'ল না, হ'ল না। তপোবনে, অরণ্যে, সহরে কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু পাহাড়ে কি ক'রে তোমাকে দেখা যাবে। কিন্তু নূতন সময় এয়েছে। তবে, হিমালয়, খোল দ্বার। আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। একবার দেখাবেই দেখাবে। সেই কৈলাস পর্ব্বত দেখিলাম, মার পরিবার এখানে আছেন, কিন্তু গুপ্ত। শাণিত ক্ষুরধারের মত যে দৃষ্টি, তাহাতে দরজা কেটে যাবে, আর প্রকৃতিতে দেবী দেখা যাবে। সমস্ত তোমার যোগী সন্তানেরা তোমাকে পাহাড়ে গিয়া ধ'রেছিল। হে করুণাময়ি, একবার খুলে দাও প্রকৃতির দ্বার। যে রূপ দেখে সাধু পাগল হ'ল, সে রূপ দেখে অসাধুও যেন পাগল হয়। অন্ধকারের মধ্যে প'ড়ে কোথায় দেবী বলিয়া যেন না কাঁদি; কিন্তু সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে তোমার অপরূপ রূপ দেখে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, আজ আমাদের এই শুভ আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধন

(হিমাচল, শুক্রবার, ২রা ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে হৃদয়ধন, যখন মানুষ, ভগবান্, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা, অধমতারণ, এ সমুদয় সম্বোধন ছাড়িয়া তোমায় কেবল 'ধন' বলে, তখন বুঝ্‌তে পারি, আসল বস্তু তাহার দখল হইয়াছে। যতক্ষণ ধন অন্য দিকে, ততক্ষণ ব্রহ্মলাভ হয় না তো। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-ধন, মন-ধন, বুদ্ধি-ধন, রুচি-ধন, এই সমুদয় থাকে, ততক্ষণ সে প্রবঞ্চক, যে তোমাকে বলে—"আমি ভালবাসি।" আমি সে ভালবাসা মানি না, আমি হরি-ধন-পূজা মানি। কি কি ধন চাই, ঠাকুর, আমাদের এ পৃথিবীতে? অন্ন-ধন না হ'লে মানুষ বাঁচে না; বারি-ধন না হ'লে তৃষ্ণায় মানুষ মরে; টাকা-ধন না হ'লে স্ত্রী পুরুষের কষ্ট দূর হয় না; আর স্বাস্থ্য-ধন। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তোমাতে আমরা ধন পেয়েছি কি না। আমাদের আহার, পান, সুস্থতা, বল তোমাতে পাওয়া যায় কি না, বল। বাহিরে মিষ্ট হ'লে কি হয়, নাথ? উপাসনা লম্বা করিলেই বা কি হয়? তার আঁটি টক, হাড়ের ভিতর রোগ, দরিদ্রতা, অন্ন-জল-কষ্ট। দুঃখ দারিদ্র্য যদি রহিল, হাজারই ধার্ম্মিক হোক, সে কখন সুখী হ'তে পারে না। তবে তুমি এলে কেন? নির্ধন সংসারীর স্ত্রী পুত্র অর্থাভাবে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, আমাদেরও তো তাই। হরি, তুমি ধন নও, তুমি শান্তি নও। যদি আমরা সহস্র রোগে বল্‌তে পারি,—হরি আমার স্বাস্থ্য, আমার ঔষধ, আমার শরীরের শান্তি, তবেই, হে ঈশ্বর, সাংসারীতে ব্রাহ্মেতে তফাৎ; তা' না হ'লে উপাসনা আমাকে, যতক্ষণ আমি সুস্থ, ততক্ষণ সুখী কর্‌বে। তবে তুমি বন্ধু হ'লে না; কেন না বিপদে যে বন্ধু, সেই

বন্ধু। তুমি ধন হ'তে পার্‌লে না; কেন না নির্ধনের তুমি দারিদ্র্য দূর কর্‌তে পাল্লে না। স্ত্রী পুত্র যখন কষ্ট দেয় না, সে সময় বেশ উৎসব কর্‌তে পারি, নাচ্‌তে পারি; কিন্তু সেই সময় যদি শুনি, স্ত্রী পুত্র মারা গেল না খেয়ে, অমনি ভক্তের মন ধড়াস্‌ ক'রে উঠিল। ধার্ম্মিক হওয়াতে লাভ আছে, কেন না দুঃখের সময় তোমাতে সুখী হ'তে পারি। লাখ টাকা ট্যাকে তুমি—এই যে দিন দেখ্‌ব, সে দিন স্বর্গ-লাভ। নতুবা মন্দিরে পূজা, বাড়ীতে পাপ! একবার কোল দাও, ধন ব'লে আলিঙ্গন করি; যিনি সকল দুঃখ দূর করেন, সকল দারিদ্র্য দূর করেন, তাঁহাকে গ্রহণ করি। এক বস্তুতে সকল ধন পেয়ে জীব চিরসুখী হউক। দয়াময়ি, একবার মাথায় হাত দিয়ে এই আশীর্ব্বাদ কর যে, কেবল অন্তরে হাসির রাজ্য দেখি, দুঃখেতে দুঃখী নই, নিত্যানন্দের রাজ্যে বসিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিশ্বাস-যোগ

(হিমাচল, শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৮০৫ শক,
১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে জীবনসহায়, হে প্রাণদাতা, কত গোল হইতেছে জীবনে, সংসারে কত কোলাহল; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি কল আস্তে আস্তে নিয়মিত-রূপে সর্ব্বদা চলিতেছে। মানুষ পাপ করে, মানুষ গোল করে; নিশ্বাসের কল থামে না। এই কলে সমস্ত উপনিষদ্‌ ও বেদ লেখা আছে, এবং সমস্ত বিশ্বাসের মন্ত্র আছে। এমন বিশ্বাস এই নিশ্বাসে যে, আর কোথাও এমন দেখা যায় না। বিশ্বাস কেবল 'হরি হরি' আস্তে আস্তে সর্ব্বদা বলে।

নিশ্বাস কি, ঠাকুর? তোমার, না, আমার, কার? তোমার নিশ্বাস আমার নাকে ঢুকিতেছে, জীবন দিতেছে। যদি তুমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাও, আমার জারি জুরি কোথা? স্বর্গ হ'তে প্রাণবায়ু যদি না আসে, রাজাই বা কোথায়, প্রজাই বা কোথায়? ঐ বুকের ভিতরে শোঁ শোঁ করিতেছে, হরিমন্ত্র জপ করিতেছে, স্বর্গ থেকে প্রাণবায়ু টেনে নিচ্চে। যদি অলস অবিশ্বাসী হই, তা' হ'লে আমার প্রাণ-সংশয়। তোমার সঙ্গে, ভগবন্, আমাদের নিশ্বাসের প্রাণের যোগ। পিতাই বলি, মুক্তিদাতাই বলি, তত যোগ বুঝায় না—আর এই যে নিশ্বাসের যোগ, এ ভয়ানক নিকট যোগ। মানুষ নিশ্বাসরাজ্যে বড় যায় না, যোগী ভিন্ন ওখানে কেউ যায় না। যোগীরা এই সমস্ত মস্তিষ্ক প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে, মনের রাজ্যে যেতে যেতে একটা শব্দ শুনতে পান। কেরে এখানে? নিশ্বাসঋষি গম্ভীরস্বরে বলেন, "আমি ব্রহ্মবায়ু।" বিশ্বাসী নমস্কার ক'রে নিশ্বাসের নিকট বিশ্বাস লইলেন। আপনার প্রাণবায়ুতে যোগী যখন নিমগ্ন হইলেন, তখন তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, যোগ নিশ্বাসে। হরি-সাধন অতি সহজ। নিশ্বাস, এক দিকে তুমি আমার প্রাণমন্ত্রের দীক্ষাগুরু, আর এদিকে সহজসাধনশিক্ষক। নিশ্বাস, তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ব্রহ্ম-ভক্ত। ঋষি হ'য়ে ব্রহ্মকে আয়ত্ত ক'রেছ। আমি ঝিলের ধারে ভক্তি-তরুমূলে যোগের পাহাড়ে বসিয়াছি, বিশ্বাস করি কেবল নিশ্বাসকে। এই স্বর্গের সমাচার আনিয়া দিতেছে। বলে, "হরি বল্ না, প্রাণ বল্ না, সহজে সাধন কর্ না, সহজে ডাক্, সহজে নে।" বিশ্বাস বল্ছে, "দেখ্-ছিস্, প্রত্যাদেশ আছে।" কেহ শুনতে পাবে না। ও কি না গুপ্ত নিশ্বাসরাজ্যে হচ্চে, এই জন্য সকলে শুনতে পায় না। ভগবন্, কি তোমার খেলা! আমি টের পাচ্চিনে, আমার মুখে স্তন দিয়ে রেখেছ। নাকের ভিতরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবায়ু দিচ্চ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

ভগবান্ বাঁচান। শরীর সম্বন্ধেও যা, মন সম্বন্ধেও তাই। যে দিন নিশ্বাস ফেলি, সে দিন কেবল তোমার পূজা করি। নিশ্বাসের মত কথা কইতে দাও, পূজা করতে দাও, সংসারের যা কিছু, তোমার চরণে দিতে দাও। সহস্র বিপত্তি দেখেও আমোদ কর্ব নিশ্বাসের মত; যোগ ভক্তি কর্ব নিশ্বাসের মত, তোমায় মা ব'লে পাদপদ্মে প'ড়ে থাক্ব নিশ্বাসের মত। এমনি সুন্দর বাতাস! ভক্তের জীবন-তরীকে আস্তে আস্তে নিয়ে যায়। চুপ ক'রে ভক্ত ব'সে থাকেন, নিশ্বাস নিয়ে যায়। কে নৌকা নিয়ে যায়? নিশ্বাস। এ বাতাস থামে না, ফেরে না। বৈকুণ্ঠধামের দিকে চলেছে। নৌকা অবাধে আনন্দে চলিল। এই নিশ্বাসের রাজ্যে থাকতে দাও। এখানকার গঙ্গা ভাল। ঐ ঈশা যান, মুষা বুদ্ধ যান, পবিত্র নিশ্বাসের বায়ুতে সকলের নৌকা যাইতেছে। নিশ্বাস, বন্ধু হও; নিশ্বাস, গুরু হও। তোমার কাছে প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে স্বর্গলাভের উপায় করি। হে মঙ্গলময়ি, তোমার সুকোমল শ্রীচরণ অবিশ্বাসী মস্তকের উপর স্থাপন কর; নিশ্বাস-গুরুর কাছে, সহজে তোমায় কি ক'রে পাওয়া যায়, শিক্ষা করিব, যে নিশ্বাসে সমস্ত ভক্তগণ ত'রে গেছেন, তাহা সাধন করিব, এই আশা ক'রে, সকলে মিলিত হ'য়ে, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধানে কৈলাস আবিষ্কৃত

(হিমাচল, চতুর্দ্দশ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে, রবিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৮০৫ শক ; ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীন দয়াল, হে ভারতসন্তানদিগের একমাত্র আশা ভরসা, প্রাচীন ভারতের অনেক গৌরব ছিল। তখন কৈলাসধামে বড় কাণ্ড কারখানা হইয়া গিয়াছে। তখন ভক্ত ঋষি যোগীরা তোমার কত খেলা দেখিতেন। কোথায় গেল সে সুদিন? একবার, হে নাথ, সেই কৈলাস দেখাও। ভারত কাঁদে, বঙ্গ কাঁদে। হে জগদীশ্বর, একবার তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। কৈ হিমালয়ে আর হিমালয় রহিল না। ঐ যে, মা প্রকৃতি দেবী, ঘরের ভিতরে ব'সে হাস্‌ছ। এ ত পাহাড় নয়। এ ত ব্রহ্মের মায়া-স্বরূপ। পাথরের ভিতর আর পাথর নাই, কেবল জ্যোতি। তোমার সুন্দর সোণার ঘর তাহার ভিতরে। ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলে ত এ ঘরে জুটেছেন। হে ভক্তজননি, তুমি এই সমুদয়কে আশ্রয় দিয়া কত সুখে রাখিয়াছ! কলিকাতা, মনকে টানিও না। নীচ দেশ, মনকে কলুষিত করিও না। যেমন জ্যেষ্ঠ ভাইগুলি মার পাশে নাচিতেছিল, হায়, কবে আমরা সেইরূপ ওদের সঙ্গে মিশিয়া এইরূপে নাচিব। হে ঈশ্বর, তুমি কলির মানুষকে এত ভালবাসিলে! এই পাহাড়ে লোকে কাঠ কাটে, পাথর ভাঙ্গে, সকলই টাকার জন্য। মা, এই পাথরের মধ্যে তুমি ব'সে আছ। কত শেল তোমার বক্ষে মেরেছে। মানুষ তোমার এই সুন্দর পবিত্র পর্ব্বতে এসে পাপ অধর্ম্ম কত করিতেছে। একবার ত জিজ্ঞাসা করে না, কাহার রাজ্যে এসেছে? বলে, এ সব সাহেবদের বাড়ী, এ স্থান তাহাদের কর্ম্মের স্থান। সোণার লক্ষ্মি, তুমি এই সকল পাথরের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছ। তবে পৃথিবী কেন 'মা নাই, বাপ নাই'

বলিয়া বিলাপ করে? হে মা, তুমি যে আছ, বজ্রধ্বনিতে তাহা একবার প্রচার কর। একবার বল যে, এই পাহাড়ে মহাদেবের বাসস্থান। সকল দিক জ্যোতির্ম্ময়! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য! সৌন্দর্য্য দেখে পৃথিবী কৃতার্থ হউক! হে দেবি, একবার প্রসন্ননয়নে আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কখন লালসার কুটিলতা মনকে না কলুষিত করে। একবার যদি চারি হাজার বৎসর পরে কৈলাস দেখা দিলে, তবে কথা কও, যেন ভারত ভুলে যায়। হে কৃপাময়ি, এই উৎসবদিবসে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, কৈলাসের সন্ধান পাইয়াছি, এবার হইতে মার চরণে ব'সে কৈলাস সম্ভোগ করিব। হে মঙ্গলময়ি, তোমার সুকোমল সুনির্ম্মল শ্রীচরণ আমাদের পাতকী সংসারপ্রিয় মস্তকের উপর স্থাপন কর। হে জননি, প্রকৃতির হাসিতে আমি চিরকাল হাসিব, প্রকৃতির স্তনের দুগ্ধকে আমার প্রাণস্বরূপ করিব, যোগেতে যোগেশ্বরীর সঙ্গে এক হ'য়ে যাব; এবার থেকে কৈলাস ছাড়া আর হ'ব না, আমার প্রাণের ভিতরে কৈলাস সদা হাসিবে। আমি হাতে ক'রে মহাদেবকে সদা রাখ্‌ব, আমার বাড়ী এই কৈলাস হইবে, এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর। আমি যে শ্মশানের ভিতর দিয়া প্রকৃতি দেবীকে লাভ করিলাম। আমি এবার থেকে আর অন্য কাহাকেও পূজা করিব না। আমার কথাটা বিশ্বাস ক'রে, সকলে দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য এখানে আসিবেন। ওগো দেবি, তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে যেখানে আছি, সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত এবং এক হ'য়ে, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কৈলাসবাস

(হিমাচল, সোমবার, ৫ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মহাদেব, হে করুণাপূর্ণা প্রকৃতি, তোমার ঘরের সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন দয়া করিয়া ঘরে রাখ, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি—যে ঘর সোণার সুখের ঘর, যুগলরূপের ঘর। যেখানে থাকি, কৈলাসবাসী কৈলাস-বাসিনী হইয়া তোমার দাস দাসী হইয়া থাকি। দেবভাবও লাভ করি, দেবীভাবও দেখি। হে আনন্দময় পুরুষ, তুমি সেই ঘরে আমাদিগকে চিরকাল বাস করিতে দাও। তোমার সাধুদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিব। আর কি সুখ চাই? আর কি মুক্তি চাই? হে দেবদেবি, হে যুগল ঈশ্বর, একেবারে ঘরশুদ্ধ এস। এবার আর ভেঙ্গে নেবো না তো। এবার সোণার প্রতিমা, সোণার কৈলাসশুদ্ধ প্রাণের ভিতর নিয়ে আস্‌ব। নববিধানবাদীদের কপালে এত সুখ লিখিয়াছিলে। ভগবন্, প্রসন্ন হয়েছ, তোমার বাড়ী ঘর খুলে দিয়েছ, সোণার স্বর্গ পাপ চক্ষের কাছে প্রকাশিত ক'রেছ। এখন তোমায় আর চুপ ক'রে থাক্‌তে দিব না। প্রকৃতি-দর্শনের ফল হাতে হাতে, ব্রহ্ম-দর্শনের ফল হাতে হাতে। মনুষ্য হওয়া যেন কেহ অভিসম্পাতের বিষয় মনে না করে। মানুষ অভাগা নয়, নারী অভাগিনী নয়। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে যারা প্রকৃতিপতিকে দর্শন করে, তারা কি ছোট জীব? বুঝিলাম, ঠাকুর, পৃথিবীতে যে রোগ শোক, তাহার ভিতরে নানা রত্ন চাপা রয়েছে। নাথ, তোমার নববিধান পুরাতন মত যে উল্টে দিচ্চে।

মা, এবার সোণার কৈলাসবাসী হ'ব। এবার ব্রহ্মলোভে লোভী, কৈলাসলোভে লোভী হ'য়ে, তোমার দরজায় চাকুরী কর্‌ব। এবার

চিরদিনের জন্য কৈলাসগৃহে বন্দী হ'য়ে রহিলাম। এই সোণার ঘরে— পাথর ঢাকা যে সোণার স্বর্গখানি—যেখানে বসিলে একেবারে দেবদেবী-মূর্ত্তি, ভক্ত সাধু সকলকে দেখা যায়, এইখানে চিরজীবন সুখে কাটাই। মা, নিকৃষ্ট সংসারলোভ ত্যাগ ক'রে, কৈলাসধামে জীবনটা তোমার পদ-সেবায় কাটাইব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মাতৃদৃষ্টি

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২১শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে যোগেশ্বর, তোমার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে মিলন, তাহা কিরূপ, কৃপা করিয়া ভক্তদিগকে বলিয়া দাও। এখন চক্ষু হইল স্বেচ্ছা-চারী। ইচ্ছা হয়, তোমাকে দেখে, আবার ইচ্ছা হয়, তো পাপমুখও দেখে। ইচ্ছা যদি হয়, ফুলের পানে তাকায়, ইচ্ছা যদি হয়, ভয়ানক নরকের দিকেও চায়। চক্ষুকে তোমার চক্ষের সঙ্গে বাঁধ, তাহা হইলেই খুব সুখী হই। যে দিকে তাকাব, মাতৃদৃষ্টি সেই দিকে রহিয়াছে। যেন একটা কোন মহোৎসব হ'য়েছে, আর খুব ভিড় হয়েছে, ঠেলে আর যেতে পারিনে। চারিদিকে তোমার নয়নকমল সাজান রয়েছে। চক্ষু যদি বন্ধ করি, ঐ নয়ন দেখি, আর যদি খুলি, তা' হ'লেও ঐ নয়ন দেখি। যত তাড়াবার চেষ্টা করেন, ততই যোগীর নয়ন ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চেপে যায়। তোমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দৃষ্টির মধ্যে আমার চক্ষু চেপে গেল, আমি বাহির করিতে পারি না, নয়নে আট্‌কেছে। এই অবস্থা, প্রভো,

তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি। জলের ভিতরে চক্ষু, আকাশে চক্ষু, পাহাড়ে চক্ষু, চারিদিকে তোমার চক্ষু। গগন উজ্জ্বলকারী পবিত্র চক্ষু-গুলি স্নেহে ভরা অতি সুকোমল জ্যোৎস্না কেবলই বর্ষণ করিতেছে। মাখামাখি হ'য়ে যাচ্চে চক্ষে চক্ষে। সুনয়না, তোমার যে অত্যন্ত শুভ দৃষ্টি, তাই আমার উপর বর্ষিত হউক। কখন আমার যেন অশুভ না হয়। আমাদের তাপিত প্রাণটা খুব শীতল হ'বে। ঐ চাঁদের হাটের ভিতরে আটকে যাবে দৃষ্টি, এই চাই। হে নাথ, যোগীর নয়ন দাও, যে নয়ন তোমার দৃষ্টি হ'তে কিছুতেই ছাড়ান যা'বে না। কেবল চক্ষুময় চক্ষুময় আকাশ। যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই মার দৃষ্টি! পাপ করতেও পারবে না, আর ভুলতেও পারবে না তোমায়, চক্ষু যে ভুলতে পারে না। যত দূরে যাই, ততই আরও ঘন চক্ষুজালে, মার দৃষ্টিজালে পড়িব। এমনি ক'রে তোমার দৃষ্টিতে আমাদের নয়ন যুক্ত ক'রে দাও, যেন আর মাতৃনয়ন ছাড়া কোথাও কিছু দেখতে না পাই। পাপ যখন করি, জলন্ত মাতৃচক্ষু দেখে ভয় পায়। হে নাথ, হে প্রেমময়, পাপ দেখা যেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। এই নয়নকে তোমার নয়নের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখিব, দৃষ্টিজালে একেবারে নয়নকে ফেলিয়া রাখিব, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুজীবন অনুকরণ

(হিমাচল, বুধবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২২শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে মাতঃ আমরা চলিব জ্যোতির সন্তানের ন্যায়। অন্ধকারের পুত্রদের ন্যায় আমরা চলিব না। আমরা চক্ষে দেখিয়া চলিব না, ঠাকুর, আমরা বিশ্বাসে চলিব। হে বিশ্বাসীর ভগবান্, তোমার বিশ্বাসিগণ যেমন আকাশপথে চলেন, আমরাও যেন তেমনি ক'রে চলি। পৃথিবীর মন যোগাইতে আমরা আসি নাই। লোক জনের আমাদিগকে শিখাইবার কি অধিকার আছে? তোমার খাসের প্রজাদের জীবন আর এক রকম, কোন বিঘ্ন বাধাকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যত পৃথিবীর গোলযোগের লোক বুদ্ধিজীবী। আমরা, ঠাকুর, কেন তাদের পথে যা'ব? আমাদের আদেশকর্ত্তা তুমি। লোকে বলে, এ কাজটা করিলে মরিতে হইবে। তাঁহারা যে সংসারের প্রতি কাণা। বিপদই হয়, পৃথিবী উল্টেই যায়, হরি, আমাদের তার জন্য কি? আমরা তাই ভেবে চলিব, যদি একটা কষ্ট আসে? এ সকল দেখা অতি নীচ লোকের কর্ম্ম। তোমার ঈশা, তোমার শ্রীগৌরাঙ্গ এ সকল দিক্ দিয়া যান নাই। তোমার শাক্য একেবারে চোখ বন্ধ ক'রে ফেল্লেন, পাছে এ সকল দেখ্‌তে হয়। ফলাফল চিন্তা তাঁরা কোন কালে করেন নাই। ভগবন্, ইচ্ছা হয়, তেমনি ক'রে মেদিনী কাঁপিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। ভগবানের সর্ব্বনাশ করিব, আর ঘুষ খেয়ে অবিশ্বাসীর নরকে পুড়্‌ব? না। হে পিতঃ, চোখ দু'টো কেবল উপরের দিকে তাকিয়ে থাকুক, কাণ দু'টো উপরের কথা শুনুক। হে পিতঃ, উপরেই থাকি। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষদের জীবন এক, আর এই পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন এক। আমাদের যেন

জ্ঞান উপদেশ দিবার কেউ নাই। আমরা কি এই পৃথিবীর? না। আমাদের চোখ এখানকার জিনিষ দেখ্‌তে পায় না, আমাদের কাণ এখানকার কথা শুন্‌তে পায় না। ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে যদি চামারের মত কার্য্য করি, তখন যেমন হয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে রফা করা ঠিক্ সেই রকম। কাউকে তো ভয় করে না তোমার বিশ্বাসী। সেই অন্ধকার হৃদয়ের ঘরখানি, তার ভিতরে গিয়ে ব'সে বলে, "ভগবন্, বল তো এ বিষয়ে কি করিব?" তুমি ব'লে দিলে, আর বিশ্বাসী খাঁড়া নিয়ে পৃথিবীতে বাহির হইলেন। আমরা চিনি গৌরাঙ্গ শাক্যকে; তাঁ'রা যা' বলিবেন, তাই করিব। পৃথিবীটে কি? ওর পরামর্শ কে চায়? লোক কে? মানুষগুলো কি? কীটের কথা শুন্‌বো আমরা? তোমাকে এমনি যেন বিশ্বাস করি যে, কিছুতেই নড়্ চড়্ হই না। মা আমাকে এইটে কর্‌তে বল্‌তে ব'লেছেন, আমি কি আর সে কথা না শুনে অন্য কাজ করিতে পারি? আমরা কয়টা মানুষ বেঁচে যাই, এমন আশীর্ব্বাদ কর। যাঁদের ভিতর দিয়ে তোমার আদেশ আস্‌ছে, তাঁদের কথাগুলি কাণ পেতে শুনে যাই। বল্‌বার ভার তোমার, কাজ কর্‌বার ভার আমাদের। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি, গলা কাট্‌তে পারি, যত গোঁয়াতুমি কাজ আমাদের। বৃদ্ধ বয়সে মনটা যেন কিছুতে না টলে। পৃথিবী কেবল রফা কর্‌তে বলে। বলে, এই যে তোদের উচ্চ মতটা, একটু কমা। আর কিছু ইচ্ছা হয় না, ঠাকুর, বিশ্বাসে জীবন আরম্ভ করি, বিশ্বাসে শেষ করি। উড়্‌ব আকাশে বিশ্বাসপক্ষ দিয়ে। পৃথিবীর স্কুলে পড়িতে না দেয়, যা'ব মার স্কুলে। পৃথিবী না খেতে দেয়, যা'ব মার ধানের ক্ষেতে। আমাদের আবার ভয় কি? তোমার ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্মের সন্ধি যেন না হয়, এই কর। বিশ্বাসদুর্গের ভিতরে নিরাপদ হ'য়ে ব'সে থাকিব। সত্যের জয় হ'বেই হ'বে। পৃথিবী কিছু কর্ত্তে পার্‌বে না।

সাধু মহাত্মাগণের জীবনের অনুকরণ ক'রে চিরসুখী হ'ব, মা, অনুগ্রহ ক'রে আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বস্বান্ত

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২৩শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেমের সিন্ধো, তুমি প্রবেশ করিবার সময় অতি সূক্ষ্ম, শেষে অতি বৃহৎ। প্রথমে চাও অতি অল্প, শেষে প্রবলরূপে অনেকটা আক্রমণ করিয়া লও। প্রথমে শান্ত, হে ভগবন্, তার পর অত্যন্ত তেজস্বী। প্রথমে যখন ঘরে এস, তখন রাখিলেও রাখিতে পারি, বিদায়ও করিতে পারি ; শেষে আর কিছুতেই বাহির হও না। হাতটান তোমার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, সকল ভক্তই দেখিয়াছেন। জগদীশ, "দাও দাও" ক্রমাগত বলিতেছ কেন? দিলেও নিস্তার নাই, না দিলেও তাই। হৃদয়ের ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে কারবার করা বড় মুস্কিল। একটু আধটু উপাসনা ক'রে যদি মানুষের কাজ চল্‌ত, তা' হ'লে তোমার নববিধানে লোক আর ধর্‌ত না। আজ কাল তোমার তীর্থযাত্রায় লোক বড় কম। তুমি যদি এত বাড়াবাড়ি কর, তা' হ'লে লোক যাও আস্‌ত, এখন তাও আস্‌বে না। আগে তোমার রাস্তায় ঘাস হ'তো না, কেন না এত লোকের ভিড় ; কিন্তু এখন তোমার সদর দরজায় ঘাস হয়েছে। তুমি বল, "আমার যদি দু'টো লোক একেবারে জন্মের মত হ'য়ে যায়, তা' হ'লেই হ'ল।" তুমি তো সংসারে মানুষ নিয়ে বাণিজ্য কত্তে আসনি। তোমার হ'ল কেড়ে নেওয়া ব্যবসায়। একটু যে দেয়, তাহার সর্ব্বস্বান্ত করা হ'ল

তোমার কারবার। তুমি কি আর কারুর কথা শুনবে? পরমেশ্বর, এ স্বভাবে তোমারও সুখ, আমাদেরও সুখ। যে সমস্ত কেড়ে নেয়, তারও সুখ, আর যার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তারও সুখ। পুরো আদায়টি কর। হরি হে, ভগবদ্ভক্ত মন যদি হ'য়ে থাকে, ভাগবতী তনু হয়ে যাক্, পরিবার তোমার হ'য়ে যাক্। তোমার আক্রমণে প'ড়ে আর যেন কিছু বাঁচাবার চেষ্টা না করি, বরং যা আছে, সকল তোমার শ্রীচরণে একেবারে ঢেলে দি। তোমাকে অনেক দিলাম, আমার খানিক রইল, এরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধি যেন না হয়, হে মা, এই আশা ক'রে তোমার শ্রীচরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমবশ্যতা

(হিমাচল, শুক্রবার, ৯ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পরীক্ষিত সখা, তোমার আর ভাবনা কি? এখনও কি তোমার ভয় আছে, পাছে আমরা চলিয়া যাই? তুমি কি মনে কর, একশটা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এখনও আবার, তুমি ভালবাস কি না, তাহার পরীক্ষা দিতে হ'বে? এখনও তোমার প্রেমে অচল বিশ্বাস হ'ল না! অপমান ক'রে, মেরে, আমাদের এখনও মনের সন্দেহ মিট্‌ল না! এত বার মার হাত ধ'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আবার ঘুরে ফিরে এয়েছ। হৃদয়বন্ধো, আর কেন? এত বার পরীক্ষিত হ'য়েও দাঁড়িয়ে আছ? নদীতে জোয়ার এল, আবার ভাঁটা হ'ল। ব্রহ্মপ্রেম যেমন প্রবল, তেমনি, একটুও কমে নি। একা নয়, আমরা দল শুদ্ধ তোমাকে

তাড়িয়েছি, তবুও, দয়াময়; এত অপমান লাঞ্ছনা খেয়ে, চোরের মত, পরিবের মত প্রত্যেক ভক্তের ঘরে প'ড়ে রয়েছ, কিছুতেই বন্ধুতা ক'রতে ছাড় না। মা, দয়াময়ি, ছেলেগুল তোমাকে তাড়িয়ে দিলে, যত তাড়িয়ে দেয়, তত তুমি আরও তাহাকে জড়াইয়া ধর। কত বার অপমান ক'রবে? ও তো মানুষের চামড়া নয় যে আঘাত লাগ্‌বে, ও যে চিন্ময় আত্মা। যত ঠেলি, আরও জোর ক'রে আস্‌ছ, এই পঁচিশ বৎসরের খেলা খুব দেখেছি, ভগবন্‌। এত ঠেলা ঠেলিতেও ব্রহ্ম আমাদের বাড়ী ছাড়লেন না; এবং যাতে আমাদের ভাল হয়, তাই চেষ্টা করছ। তুমি ভক্তের বাড়ী ছাড় না, ছাড়বে না, তার বাড়ী তোমার ভাল লাগে। আমি তোমার বাড়ী কত বার ভেঙে দিলাম, তুমি আপনার পয়সা খরচ ক'রে আবার নূতন পাথরের শক্ত বাড়ী তৈয়ার কল্লে। দু'টো পাঁচটা প্রেম প্রবেশ করিয়ে দিচ্চ; জান যে, শেষে এ সমস্ত তোমারই হ'বে। তোমার মত ভালবাস্‌বার লোক আর কোথাও নাই। মার খেয়েও যে প্রেম দেয়, তার মতন আর কে আছে? এ যে ছাড়বার পাত্র নয়। এ যে আদুরে গোপাল। একে দশ ঘা মারলেও যা, আদর কল্লেও তাই। অপমান-বোধ যদি এর থাকৃবে, তাহা হইলে কি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ হ'ত? আর যেন আমরা তোমায় পরীক্ষা করতে না চাই। রাগিবার লোক তুমি মোটেই নও। ও স্বভাবটা তোমার স্বর্গস্থ ভক্ত সন্তানেরাও পেয়েছেন। কত যে তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ ক'রেছি, ভাবিয়া অনুতাপ করিব, তোমাকে চিরদিন আপনার করিয়া লইব, আর কখনও তোমাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিব না, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন

(হিমাচল, রবিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২৬শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক বিষয়কে মন্দ বলি, যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শত্রু মনে করি। অধিক বয়স আমাদের অপ্রিয়। বার্দ্ধক্য আমাদের মনে অপ্রিয় বস্তু। রোগ আমাদের অসহ্য, ইহাকে আমরা ভালবাসি না। ভগবন্, পৃথিবীর যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার ইহাদিগকে আমরা একেবারে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ। যৌবনের হাসি খুসি ভাল, বার্দ্ধক্য ভাল লাগে না। বসন্তকালের প্রফুল্ল কুসুম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের সৌন্দর্য্যরহিত জগৎ তেমন নয়। আমরা হইয়াছি বিচারক। এটা ভাল, এটা মন্দ বলি ; অথচ জানি, দুইই মার হাত হইতে। উপাসনার সময় ভাল লাগে। অফিসে বড় কষ্ট পেতে হয়। দয়াময়, দেখ, অনেক সত্য দ্রব্য মূর্খের কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাল প্রস্ফুটিত হয়, তখনি বুঝিতে পারা যায়। অমৃতসাগরে যে ভাসে, সে যদি চিৎ হ'য়ে সাঁতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় হ'লে সাম্‌নে লাগে। ভাসা তত সুখ নয়, ডোবা যত। ডুবিব স্বীকার, কিন্তু যদি ভার না পড়ে ? দুঃখের ভার যদি একটা না আসে, তবে কেমনে ডুবিব ? হাসি অন্তরের উপরে, ভিতরে তো নয়। আনন্দময়ি, আমাদের মনে ভার পড়ুক। যত বার্দ্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায়। শুধু চায় কেন ? সেই ভারে ডোবে। হে ভগবন্, ভারের রহস্য কে বুঝে ? রোগে যে আমার সুখ আছে, তাহা কে বুঝে ? যদি একটা রোগ আসে, মুখ ভার হয়, বিরক্ত হই ; বলি,

কুড়ি বছর পূজা করিলাম দুঃখের জন্য, একতারা বাজাইয়া গান করিয়াছি এই জন্য ? দে ভগবতীকে তাড়াইয়া ; কিন্তু, মা, এখন বুঝিতেছি, যাই হোক, তোমার হাতটা মিষ্ট। উহা হইতে যাই আসুক, তাই সুখ। যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। আরোহীর কত সুখ! এ কি মজা, আগে জান্‌তাম না। আগে জান্‌তাম ভাসা মজা, ডুবা দুঃখ। কিন্তু এখন দেখি, মজার তরী মজার সাগরে ডুবেই সুখী। গভীর জলের ভাব কে বুঝে ? উপরে যে থাকে, গভীর জলে মকর কি করে, তা কি সে জানে ? হে ভগবন্‌, দুঃখের ভারে মনটা তোমাতে খুব ডুবে গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারি, ষাট আরও, যৌবনে এ মজা নাই। নীচেই মজা, উপরে গরম ; নীচে এস, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। আর যত বড় মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখা। ঈশা মকর, মুষা মকর। আর উপরে সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাফাচ্চে। এই সকলের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের লোকের দেখা। তাই বলি, মা, এ কি ? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখা হ'ল না ? মা, কল্লে কি, পঞ্চাশ বৎসরেও তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ল না ? হেঁসে বলিলে, "আগে ভার পড়ুক, তবে তো হ'বে।" তাঁরা কি এখানে থাকেন ? গভীর জলে তাঁদের বাস। ভার না হ'লে কি হ'বে ? ভার কে দেবে ? এখন বয়স এলেন ভার নিয়ে, রোগ এলেন খান দশ পাথর নিয়ে, সংসারের পরীক্ষা বিপদ এলেন কতকগুলো পাথর নিয়ে, দিলেন আমার নৌকায় ফেলে। এবার মজা, তরী আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব ডুবিলাম ; প্রেমে, আনন্দে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে মন মজা ক'রে ডুবিতেছে। মা, এ জায়গায় কত মজা ; যত বড় বড় মকর এখানে। আঃ, এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের জলে কি আমার গৌর যাবেন ? ভক্ত-সঙ্গে দেখা লোকের ঐ জন্যই হয় না। গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায় ?

মা, কি আশ্চর্য্য! রোগ, শোক, দুঃখ,—একেও সুখের সোপান ক'রে দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই দুঃখের কারাগার তোমার কর-স্পর্শে সুখের আগার হ'ল। মা, শোকের আগুন অমৃত-সরোবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির সাগরে, প্রেমের সাগরে, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর স্থানে ডুবিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তিনে একত্ব

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৩০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, হে মুক্তিপ্রদাতা, তোমাকে তো চিনিলাম, কিছু কিছু বুঝিলাম। কিন্তু ঐ জীবটা কে? এর নাম কি? কোথায় থাকে? এ আমার কে হয়? একে আমি কি করিব? কেমনে এর সঙ্গে থাকিব? এ সকল জানিলাম না, অথচ জীবনপ্রদীপ প্রায় নিবে এল। ভ্রান্ত সাধকেরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে তোমাকে ভাবে, ভালবাসে; জীবকে তুচ্ছ করে, ভাবে না, প্রেম করে না। খালি তোমাতে স্বর্গ কল্পনা করে; আর জীবেতে নরক কল্পনা করে। তারা তোমায় পায়; কিন্তু ঠিক তোমায় পায় না। তুমি সন্তানকোলে জননী। তোমার ছেলেকে কেটে, তোমার কোল শূন্য করে, তোমাকে নিলে তুমি সন্তুষ্ট নও। তুমি জীবেতে, জীব তোমাতে, কাট্‌ব কাকে? জীবকে কাট্‌তে গেলে তোমার খানিকটা কেটে যায়। জীব তোমা অপেক্ষা শক্ত; তোমাকে বোঝা যায়, জীবকে বোঝা যায় না। একটা শরীরের খোসার ভিতরে

গুপ্ত ব্রহ্মখণ্ড। এটাকে মারি, তাড়াই, না হয় এতে মায়াবদ্ধ হই। জগদীশ, তুমি বল, এ সবই চিত্তবিকার। যে যোগী, সে আমাতে যোগী, জীবে যোগী। ভগবন্, পরস্পরের যোগ হ'ল না? কেবল হরিযোগ? আমরা, ভগবন্, বড় লোক হ'য়ে জীবকে তুচ্ছ করি; তবে, ভগবন্, তুমি চাঁড়ালের ঘরে রাঁধুনি হও কেন? আমরা কি তোমার চেয়ে বড়? তুমি জীবের ঘরে চাকরী কর? তুমি পূর্ণমাত্রায় পার, তুমি পূর্ণ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কেন আধখানা চাকরি করি না? তুমি ছেলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছ, আমি কতকটা মিশি না কেন? জগদীশ, যোগটা কি অপূর্ণ থাকিবে? জীবে, ব্রহ্মে, সাধকে মিশে যায় না কেন? যখন যোগে বস্‌ব, তখন দেখ্‌ব, সমস্ত মানব আমাতে, আর আমি তোমাতে। মা, যখন যোগের সাগরে ডুবিব, তখন একলা ডুবিব না, সকল পৃথিবীকে নিয়ে ডুবব। যদি স্নান কর্‌ব, তবে একলা কেন করিব, মা? সকল বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে ঝুপ ক'রে তোমার প্রেমসরোবরে ঝাঁপ দিব। আঁধার ঘরে চোখ বুঁজে থাকার যোগ আমি মানি না। তার চেয়ে চুপ ক'রে থাক্‌লেই তো হয়, গাঁজা খেয়ে ব'সে থাক্‌লেই তো হয়। স্বপ্নের অবস্থায়, আহা কেমন সুখ! কেমন হরিযোগ! এ কথা বলা আমি চাই না, আমি সত্যযোগ চাই। তোমাতে যখন ডুবিব, দেখিব, বুক ভরা জগৎ। ভাই বন্ধু, স্বদেশ বিদেশ, বন উপবন, শত্রু মিত্র, প্রভু দাস, চিনি যেমন জলে গুলে যায়, আমরা তেমনি ক'রে তোমাতে এক হ'য়ে গিয়াছি। আমি জগৎকে ভালবাসি, কাকেও ছাড়্‌তে পারি না, আমাকেও ছাড়িতে কেহ পারে না। ছোট প্রেম কাহাকেও আমি দিতে পারি না। সকলে বলে, সমগ্র প্রেম নিতে চাই। ভালবাসিয়াছি পরিবারকে, সে বলে, আরও ভালবাস। ভালবাসিয়াছি বন্ধুকে, সে বলে, এতে হয় না। ভালবাসিয়াছি দেশকে, সে বলে, আরও দেশানুরাগ চাই।

কত উপকার ক'রেছি পৃথিবীর, সে বলে, এ হ'লো না। বলে, আমাকে বুক পেতে দে দেখি, আমার সঙ্গে একখানা হ'য়ে যা দেখি। ঠাকুর, তুমি যা বল, তোমার জীবও তাই শিখেছে। সমস্ত চায়। ঘর, বাড়ী, ধন, মান সব চায়। ঠাকুর, আগে তো এ জান্‌তাম না। আগে মনে ক'রেছিলাম, তোমার পায়ে দু'টো ফুল ফেলে দিলে হ'লো ; আদি ব্রাহ্ম-সমাজে এই শিখেছিলাম। এখন অনাদি ব্রাহ্মসমাজে ঢুকে দেখি, এক হ'য়ে যেতে হ'বে। তাও ভাবিলাম, ভগবানের সঙ্গে এক হ'ব, ভালই তো, বড় লোক হ'য়ে যাব। এ আবার তাও নয়, পাপী চণ্ডাল শত্রু মিত্র সবার সঙ্গে এক হইতে হ'বে। ঠাকুর, তবে একটা যোগের সমুদ্র কেটে দাও, তাতে সবাই ডুবি। আমি ডুবি, তুমি ডোব, জীব ডুবুক। তা' না হ'লে তো আর যোগ হয় না। মা, সেই রাগ, সেই হিংসা, সেই প্রতিশোধ-ইচ্ছা এখনও আছে। মা, তোমার বাটীতে এসেও ঐ গোল ? তবে মধ্যে একটা কোথায় গোল আছে। বুঝেছি, গোল কোথায়। জীবতত্ত্ব বইখানা পড়া হয় নাই। সে বইখানা আমাদের স্কুলে ছিল না, অথবা যে শ্রেণীতে ছিল, আমরা তা' ডিঙ্গিয়ে এসেছি, পড়া হয় নাই। এখন উপায় ? এখন তো পণ্ডিতের সর্ব্বনাশ। বইখানা পড়া আগে উচিত ছিল। জীবের গায়ে হাত দিয়ে কেন দেখ্‌লে না, তাতে ব্রহ্মতেজ আছে কি না। ও ঠাকুর, তোমার কাছে যেতে সবাই চায়, বড় মানুষির জন্য। জীবের কাছে কেহ যেতে চায় না। জীবে যদি তোমায় না দেখ্‌লাম, তবে আর হ'লো কি ? নিত্য ব্রহ্ম দেখেও যে সুখ, সাধুতে ব্রহ্ম দেখেও সেই সুখ। মা, জীবের বুকটা চিরে দাও, দেখি, কেমন ক'রে তুমি ব'সে আছ। তার পর তাকে দেখে, খেয়ে হজম ক'রে ফেলি। দয়াময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, জীবে ব্রহ্মে যেন ভেদাভেদ দেখিতে না পাই। মা, আর যেন জীবকে ঘৃণা না করি। মা, তোমাকেও নেব,

তোমার ছেলেকেও নেব। তিন জনে (তোমাতে, জীবেতে, আমাতে) এক হ'য়ে, ভক্তির সহিত তোমার চরণ বন্দনা করিব। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

একত্ব

(হিমাচল, শুক্রবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে বিচারপতি, আমাদের ন্যায় লোকের সামান্য বিচার কখনই হইবে না। আর আমরা যদি দণ্ড পাই, লঘু দণ্ডের প্রত্যাশা করি না। শুনিয়াছি, যাহাদিগকে উচ্চ ভার দিয়াছ, বিশেষ করুণা দেখাইয়াছ, তাহাদের কাছে নাকি খুব উচ্চ জীবন চাও। তা' হ'লে আমাদের বিচার সামান্য অবিশ্বাসীদের ন্যায় তো হ'বে না। ঈশ্বর, কি আর বাকি রাখিলে দিতে ? সংসারের পয়সা পর্য্যন্ত, আর এদিকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ; কি আর বাকি রেখেছ ? কোন্ উপদেশ না দিলে, কোন্ শাস্ত্র না পড়ালে ? হাতে ধ'রেকোন্ মুক্তি না দেখাইলে ? কত সাধাসাধি করিলে ; নাথ, আমাদের ওজর আর নাই। আমরা যোগী হইলাম না, ভক্ত হইলাম না, এ কথা সামান্য শৃগাল কুকুরও শুনিবে না। বড় শক্ত আইন আমাদের সম্বন্ধে ! খুনী লোকেদের যে দণ্ড হয়, আমাদের, বোধ হয়, তাই হ'বে। কুড়ি বৎসর শুন্‌ছি, দৃষ্টান্তের বাকি নাই ; যেন চাঁদের হাট আমাদের ঘরে। একেবারে ওজর কর্‌বার মুখ তো বন্ধ হইল। হরি হে, তোমার সঙ্গে এক হ'য়ে যাবার যে কথা ছিল, হ'ল না। পাপ, অবিশ্বাস প্রতিবন্ধক হ'ল। শত্রু যদি আমাদের পদাঘাত করে, আমরা তাহার পদচুম্বন করিতে পারি না। তোমাকে বলি, হরি, এ কে পারে ? ওজর খাটিবে

না। ক্ষমার নীতি ক্রমাগত শুনিতেছি, কিছু হ'ল না। তবে কি আমরা ভয়ানক নরকের জন্য রহিলাম? হরি, এখনও যে সময় আছে। একেবারে যোগে তোমার সঙ্গে লীন হ'য়ে যাই। আর কিছু চাই না। যেমন গুরু পাপ করেছি, তেমনি গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত। একেবারে তোমার মধ্যে চুপ ক'রে ডুবে যাব। মরে গিয়ে পিতার স্বভাবে এক হ'য়ে যাওয়া এ কি ও পাড়ার অবিশ্বাসীরা দেখাবে? না, তুমি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য আমাদের অনুরুদ্ধ ক'রেছ। কতকগুলো মুটে মজুর যোগী হ'বে, আমরা কি দু'টো গান গেয়ে চুপ করব? যেমন নরহত্যা ক'রেছি, নববিধানকে অবিশ্বাস ক'রে অপমান ক'রেছি, তেমনি একটা ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যোগে লীন হ'য়ে যাই। আমার চোখ তোমার চোখ হ'য়ে চারিদিকে তোমাকে দেখিবে। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ হ'য়ে হরি হরি বলিবে। কোন্ লক্ষ্মী ছাড়া আর স্বতন্ত্র থাকিবে, এই গালাগালি দিয়ে, এখন হইতে নূতন পথ ধরিতে হইবে। একেবারে নিজের আমিত্বকে শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। একটি দল তৈয়ার কর, যাহাদের প্রত্যেকের 'আমি' তুমি হ'বে। দেখে পৃথিবীর আশা হ'বে। আমরা সামান্য দুর্গন্ধ সাধন ল'য়ে ব'সে আছি, আমিটাকে ভোজবাজীর খেলার মত উড়িয়ে দাও। দেখি যে. আমি নাই, কেবল চারিদিকে হরি। যে ঝগড়া করবে, যে কামী হ'বে, সে আর নাই। ভয়ানক বিচারে বিচারিত হ'ব ব'লে এই বার প্রায়শ্চিত্ত করি। এই আশীর্ব্বাদ কর যে, ছোট খাট কাজেতে সময় নষ্ট না করি, ভয়ানক বিচারের সময় আস্‌ছে দেখে, একেবারে তোমার ভিতরে প্রাণকে ঢেলে দিয়ে, তোমার সঙ্গে একেবারে চিরজন্মের মত লীন হ'য়ে যাই। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পৃথিবী অধিকার

(হিমাচল, শনিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সন্তান তোমার প্রতিনিধি-রূপে পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ করিবে। বাস্তবিক, হরি, আমাদিগের লোভ ঐ দিকে। আমরা যে তোমার ছেলে হইয়া বাতাস খাইব, তাহা নহে। খুব খাইব, খুব পাইব, খুব সুখভোগ করিব। তবে কি না, পৃথিবীর খড় বিচালী—যাহাকে লোকে টাকা বলে, তাহা চাই না। মন যায় আসল খাঁটি টাকাতে। আমরা যে প্রবঞ্চিত হইব, তাহা, ঠাকুর, আমাদের সাধন ভজনের উদ্দেশ্য নয়। এই পৃথিবীকে তুমি রাখিয়া দিয়াছ যে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত হইলে ইহার অধিকারী হইবে। হে শ্রীহরি, মনে জানা চাই যে, পৃথিবী আমার হস্তে, দানপত্রটী সই হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্য্যন্ত আমাদের হইয়া যাইবে। সত্যে মিলন, প্রেমে মিলন। শত্রুরা তো কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। হউক না মস্ত নুণের ঢিপি, এক বার জল যখন ঢুকিয়াছে উহার ভিতরে, সমস্ত ধশিয়া যাইবে। যে সুধা পাঠাইয়াছ, যে অমিয় মাখাইয়া প্রেম পাঠাইয়াছ, তাহা পৃথিবী অবিশ্বাস করিলেও পান করিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে বড় বাধা, হরিনাম আস্তে আস্তে চোরের মত সেখানে প্রবেশ করিয়াছে। লোকে বলিবে, লড়াই হইল না, আপনাদের লোক ভাল হইল না। ও দিকে আস্তে আস্তে মা আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। বুঝেছি, পিতঃ, পৃথিবী আমার, আমাদের। আমরা পৃথিবীকে সম্বল করিব আর বলিব,

সমস্ত জগৎ সংসার নববিধানের হইয়া গিয়াছে। একটা তো গ্রামের কথা হইতেছে না, পৃথিবীকে, মা, তুমি দিয়াছ। পাশে পাড়ার লোক গোল করিয়া অধর্ম্ম করিবে, তাহাতে কি? তুমি পৃথিবীকে দিয়াছ। জগাই মাধাই সমস্ত হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা অনুতাপ করিতেছে। আর দিন কতক দেরি। যখন কেল্লা মার দিয়া বলিয়া হুঙ্কার করিব, তখন আর তো চাপা থাকিবে না কিছু। যখন আকাশে উড়িবে বিশ্বাসী হনুমান, তখন পৃথিবী জানিবে যে, রাবণ বধ হইবে, সীতা উদ্ধার হইবে। দেবি, হৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিয়া দাও। দখলের দিন আসিবে যখন, তখন সত্যের জয়, ভক্তের জয় দেখিয়া যাইব। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে দখলের হুকুম। পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তোমার নিকট দাঁড়াইব, আর সমস্ত পৃথিবীকে তুমি বলিবে, যা, দখলের হুকুম দিলাম। টাকা কড়ীর জন্য আসি নাই। শূন্য মান লইবার জন্য আসি নাই। আসিয়াছিলাম বড় আশা করিয়া যে, বড় লোকের সন্তান হইয়া বড় একটা বিষয় লাভ করিব—ঠিক হইয়াছে। খুব বড় বিষয় লওয়া যাইতেছে। এই দেখিব যে, যাহা চাই নাই, তাহা পাইলাম না; কিন্তু পৃথিবীর লোক লইয়া নববিধানে ঢুকিব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবস্বরাদান

(হিমাচল, রবিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে শুভসমাচারদাতা, সময় আসিয়াছে যখন, তোমার কথা আর গোপন করা যায় না ; করা উচিতও নহে। নববিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াইতে হইবে। ভগবানের একতারা বাক্স মধ্যে ছিল, এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে। ঠাকুর, ছিল অস্ত্র খাপের মধ্যে, এখন বাহির করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। তোমার নিদ্রিত অলস ভৃত্যদিগকে একবার আদেশে সঞ্জীবিত কর। এখন সময় আসিয়াছে যখন, আপনি মাতিয়া পরকে মাতাইব। এই সেই শুভ দিন, এখন আপনি রোগমুক্ত হইয়া পরকে রোগমুক্ত করিব। যাহা দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাকা যায় না। কাপড় পুড়িল। আর মন চাপা দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত জায়গায় আগুন দেখা দিয়াছে। জ্বলিল বনে, চারি দিকে প্রেমবহ্নি পাপ ধ্বংস করিল। যাহা দেখিয়াছি, তাহা তো এখনও বাহির হইল না। তবে পৃথিবী আসিবে কেন ? ভাল জিনিষ খাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। সামান্য ধর্ম্মের কথা গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি। জলমাখা ক্ষীর সকলের পাতে দিয়াছি। আসল ছাড়িয়া এখনও ভঙ্গিমা ! মা, পৃথিবীর সুরে গান গাইয়াছি। বৈকুণ্ঠের সুর তো পৃথিবীতে বলি নাই। ভিতরে যে রূপ দেখেছি, সে রূপ কে বলিয়াছে, কোন্ কবি বর্ণনা করিয়াছে ? দয়াময়, তোমার বাহিরের ঘরেই যাহা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ টের পায় না। সেইটা পাইলেই সকলেই মরিবে। সে ভয়ানক কথা। মারামারি কাটাকাটি ; ভক্তির লড়ায়ে দশ হাজার মরিয়াছে। প্রেমের

যুদ্ধে পাঁচ হাজার জখম। আজ যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে নির্ব্বাণ। কেবল মারামারি। এই সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার। মা, এ কথা শুনাইলে, পৃথিবী তো পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরিনামের আসল গুণ, যাহা ভক্তেরা কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন, তাহা যদি বলা যায়, কোন্ হত-ভাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে? যাইতেই হইবে। একটা উৎসবে একবার মোহর ছড়াতে ইচ্ছা। তাহা হইলে সাধ মেটে। দেখি, রাজা বড়, কি আমি বড়। জোলো ক্ষীর সকলেই খাইয়াছে; একবার ভাল হাঁড়ির ক্ষীর খাওয়াইতে ইচ্ছা। জোলো মদ অনেকে খাইয়াছে; একবার ইচ্ছা, নববিধানের সুরা খাওয়াই, তাহা হইলে সব যেখানকার সেইখানেই থাকিবে। যে আফিসে কাজ করে, তাহার আর উঠিতে হইবে না, আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। অনেক ভক্তির কথা, মা, বলা গেল, তবু ইহারা মানুষের মত। একবার হনুমানের মত ভক্ত হয়, তবে দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, রাক্ষস জয় করে, সতীত্ব-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করে। তবে জানিব, গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে। মা, তোমার প্রকৃত ভাগবত এখনও চাপা আছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ছাড়া কি আর নাই? বুকের ভিতর কি কথা গুর্ গুর্ করে না? তবে, মা, আর কেন চাপি? সময় আসিয়া থাকে তো, মা, অনুমতি দাও, ঢাক বাজাইয়া বলি। শুনিতেও সুখ, বলিতেও সুখ। রহস্য বড় মজার জিনিষ। দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গূঢ় কথা বাহির হউক। জগৎ নির্ব্বোধ বোকা, অবাক্ হইয়া শুনিবে। বলিবে, ওমা, এত কথাও ছিল! মা, নববিধান নাম হইয়াছে, নূতন কথা তো বলা হয় না, তাই নূতন নূতন করিয়া জগৎ চেঁচাইতেছে। বলে, ও সুরা খাইয়াছি, ও পুকুরে স্নান করিয়াছি। একবার, মা, নূতন ভাণ্ডার খোল। যে যেখানে আছে, অবাক্ হইয়া সেইখানে থাকুক। একবার যাদুটা খুলে দাও, লোকগুলকে

ভড়ুকে দিই। মা, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন বৃথা দিন না কাটাই। তোমায় গভীর কথা বলি, দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট ভক্তিতে মত্ত থাকিব না। গভীর কথাগুল শুনিব, শুনাইব। আপনারাও তরিয়া যাইব, পরকেও তরাইব, মা, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা

(হিমাচল, সোমবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে পরিত্রাতা, যত দিন যায়, শুনিয়াছি, ততই তুমি উজ্জ্বল হও, নিকটস্থ হও ; মানুষ অস্পষ্ট ও দূরস্থ হয়। যত বয়স বাড়ে, তত নাকি তুমি নিকটস্থ হইয়া সর্ব্বস্ব হও। ক্রমে ক্রমে তবে মানুষদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। যোগেশ্বর, যোগগৃহে আর কাহার সঙ্গে দেখা হইবে? যাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সাধন করিয়াছি, তাহারা প্রথম অবস্থায় খুব উজ্জ্বল ছিল। যখন সময় আসিল, তাহারা মানিল না, চাহিল না। আপনার আপনার বুদ্ধি অনুসারে সাধনের পথ ধরিল, আপন আপন স্থানে স্বতন্ত্র হইয়া বসিল। মানুষ মনে করে, কার্য্যে শরীর থাকিলেই দেখা যায়। কিন্তু, তবে মনুষ্যের নৈকট্য অস্বীকার করিতে হইতেছে কেন? চক্ষু খুলিয়া দেখি, সকলে গিয়াছে, ভগবান্ কেবল কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই ছিল এত লোক, সকলেই সরিয়া গেল! প্রিয় পরমেশ্বর, এই যে মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা এক তোমার অদ্ভুত খেলা। এই যে, লোকে বলে, তোমার সম্মুখে

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রহিয়াছে, দেখিতেছ না? কৈ? এক এক বার একটু ঝাপসা দেখি, আবার অন্ধকার। সত্যের পথে, পুণ্যের পথে, বন্ধুতার পথে কেহ নাই। তবে কোথায় আছে? তবুও মানুষ বলে, দেখিতেছিস্ না? চক্ষু খুলিয়া দেখ্। আবার চক্ষু খুলি, মনে করি, চক্ষুর দোষ; হাত দিয়া দেখি, কোথাও কেহ নাই। এই এক বিষম কথা এল। থাকিয়াও নাই। এই নৌকা কয়খানা এক সঙ্গে যাইতেছিল, কত আমোদ করিতাম, কোথায় সব রহিল পড়িয়া? পেছন দিকে দেখি, ভোঁ ভাঁ, একখানাও নাই। আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তাহারা কিসে আছে? যে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ, তাহাও উড়িয়া গিয়াছে। দয়াল, কাটিব তবে বন্ধন, নৌকা ছাড়িব। পেছিয়ে না গেলে তো মিলন হয় না। এখানে যে টান্, চুপ ক'রে ব'সে থাকিলেও নৌকা এমনি জোরে যাইতেছে যে, বাঁধিয়া রাখিবার যো নাই। এখানে যে ভয়ানক জলের বেগ! নিশ্চয়ই তাহারা ঘুমাইতেছে। মনে করিয়াছে, অনেক দূর নৌকা আনিয়াছি, এই তো ঘাট। ঘুমাইয়া পড়িল। কেহ কেহ ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কেহ পেছিয়ে গিয়াছে। এখন দুই তিন মাসের পথ এক দিনে না গেলে তো উপায় নাই। ঠাকুর, জোর কৈ? বিশ্বাসের জোর কৈ? প্রেমের জোর কৈ? তাহাই ভাবিতেছি, তবে ইহলোকে বুঝি এই পর্য্যন্ত। দেখা শুনার কি উপায় নাই? শরীর তো দেখিতে পাইতেছি না। যোগীরা কি—কে গায়ে হাত বুলাইতেছে, দেখিতে পায়? কেবল পশুরা পায়। তাহাদের চক্ষু আছে। আমরা আগে যখন পশু ছিলাম, বুঝিতে পারিতাম। যখন কলিকাতা ছাড়া গেল, তখনি তো ফাঁক। তখন তো কেহ লইল না, কেহ তো কাঁদিল না, কেহ তো বলিল না যে—থাকিতে পারি না। তখনি তো তাহারা নৌকা তফাৎ করিল।

কে আর ইচ্ছা করিয়া ছাড়ে আপনার লোককে? আমি কি করিব? এ ভয়ানক শতদ্রু-স্রোত, পাহাড়ে নদী, এখানে কি আটকান যায়? সকলকে কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে কাছে, সে কাছে নয়। যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব, সেই কাছে। শরীরের মিলন কাটিয়া গেল। এখন সূক্ষ্ম চক্ষে সূক্ষ্ম আত্মা দেখি। কে বা আছে, সকলে ছাড়িল। ইচ্ছা ক'রে যে বিদায় দেয়, সে ইচ্ছা ক'রে আসিবে কেন? সকল ক্ষতি পূরণ হয় তোমাতে, ভগবন্। কাছে থাকাকে আর কাছে থাকা মনে করিব না। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন, সেই মিলন। তোমার চরণে যে দেখা, সেই দেখাই আমাদের হয়। সচ্চিদানন্দের যে ভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে এক হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমিত্ববিনাশ

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক;
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, সংসারীর রাজ্য যেমন এখানে, আমাদের রাজ্য তেমনি যোগ-জগতে। তাহাদের একটা পৃথিবী, আর আমাদের আর একটা পৃথিবী। ও পৃথিবীর সঙ্গে, হায়, এ পৃথিবী মিলে না। সংসারে এক জন কর্ত্তা, আমাদের জগতেও এক জন কর্ত্তা। ইহাতেই মিলে। কিন্তু ওখানকার কর্ত্তা আমি, আর এখানকার কর্ত্তা তুমি। যখন তুমি মানুষের হাতে পড়, তখন তোমার প্রভুত্ব থাকে না।

সে আপনি টাকা আনে, পরোপকার করে, ধর্ম্ম সাধন করে, আবার মরিবার পর কীর্ত্তি রাখিয়া যায়। মানুষের কি ক্ষমতা, আপনি সংসারের কর্ত্তা হইয়া কত বুদ্ধি করে, কৌশল করে! আমাদের যোগধামে একটি কর্ত্তা। আগে 'আমি আমি' এই বলিয়া মানুষ-পশু চেঁচাইত, আর এখন, ভগবন্. 'তুমি তুমি' বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করে। এখানে 'আমি' না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে কিছু সুখ নাই। উহারা যেমন ঈশ্বরকে মারিয়া মানুষকে একাধিপতি করে, আমরা তেমনি তোমার প্রসাদে আমিকে মারিয়া তোমার একাধিপত্য স্থাপন করি। যদিও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা, তবুও যোগের শুভ দুই প্রহর হইবা মাত্র দুই কাঁটা এক হইয়া যায়। তোমার ইচ্ছা আমার বুকের ভিতর আসিয়া ধড়্ফড়্ করে। তোমার বলবীর্য্য উদ্যম উৎসাহ আমার ভগ্ন দেহে প্রবেশ করিয়া, নির্জীব-জীবকে সতেজ করে। কাজ করিতেছ তুমি, আমি কেবল ধামাধরা। আমার পাপ কি? 'আমি' বলা। যাই বলি, ঠাকুর, রোগ হইয়াছে, মনে শান্তি নাই, সুখ নাই এক দিনের জন্য, ঠাকুর, আরাম হই, অমনি যত যোগী আসিয়া বলেন, বলিলি কি, আত্মহত্যা করেছিস্? হে হরি, তুমি শক্তি, তুমি বল, তুমি বন্ধু, তুমি রক্ত, তুমি নিশ্বাস, তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম। আমি একটুও নই। ও শব্দ যোগীর অভিধানে নাই। এই জন্য এখন জপ করিতেছি, মা, তুমি ধন্য, তুমি সর্ব্বস্ব, তুমি মূলাধার। পাছে পাপেতে পুড়িয়া যায়, বাড়ীর দিকে চোখ ফেরা ছিল, বলি, আঁখি-অঞ্জনের দিকে চেয়ে থাক্। সংসারের রাজ্যে দুই পাঁচটা মানুষ খুন করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার 'আমি' বলিলে মহা অন্যায়। আর রসনাটা অনেক দিন না বলিয়া, 'আমি' কথাটা যেন ভুলিয়া গিয়াছে। যখন তোমা বই আর জানি না, তোমা বই আর চিনি না, তোমা ছাড়া আর কিছুতে আসক্ত হই না, যখন তোমা ছাড়া কিছু ভালবাসি না,

তখন যোগীদের বড় আহ্লাদ হয়। ওঁদের রাজ্যে আর এক জন আসিল, সে হরি বই আর কিছু জানে না। যার খুব আত্মগ্লানি, সেই তো যোগী। আর যে ধার্ম্মিক হইয়া বলে, তুমি আমি, আমি তুমি, সে যে অর্দ্ধেক দিন, অর্দ্ধেক রাত্রি। তাহার উপরটা দেবতা, নীচেটা পশু। যাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে, যেখানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, আমিটাকে পুড়াইয়া দিব, এই কর। এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তোমার ভিতর বিলীন করিয়া দাও। তুমি তুমি, তুমি তুমি, এই সুরে একতারা বাজাইয়া সুখী হইব। এত দিন যে আপনার পূজা করিয়াছি, আর করিব না। আর আপনাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিব না। এবারে মাকে সিংহাসনে বসাইয়া, আমিটাকে বলিদান দিয়া. একেবারে চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে এক হইয়া গিয়া, তোমার দেবত্বের সঙ্গে আমার মনুষ্যত্বের মিলন করিয়া, চিরসুখে সুখী হইব, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিরনূতন

(হিমাচল, বুধবার, ২১শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে সুন্দর দেবতা, তোমার লোকদের পদে পদে বিপদ, কিংবা পদে পদে সম্পদ। হয় খুব বিঘ্ন বাধা, নয় খুব সুখ শান্তি। বিপদ ভারী, কেন না তোমাকে সুন্দর বলিয়া জানিলেও সুখ নাই। একটি ছেলে পুতুল কিনিয়াছিল, খুব সুন্দর, তাহাকে লইয়া শুইত, বুকে বাঁধিয়া থাকিত। দিন গেল, রংও গেল, সুবর্ণ পুতুল বিবর্ণ হইল। সেই পুতুল নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল, আর তাহাতে মায়া রহিল না, ভুলিয়া গেল।

দয়াময়, বালকের স্বভাব আমাদের ভিতরেও আছে। নূতন জিনিষ লইয়া আমরাও সুখী হইলাম, আদর করিয়া মাথায় রাখিলাম ; কিন্তু তোমাকে ও তোমার ধর্ম্মকে তিন দিন পরে ময়লা হাতের ঘর্ষণে মলিন করিলাম। পৃথিবীর ধূলিতে সুন্দর হরি কদাকার হইলেন, সুন্দর বিধান কুৎসিত হইল। সুন্দর পাইলেও নিস্তার নাই। রাখিবে সুন্দর কি করিয়া। আর ক্রমাগত তুমি বলিতেছ, "হরিভক্ত যে, সে নবানুরাগী না হইলে কি করিয়া থাকিবে ?" চির নবীন হরি যে কি, সেইটি তোমার ভক্তদের দেখাইবার বাকি আছে। নিত্য লাবণ্য কদাকার হইতে জানে না। ক্রমে ভিতরে রং ফুটিতেছে। উপর হইতে পৃথিবী কত ময়লা ফেলিবে, কত ধূলা পড়িবে ? যখন একবার ভালবাসিয়াছি তোমাকে নূতন বলিয়া, তখন রোজ রোজ নূতনত্ব তোমা থেকে বাহির করিব। যথার্থ বিশ্বাসীর রত্ন কি কখন ময়লা হয় ? লউক্ পৃথিবী যাচাইয়া আমার হরি, যদি এক দিন পুরাণ হয়, তবে ফেলিয়া দিব। আমি খাইলাম দুইটার সময়, দেখি পুষ্ট ও সুখী, হরিকেও দেখিলাম, পুষ্ট ও সুখী। কিন্তু যখন আমি শুকাইয়া গিয়াছি, তখন দেখি, তুমিও মলিন। এরূপ মন গড়া হরি চাই না। যাও, ভক্তচিত্তবিনোদন, এমন এক জমকাল রূপ ধরিয়া এস যে, দেখে একেবারে ভক্তি উথলিয়া উঠে। হরি, তুমি চলিয়া যাও, নূতন পোষাক পরিয়া এস। মার আমার কাপড়ের অভাব ? মা কেবল ছলিতে আসেন। পুরাণ ব্রাহ্মদের ঠকাতে আসেন। তাহাদের সম্মুখে মা এক মাস এক কাপড় পরিয়া এলেন, তবুও তাহারা ধরিতে পারিল না। আমরা চতুর ভক্ত, আমরা চতুর ভক্ত, আমাদের কাছে তো তাহা চলিবে না। রোজ রোজ নূতন বেশ। কল্য যাহা দেখিয়াছি, আজ তাহা নয়। তোমার চরণকমল, কমলটাও কি পচিয়া যায় ? তবে কি তোমার চরণকে পুরাতন হইতে দাও ? না, রোজ নূতন কমল। দেবতা

যাহার নবীন, তাহার মনটাও নবীন। অতএব নূতনে নূতনে কর হে যোগ, নিত্য নূতন হরি। নূতন ভাবে পূজা গ্রহণ কর, নূতন ভাবে আমি পূজা করি। আর পুরাতন হইব না, পুরাতন পাপের পথে যাইব না। রোজ নূতন ভক্তি, নূতন পূজা। পুরাতন জিনিষ পত্র যাহা আছে, সমুদয় পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রাস্তায় যাইব। পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে নূতন হইব, যোগনয়নে রোজ মার মুখ নূতন, চরণ নূতন দেখিয়া, স্বর্গের নূতন পুণ্য, নূতন শান্তি চিরদিন সম্ভোগ করিব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গের চাবি

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গরাজ, স্বর্গ পাওয়া এখন ঘটুক আর নাই ঘটুক, স্বর্গের চাবি হাতে দাও। দীনবন্ধো, জীবের প্রতি যদি তোমার এত দয়া, তবে তুমি স্বর্গের চাবিটি ভক্তহস্তে ন্যস্ত কর। চাবি হইলেই তো স্বর্গ। পথ জানা হইলেই তো গম্য স্থানে গমন। সন্ধান বলিয়া দাও, হরি, এ সংসার ভিতরে বৈকুণ্ঠ কোথায়। প্রাণস্বরূপ, সন্ধান যে সাধক পাইয়াছে, সে সাধু হরিকে পাইয়াছে। পৃথিবী ছাড়িয়া নির্জ্জনে তোমাকে লইয়া থাকিতে হইবে, তাহা তো তুমি চাও না। মুটোর ভিতরে স্বর্গধাম। মা, তোমার মুখ খুব পাতলা কাপড়ে ঢাকা, ঐটির নাম অবগুণ্ঠন। সন্ধান জানিলে কিছুতেই, মা, আট্‌কায় না। আর যতক্ষণ সাধক সন্ধান না পায়, হরি পাশে থাকিলেও, সে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হরির ঘর কোথায়?

সন্ধান জানে না, সুতরাং অন্ধ। সাম্‌নে সিন্ধুক, কোটী টাকার রত্ন তাহার ভিতর, কাঁদিতেছে, বলে, রত্ন কোথায়? সন্ধানবিশিষ্ট চতুর ভক্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে বলিতেছে, "মার সঙ্গে ইহার দেখা নাই, এ যোগও করে না।" সাধকের হাতে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি রহিয়াছে, উনি জানিতেছেন, এখনি খুলিব, খাইব, বিলাইব। উনি জানেন, মা পাশে, ঘোম্‌টা খুলিব, আর মার মুখ দেখিব। কেবলই যে টাকার বাক্স খুলিয়া নাড়া চাড়া করিতে হইবে, তাহা তো নয়, সন্ধান জানিলেই হইল। যখন দরকার, তখনই খুলিতে হইবে। ভাবুকেরা বুঝিতে পারে, কেন প্রার্থনা সিদ্ধ হয় না। ও যে ভুল ডাকঘরে যায়, উহারা তো সন্ধান জানে না। গরিব ছেলে মা বাপকে 'ব্যারিং'এ যে চিঠি দয়; ঠিকানা ঠিক হইলেই হইল। জগদীশ, চতুর ভক্ত ঠিকানাটিতে ঠিক লেখেন। ছেঁড়া কাগজে, কালি নাই, কেবল "প্রাণেশ, বৈকুণ্ঠধাম" লিখিয়াই চিঠি পাঠাইতেছেন। কোন্ দিকে চিঠি পাঠাইতেছি, কোন্ ডাকঘরে দিতেছি? এত টাকা দিয়া পাঠাইতেছি, একখানাও মার কাছে পৌঁছিল না? এই ডালিয়া ফুলের এই পাপ্‌ড়িটী খুলিলেই দেখি মার চরণ। মা, সন্ধান জানা চাই। হাজার লোকে বলুক, ঐ ছোঁড়া সাধনও করে না, পয়সা দিয়া একখানা চিঠিও পাঠায় না। আমি, মা, হাসিতেছি। ধন্য পিটর, যাহার হাতে স্বর্গের চাবি। অতএব আমাদের সমুদয় প্রার্থনার শেষ ফল এই হয় যে, স্বর্গের চাবির অধিকারী যেন হই। তোমার চরণতলে পড়িয়া, স্বর্গের চাবিটি হস্তে ক'রে, তোমার পবিত্র দর্শনের যে সঙ্কেত, জানিয়া গট্ হইয়া বসিয়া থাকি। আর কাণার মত এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিব না। এবার চাবিটি তোমার কাছ থেকে আদায় করিয়া, সমুদয় স্বর্গকে দখল করিয়া, নিশ্চিন্ত ও শুদ্ধ হইব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সংসারে যোগ

(হিমাচল, শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, আমরা তো মরিব না, আমরা বাঁচিব। আমরা ঘর ছাড়িয়া শ্মশানে যাইব না, আমাদের এই আশা, ঠাকুর। যাইব কোথা? ধ্বংস হইব কেন? ঘর পাইব, সংসার পাইব, সুখী হইব। প্রেমস্বরূপ হরি, তুমি আমাদিগকে কেবল একবার নবজীবন দিয়া জীবিত করিয়া লইবে। ভাঙ্গা বাড়ী ফেলিয়া নূতন বাড়ী দিবে। শুক্‌ন ফুল ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুলের মালা গলায় দিবে, নিরীশ্বর বস্তু সকল যে সংসারে, সমুদয় টানিয়া ফেলিয়া দিবে। হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, তখন আর সংসার ছুঁইতে হইবে না, যে বস্তু ছুঁই. সে তোমার। এ বিধানে একটি খড়্‌কে ব্রহ্মময়। যত সামগ্রী দেবস্পর্শে শুদ্ধ। হে দয়াল হরি, তুমি নিজে যে সংসার গুছাইয়া দাও, তাহাতে আমাদিগকে রাখিতে চাও। আর এ জঞ্জালময় সংসারে রাখিতে তুমি ইচ্ছা কর না। একটি সোণার বাড়ী করিয়া দিবে। তোমার স্পর্শে সমুদয় হইবে শুদ্ধ। কি যে সে জীবন, তাহা পৃথিবী এখনও দেখে নাই—যেখানে হাঁড়ীর ভিতর ব্রহ্ম, যেখানে তেল ঘি পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়, সে সংসার কেহ দেখে নাই। বৈকুণ্ঠের সংসার একটি এইরূপ আছে। নূতন বস্তুতে পরিশোভিত সেই সংসারটি যত্ন করিয়া রাখিয়াছ, নানা রকম ধন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, নববিধানের লোকগুল আসিবে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছ। প্রাতঃকাল থেকে খাইতেছি, রাত্রিতে শুইবার সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু ধরিতেছি, ছুঁইতেছি, সব ব্রহ্মময়। হে প্রাণেশ্বর, এ বৈকুণ্ঠ অনেক দূর। পাহাড়ের জঙ্গলের যে বৈকুণ্ঠ, সে তো কাছে, পাইলাম বলিয়া। সে বৈকুণ্ঠ অনেক দূর। যেটা ছুঁইতে

যাইতেছি, যেন ধাক্কা খাইতেছি। যে ঘরে ঢুকিতেছি, ধক্ ধক্ করিতেছে আলোতে, ঝাঁট দিতে যাইব, হরি অমনি ডান হাতটি ধরিয়া, আমার হাতের মধ্যে দিয়ে তাঁহার হাতটা চালাইয়া দিতেছেন। যখন এই রকমে সংসার হরিময় হইয়া যাইবে, তখন, আমাদের জন্য কিরূপ বৈকুণ্ঠ সাজাইয়া রাখিয়াছ, জানিতে পারিব। যখন আলো করিয়া সংসারে দাঁড়াইবে, তখন তোমাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিব। সে ভক্তি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল দিন আসিলে, সেই সুখের সংসারে বসিয়া কেবল হরিরূপ দেখিব। যেন সংসারেও থাকি না, আর সংসার ছাড়িয়া বনেও যাই না। অথচ তোমার সংসারে থাকিয়া, পূর্ণ যোগানন্দে মগ্ন হইয়া, সংসারের প্রত্যেক জিনিষে তোমাকে দেখি, কেবল চারিদিকে ছোট ছোট হরিখণ্ড দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পালোয়ানী

(হিমাচল, শনিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে আদরের বস্তু, হে মনের প্রিয়, যখন আমরা ভক্তদল হইয়াছি, তখন ভক্তদলের লক্ষণ দেখান চাই। 'চাই বৈ কি', ঠাকুর, সকলেই বলেন ; কৈ, চান না তো ? তাঁহারা বলেন, একত্রে পূজা করি, মাঝে মাঝে সৎপ্রসঙ্গ করি, আর সকলে মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করি। তাহা ঠিক। উপাসনা একত্রে হয়, তোমার কথাও হয়। কিন্তু আদরের হরির কি সাধ মিটিল ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এমনি ক'রে তোমাকে আদর করিলে, তুমি আদৃত মনে কর কি না ? তুমি যখন

মাথা নাড়িয়া বলিবে, তখন বিশ্বাস করিয়া বলিব, নাথ, কিসে তোমার আহ্লাদ হয়? যখন ভক্তগণ দৌড়াদৌড়ী করেন, বলেন, কে মাকে ভাল জিনিষ আগে আনিয়া দিতে পারে? যখন ভক্তদের মধ্যে এইরূপ কথা হয়, "প্রেমের কুস্তিতে তুই জোয়ান, কি আমি জোয়ান, আয়, দেখি।" মা, যখন তোমার ছেলেগুল এইরূপে হুড়াহুড়ী করে, তখন তুমি, স্বর্গলক্ষ্মি, স্বর্গ থেকে বল যে, এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। তুমি চাও, অষ্ট প্রহর এই ছোঁড়াগুল এইরূপে আমোদে মাকে খুসী করে। ও ছোঁড়াটা একবার মার ঘোমটা খুলে হেসে কুটীকুটী; আর একটা পনের বার দেখিয়া তার পর হাসে। তুমি এইরূপ আমোদে বড় সুখী হও। ভাবুকের ভাব আর কত বলিব। যাহাতে তোমার সাধ মিটে, তাহাই করিতে দাও। যখন পাঁচ জনে বসিবে, তখন যেন মাকে লইয়া পূজা করে। কে কাহাকে জিতিতে পারে, প্রেমে ভক্তিতে কে কাহাকে জেতে, এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিব। মা-তে মত্ত হইয়া যাইব. এইরূপ আসল খেলা হউক। তোমার পালোয়ানদের মধ্যে সেই সেরা পালোয়ান, যে ক্ষমা করে, যে মা-তে একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে, সেই সকল পালোয়ান-দের বাহির কর। রোজ রোজ ধূলা মাখিয়া, মাটি মাখিয়া তৈয়ার হউক। কুস্তি দেখিয়া লোক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। হে নাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, অন্য বিষয়ে বড় হইব, এ কামনা ত্যাগ করিয়া, মার প্রেমে বড় হইব, মাকে লইয়া বড় হইব, এই কর। বৃথা অহঙ্কার দুর করিয়া ফেলিয়া দিব, মার কথায় নত হইব, মার ভাত খাইয়া বড় হইব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুণ্যে একত্ব

(হিমাচল, সোমবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক,
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে পুণ্যময়, জীব যখন তোমার নিকট ভিক্ষা চায়, সে যেন অসার বস্তু না চায়। তোমার সঙ্গে যদি কেবল ভালবাসার মিল হয়, আমি তাহাকে যথেষ্ট মনে করি না। হে দীনবন্ধো, যদি বিশ্বাস করিয়া তোমারই হইলাম, কিন্তু তোমাকে অন্তরে তো পাওয়া হইল না। ভক্ত হই, প্রেমিক হই, মত্ত হই, যদি পুণ্যবান্ না হই, তবে তোমার সঙ্গে প্রকৃত যোগ হইল না। যে তোমার মত, সে আসল তোমার, আর তুমি তাহার। তেলেতে তেল, জলেতে জল যেমন মিলে, তেলেতে জলেতে কখন তেমন হয় না। হাজার নিষ্ঠাই থাকুক, আর ভক্তিই থাকুক, তোমার সঙ্গে, তোমার পুণ্য স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়া না গেলে, যোগ হয় না। আমার কথা মিষ্ট, স্তব সুমধুর, আমার হাতগুল মার কাজ করে, তবু দেখ, শ্রীহরি, দুই জনে ফাঁক। তোমার ক্ষমাতে আমার ক্ষমা, তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য হইলে, যেমন ভিতরে মিশ খাইয়া যায়, এমন আর কিছুতে হইবে না। জীব যখন তোমার কাছে প্রার্থনা করে, বলে যে, তোমার পুণ্য দাও, তোমার প্রেম দাও। আমি মার, মা আমার, ইহার প্রমাণ কই? তোমার স্বভাবটা আমাদের দাও। তোমার যে উজ্জ্বল তেজ, ঐ তেজ আমাদের হউক। খুব কাল হইয়া ঢুকিয়াছি তোমার মন্দিরে, ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইলাম, প্রকৃতি বদলাইল। দেবি, পুণ্যদানে ভক্তদলকে তোমার করিয়া লও। পুণ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে যে তোমার সহিত মিলন, সে এই আছে, এই নাই। আমি আসল জিনিষটি তোমার পা ধরিয়া চাহিব। তোমার মুখের তেজ আমাদের গায়ে লেগে লেগে চক্‌চকে ক'রে

দিক্। তোমার সহিত পুণ্যে এক হইয়া, যথার্থ একত্ব তোমার সহিত স্থাপন করিব। হে হরি, অসার জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া, পুণ্য-ধনে ধনী হইব, তোমার পুণ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ তোমার সহিত মিলিত হইব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হৃদয়কুটীর

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, হে আহ্লাদের সাগর, আমাদের বাহিরের ঘরে অনেক গোল, নানা উত্তেজনা, শোক দুঃখ প্রবল হয়। আমাদের ভিতরের ঘরে সে গোল তো নাই, সে নিকেতনটি অতি প্রশান্ত, সুখের ঘর। যে এই দুইটি ঘরের মর্ম্ম বুঝিল, সেই পথ ধরিল। পিতঃ, যে ভিতরের ঘরের সন্ধান পাইল না, তাহার কপালে সুখ কই ? যেখানে বাজার বসিয়াছে, সেখানে কি শান্তি পাওয়া যায় ? অথচ, জননি, সেই ঘরে আদ্‌খানা বাহিরের জীবন রাখিতে হইবে। হাত পা গুলো বাহিরে থাকিবে, আর প্রাণটা ভিতরে থাকিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে। হে দয়ালু পরমেশ্বর, সেই আরামের ঘরটি, আদর করিয়া 'দিল্ আরাম' যাহার নাম রাখিয়াছ, সেখানে আমাদের যদি থাকিতে দাও, তাহা হইলে বাহিরের উত্তাপ সহ্য করিতে পারি। রোগ শোকের জন্য বাহিরের অর্দ্ধ ভাগ রাখিয়া দিই, আর গভীর অর্দ্ধ লইয়া তোমার প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া থাকি। ঐ ভিতর ঘরের রহস্য বুঝিলে, বাহিরের রোগ শোক মানুষ সহ্য করিতে পারে। বাহিরে কত পরীক্ষা, কত বিপদ, কত লোকের সঙ্গে

দেখা শুনা, রাস্তা ঘাট, গাড়ীতে মানুষে পরিপূর্ণ, বাজারে গোলমাল, কখন সম্পদ, কখন বিপদ। আর যাই ফুক্ করিয়া তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, একেবারে চুপ্‌চাপ্ নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিকে একটি শব্দও নাই, একটি চিঠিও আসিতে পারে না। কেবল দেবী সঙ্গে দেবীদাস বসিয়া যোগের মজা করিতেছে! নিস্তব্ধ অবরুদ্ধ বাক্যে যাহার সাধন, তাহারই মজা। হে ঈশ্বর, কোথায় বা স্বর্গ, কোথায় বা নরক। হরি হে, প্রাণের ভিতরে সকলই আছে। ঐ যে দরজা-বন্ধ ঘরটি, উহার ভিতর স্বর্গ। এই নীচের নরক ছাড়িয়া, সিঁড়ী দিয়া ঐ উচ্চ স্থানে গিয়া, স্বর্গধামে পৌঁছিতে হয়। সংসারের কোলাহলপূর্ণ বাজারে না ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গভীর হৃদয়কুটীরে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া, জীবনকে শান্তি-সলিলে মগ্ন করিয়া দিই। হৃদয়কুটীর মধ্যে আর গোল দেখিব না, কোলাহল সহ্য করিব না, কেবল সেই শান্তি ঘরে শান্তিময়ী জননীকে সঙ্গে করিয়া চিরশান্তি সম্ভোগ করিব, এই আশা করিয়া, হে দয়াময়ি, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অচ্ছেদ্য যোগ

(হিমাচল, বুধবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক;
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীননাথ, হে অনন্তদেব, তুমি যে, শুনিয়াছি, স্থায়ী আর সকলই অস্থায়ী। লোকে বিপরীত বুঝিল, কাঁদিল। সংসার রহিবে না, ধন রহিবে না, আর কোন পৃথিবীর মায়া থাকিবে না, এই বলিয়া সংসার কাঁদিল। আমরা বলি, অসার রহিবে না মানে, সয়তান থাকিবে না,

পাপ থাকিবে না, থাকিবে কেবল তুমি। তুমি স্থায়ী, উহারা অস্থায়ী। উহাদের সঙ্গে অসার আমোদের সম্বন্ধ। তোমার সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ। পৃথিবীর লোকে বলে, 'ধুইলে পাপ যায় না, কিন্তু ধুইলে হরি যায়।' হরি কি একটা দাগ? এ অপমান শুনিয়া দুঃখ হইল। আর পাপ কি একটা মনের ভিতরে কাঁটা সেঁধিয়েছে যে, হাজার ধোও, যাবে না? প্রেমস্বরূপ, তোমার নামে এ অপবাদ ভক্তজনে কি করিয়া সহ্য করিবে? আমি যদি তোমার যথার্থ ভক্ত হই, তাহা হইলে বাম হাতে পাপ মাখিয়া, জল ঢালিয়া দেখাইতে হইবে পৃথিবীকে ডাকিয়া, যে, এই দেখ, জল দিলাম, মুছিয়া গেল। ডান হাতে হরিকে মাখাইয়া সমস্ত সমুদ্রকে আনিয়া ধুইব, বলিব, দেখ, পৃথিবী, হরি আমার তো গেল না। হরিপ্রেম আমায় কামড়ায়, হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, বাহিরে ধুইলে কিছু হইবে না। এই দেখ, সয়তান ঘরে ঢুকিল, এক ফুঁ দিলাম, কোথায় গেল। দয়াসিন্ধো, এই হইল শাস্ত্রের সার। আর এটি পাপী জগতের পক্ষে নববিধানের সত্য। সমুদ্র চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত জল দিয়া হরিকে ধুইয়ে ফেলিতে, কিন্তু কিছুতে পারিল না। আমার হরিকে কেহ আর তাড়াইতে পারিবে না। আমার শরীরটি লবণরাশি। হরিরস একটু ঢুকিয়া সমস্তটাকে সিক্ত করিয়াছে। এক তাল চিনিতে একটু জল ঢালিয়া আস্তে আস্তে দেখিতেছি, শিরে গেল, স্নায়ুতে গেল, মাংসে গেল, হাড়ে গিয়া ঢুকিল। কে ইহাকে তাড়াইবে? লাগিয়েছ যখন, তখন মজিয়াছ, রসিয়াছ, ভিজিয়াছ। এক বার রসিয়াছ, আর শুকাইবে না। সমস্ত ধুইয়া যাইবে, কিন্তু হরির সঙ্গে যে বাধন বাঁধিয়াছি, তাহা আর কখন যাইবে না। হরি আমায় ছাড়ে না। এমন গাঁট বাঁধিয়া যায়, কাটিলেও কাটে না। হরি, তুমি অনন্তকাল স্থায়ী। আর অন্য সমস্ত অসার। এইটি দেখাও জীবনে। অনিত্য অসার পাপ যত, সকলই চলিয়া যাইবেই

যাইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া, হরিবান্ধব যে আমার চিরবান্ধব, ইহা জানিয়া, চিরকালের মত নিত্য যোগানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিব, দয়াময়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মার হাসি দর্শন

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক,
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, ইহকাল পরকালের প্রচুর ধনসম্পত্তি, মানুষ যখন নাবে, তখন তুমি উঠ। যখন মানুষ কাঁদে, তখন তুমি হাস। যখন মানুষ দুঃখী হয়, তখন তুমি ঐশ্বর্য্য দেখাও। যখন মানুষ নিঃস্ব, তখন তুমি সর্ব্বস্ব। ও না দমিয়া গেলে, তুমি জোর করিতেছ না। এখন একজন অভক্ত, ভাবুক নয়, জিজ্ঞাসা করিল—ভগবানের এ কি রীতি? আমাদের সঙ্গে এত চটাচটি? ভাবুক বলেন, তুমি যখন সুস্থ, তখন আর ভগবান কেন সুস্থতা দেখাইবেন। তোমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া অষ্ট প্রহর গেল, তখন হাসিয়া হাসিয়া মা লক্ষ্মী নাবিয়া আসিলেন। নববিধান বুঝাইয়া দিলেন, মানুষ, তুমি নিরাশ হইও না। দুঃখের সময় মানুষ ভাবে, ভগবান কত দুঃখী। আপনি রাগে, তোমাকে রাগী ভাবে। ভাবুক জনের ঠিক উল্টা। যে দিন যেটা অভাব হইয়াছে, সেই দিন তুমি সেটা দিবে, এই হইতেছে পরিত্রাণের কথা। আমি যখন খুব দমিয়া যাইব, তুমি বুকের উপর দাঁড়াইয়া এমনি নাচিবে যে, খুব চাঙ্গা করিয়া দিবে। তুমি যদি আমাদের দুঃখের দিনে দুঃখী হও, তা' হ'লেই আমাদের মহা মুস্কিল। চতুর হরি, ঢের বুঝে তুমি কাজ কর। ছেলেকে দুঃখের সময় সাম্‌লাবে

কে? হাসি মুখ দেখিয়ে সুখী কর্‌বে কে ছেলেকে? আমি কাঁদি, তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখো, তোমার মুখচন্দ্রে কোটি চন্দ্র হারে দেখে, যেন সকল দুঃখ ভুলে যাই। হাসি মুখখানি যেন কখন মলিন না হয়। মার সহাস্য বদন বিষণ্ণ জনের আরাম। তুমি হাসিলে আমরা হাসি, বাড়ী হাসে, ঘর হাসে, দেশ হাসে, সকলেই হাসে। যে দিন রাত্রি তোমার মুখের হাসি দেখে, তার বুঝি রোগ হয়, দুঃখ হয়, কোন ভাবনা বুঝি তার থাকে? আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকল সময়ে তোমার হাসি মুখখানি দেখে, সকল দুঃখ বিপদকে ভুলে থাকিতে পারি। কমলে, হাস্যবদন দেখি, তোমার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হাসি দেখে দুঃখে হেসে ফেলিব, এই আশা ক'রে, জননি, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা সকলে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অকাট্য যোগ

(হিমাচল, শুক্রবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক;
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

দয়াময় যোগেশ্বর, তোমার কাছে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না। ঐ যে তোমার স্নেহস্বরূপ একটি স্বরূপ আছে, মানুষ উহাকে হজ্‌মিগুলি মনে করে। হাজার পাপ করুক, আর দুষ্কর্ম্মই করুক, ভাবে, তোমার স্নেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে; কিন্তু মানুষ ভাবে না যে, হরির খুব সূক্ষ্ম বিচার, একটু অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। সংসারের গোলমালে গোঁজামিলন দিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব, ইহা সকলের চেষ্টা; ইহাতে, ঠাকুর, বড় বিষফল ফলিতেছে। তোমার ইন্দ্রিয়াতীত যোগরাজ্যে না গেলে, কিছু

হইবে না। যোগের নিয়ম যে, চক্ষু কর্ণকে নীচে রাখিয়া একেবারে উপরে উঠিতে হইবে। মা হইয়া স্তনের দুগ্ধ দাও, তাই খাইব, আর গুরু হইয়া শক্ত উপদেশ দিবে, তাহা লইব না? পৃথিবীর উপরে দশ হাত উঠিয়া, আকাশে বাড়ী করিয়া, উপাসনা প্রার্থনা করিব। মেছোহাটার সম্মুখে বসিয়া যে উপাসনা করিব, তাহা হয় না। চিন্ময় হরি, আমি এই মূর্ত্তির দেশে তোমায় কেমন করিয়া দেখিব? এই শব্দের দেশে তোমার চিন্ময় বাক্য কি করিয়া শুনিব? প্রাণেশ, নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, কাতর প্রাণে একখানি আসন দাও; তাহা হইলে চিৎ দিয়া চিৎ টানিব। চিতের বঁশি দিয়া চিতের মাছ ধরিব। ভক্তি-মাখান আনন্দের চরণখানার উপর ফেলিব। এখানে গোঁজামিলন চলিবে না। যদি বাজাতে বাজাতে তার কাটিয়া যায়, একেবারে বেলয় অরসিক বলিয়া বিবেক তাহাকে খুব ধম্‌কায়। এ দেশের লোকদের আর গুণের কথা কি বলিব। যাঁহারা বন্ধু বলেন, যাঁহারা যোগ সাধন করেন বলেন, তাঁহারাই তো তার কাটেন; খুব যোগে বসিয়াছি, দিলেন তার ছিঁড়িয়া। হরি, তোমার ঘরে লোহার দরজা বন্ধ করিয়া হরিরস পান করিব। মূর্ত্তি নাই যাহার, মাটি ধরিয়া পাইব কি করিয়া? আমার প্রাণ প্রাণকে পাইবে, আমার জ্ঞান জ্ঞানকে পাইবে, আর আমার প্রেম প্রেমকে পাইবে। আর যেন এই ছোট খাট, পাঁচ মিশলে সংসারে থাকিয়া না ঠকি; কিন্তু একেবারে চিদানন্দধামে গিয়া, অকাট্য যোগানন্দে মুগ্ধ হইয়া, তোমার শ্রীচরণতলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হইয়া থাকি, হে দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সিদ্ধি

(হিমাচল, শনিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৮০৫ শক ;
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

দয়াল শ্রীহরিধন সমক্ষে কথা কহি। যাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহাকে প্রাণ দিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথা কহি। হরি, সিদ্ধির আর কত দূর? চিরকাল কি মানুষ সাধন করিবে? এ জন্ম কি সাধনেই শেষ হইবে? সিদ্ধি কি পরলোকে? এখানে সিদ্ধপুরুষ কি হওয়া যায় না? পথ যাহা ধরাইয়াছ, সে যে সৌভাগ্যের পথ। এ পথে যে মার অনেক প্রেমলীলা দেখিলাম। এ যে বড় সুখের পথ। কত ফুল ফল, কত নূতন মানুষ, এ পথ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কেন ঢাকা ছিল নববিধানের রাস্তা? এ আনন্দের যোগের পথ কেন এত দিন খোলে নাই? মন, বল তোমার হরিকে যে, আহা, কি পথে এনেছ, ঠাকুর। কেবল শান্তি। স্বর্গ মর্ত্তের আর প্রভেদ রহিল না। ঈশ্বর, মনে হয় যে, এই সিদ্ধির পথ। হে মাতঃ, করযোড়ে এই নিবেদন করি যে, সিদ্ধপুরুষ কর। যোগে সিদ্ধ, ভক্তিতে, পুণ্যেতে, বৈরাগ্যে সিদ্ধ, মত্ততায় সিদ্ধ; অচল অটল পাহাড়ের মত আর নড়িব না। কাঁচা থাকিলে সুখ নাই। "আজ উপাসনা হইল, কাল যদি এত ভাল না হয়?" বন্ধুরা সর্ব্বদা এই কথা বলেন। "কাল্‌কে তো পাপ করি নাই, আজ আবার পাপ করিতেছি?" সিদ্ধপুরুষ করিয়া দাও। মা আমার, আমরা মায়ের, এমন অবস্থায় হৃদয়কে রাখ। যে পথে এসেছি, থামিব না। হাসিতে হাসিতে কেবলই দৌড়াইতেছি, বৈকুণ্ঠ দেখিতেছি। ঐ যে আমার মার বাড়ী। এই যে আমার মার বাড়ী। এই যে ভক্তেরা সব খেলা করিতেছেন। মজায় আছেন মজার লোক! অসিদ্ধ একটাও নাই। যে পথে আনিয়াছ, এই সিদ্ধির পথ। মা, যেন

ফিরি না অসিদ্ধ হইয়া। সিদ্ধ হইবই হইব। বন্ধুদের বল, "সাধনই কর্, আর যাই কর্, সিদ্ধ না হইলে আর কিছু হইবে না।" মা, বুঝাইয়া দাও যে, উহাতে শান্তি নাই, সিদ্ধি নাই। উপাসনাকে বন্দী করিয়া রাখিব। উপাসনা, বল্ যে, এক দিনও আমায় ছাড়্বি না, বল্। সঙ্গীত ব্রহ্মসাধনও, বল্, এক দিনও আমায় ছাড়্বি না। মা, এ কয়েকটাকে আমি একেবারে বন্দী করিয়া লইব। ধ্রুব, প্রেমচাঁদ, ছেলে বেলাই কেমন সিদ্ধ হইলেন! বুড়রা ছেলে ধ্রুবচাঁদের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সিদ্ধ হই। আমি আর কাঁদিব না। নির্ভয় হইব, যম আসিলেই তাহার দাড়ী ধরিয়া নাড়িব, বলিব, খাসের প্রজাকে ধরিও না ; তাহাকে ভয় দেখাইব। একটা দল, সিদ্ধ গোঁসাই, হরিপ্রেমে মত্ত, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এমন একটা দল যদি পাই, খুব মাথায় করিয়া নিয়া নাচি। এই সাধ, মা, এই সাধটা খালি বাকি রহিয়াছে। সিদ্ধ হইব, আর বান ডাকিবে, আর চারিদিক প্রেমের জলে ডুবাইয়া দিব। তারা বল্বে, আমরা দুঃখী হ'ব, আমি বলিব, আমি থাক্তে তা' হ'বে না। সকল ঘরে প্রেমের বান, সিদ্ধির বান ডাক্বে। আর সাধনের চঞ্চল অবস্থায় না থেকে, 'সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী' এই নাম জপ করিতে করিতে শমনকে ফাঁকি দেব, মৃত্যুর দরজায় চাবি দেব ; কেবল হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চিরসিদ্ধি লাভ করিব, মা দয়াময়ি, দয়া ক'রে মাথায় হাত রেখে আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পাখিপ্রত্যর্পণ

(হিমাচল, রবিবার, ১লা আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ভক্তের হরি, বড় লোক হইলে পাখী পোষা রোগ হয়। ঈশ্বর, তোমার মত বড় লোক আর কে? সৌখীন আর কে? রসিকতা তোমার ঘরে যেমন, সৌখীনের বাটী তোমার বাটী যেমন, এমন আর কোথাও নাই। তুমি তো পাখীর ব্যবসায় কর না, কিনিয়া বেচ না; কিন্তু কিনিয়া পোষা তোমার আমোদ। দেখিলাম, পাখী উড়াইয়া লইয়া যাও গৃহস্থের বাটী হইতে, আর ফিরাইয়া দাও না। ঠাকুর, আমার পাখী ফিরাইয়া দাও। অন্যায় হইবে। তোমায় চুরির দাবি দিব। রাখিও না। তোমার কাণ নাই, নিরাকার কি না, শুনিতে পাও না। ভাল কথা জ্ঞানের কাণে কিন্তু শুনিতে পাও। চর্ম্মকাণ নাই, মন্দ কথা শুনিতে পাও না। আমি কাঁদি, বলি, "আমার পাখী কে নিলে, ফিরিয়ে দাও, ছেড়ে দাও"; কেহ শুনে না। মনে করি, জোরে হইল না, ভুলাইয়া দেখি। ছোলা দিলাম, দুধ কলা দিলাম, সকল দিলাম। স্বর্গের দরজার কাছে গিয়া বলি, "আয়, পাখী, আয়, কোথা গেলি আমার হৃদয়ের ধন, আয়, দুধ কলা খা। আয়রে,পাখী, পালিয়ে আয়, খাবার লোভে দৌড়ে আয়।" কোথায় হাজার পাখীর মাঝে আমার পাখী মিলিয়াছে, জবাব পাইলাম না। দিন গেল, বর্ষ গেল, মাস গেল, পাখী এল না। হরি চোর,—পিঞ্জরের পাখী চুরি কর? মানুষ বেঁচে থাকিতে পাখী উড়াও? তোমার তা ভাল দেখায় না। তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে কত পাখী। তোমার হাত ঝাড়িলে যথেষ্ট, তোমার ভাবনা কি? তুমি আবার শিকারীর মত পাখী ধরিয়া বেড়াবে? লোকের বাড়ীতে গিয়া ভাল দেখিয়া ভুলাইয়া লইবে? স্বভাব।

লোকে বলে, পাপী কোন মতে পাপ ছাড়ে না। ভগবানের স্বভাব ভাল, তিনিও ছাড়েন না। ধুইলেও যায় না, মুছিলেও যায় না। আমার পাখীটার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আমার কথা শুনিত, আমার তোতা অনেক বুলি বলিত। আমার শালিক আমার শেখান কথা শুনিত। যোগ শিখিয়া অবধি খারাপ হইয়া গেল, আর আমার কথা শুনে না। আমি বলি, বল্ 'সংসার', সে বলে 'হরি'। আমি বলি, বল্, আমি তোর মনিব, সে বলে, 'আমার মনিব চিন্তামণি'। আ-মর্ পাখী, তুই কি আর সে খাবার পাবি? স্বর্গে কি ছোলা আছে? কে আদর করিবে? পাবি না, মনেও করিস না। দেখি, আমি বলিতেছি, পাখী শুনে না। গা ঝাড়িতেছে, গ্রাহ্যও করে না। সেখানে গিয়া অধিক কিন্তু উহার লাবণ্য বাড়িয়াছে। বুঝিয়াছি, জায়গায় গিয়াছে। আমার তো নয়, পরের পাখী পুষিয়াছিলাম। পরমাত্মা আর জীবাত্মা। এবার বুঝিয়াছি। যাহার ধন তাহার কাছে। স্বর্গের গাছে, পরমাত্মা বড় পাখীর কাছে জীবাত্মা ছোট পাখী, তুমি ঠোঁটে করিয়া উহাকে খাওয়াইতেছ। ও আর আমার কথা শুনে না। বুঝিয়াছি, যত দিন পৃথিবীর কাদা পাখী খায়, তত দিন সে কথায় ভুলে। একবার স্বর্গের ফল খাইলে, আর কি সে ইহা চায়? চিদাকাশে যে উড়িয়াছে, সে কি আর নামে? কি খাওয়াও? যোগ-ফল? উহাতে নাকি নেশা হয়? পাখী প্রমত্ত হইয়া গিয়াছে। হরি, যোগ-ফল কি? কি খাওয়াইলে? এত দিন তো এমন হয় নাই। আগে যাইত, গান টান গাইয়া বেড়াইয়া চেড়াইয়া আবার সাবেক ছোলা কলার লোভে আসিত। পাখীটা দুই দিকই রাখিত, উত্তরে দক্ষিণে দুই দিকে উড়িত। ঊর্দ্ধগতি ছিল, অধোগতিও ছিল। এখন আর এক রকম হইয়া গেল। ব্রহ্মের মুখ দেখিয়া কেমন হইয়া গেল। আমি মারিনি, ঠাকুর, তবু মরিয়াছি। আমার মন যদি

স্বর্গে রহিল, তবে আর বাকি কি, ঠাকুর? যদি ধরিয়াছ, তবে আর ছাড়িও না। আর প্রায় আমার কথাতেই কি ছাড়িবে? তুমি লোভী। কিন্তু এমন রোগা পাখীটাকে হাতে করিয়া বেড়াও কেন? যোগী পাখী, ভক্ত পাখী, কত পাখী আছে। ওটা নিয়েছ কেন? ঠাকুর, কত পাখী ধরিয়াছ? তোমার বয়স তো অনেক হইয়াছে। কত প্রাণপাখী উড়াইয়াছ? প্রাণপাখী যাক। খাঁচায় খাঁচায় তো মিলিবে না, পাখীতে পাখীতে মিলিয়াছে। গান শুনিতেছে। আমোদে বলিতেছি, কি মজা হইল। আগে কি ভয়ানক অবস্থায় ছিলাম! সংসারের পচা খানার ধারে দুর্গন্ধে মরিতাম। এখন কেমন মজা। মা, বেশ করিয়াছ। তবে আর ছাড়িও না। মা, তোমার হাতে পাখী থাকে ভাল। ঐ হাতে পাখী থাকে ভাল। ঐ হাতে পাখী যে দিন বসাও, সে দিন পাখীর দফা শেষ। আমি পাখী, যোগ তো ফুরাইয়াছে, এবার আয় না। পাখী বলে, "আর না, আমি তো তোর নই। আমি মার, মা আমার।" আচ্ছা, পাখী, থাক্। তুই থাকিলে আমার থাকা। যোগফল খাও, মার কাছে গান শিখ, আর চাই না। তবে দেখিতে চাই, এমন ক'রে ক'টা পাখী উড়ে। দেহ-খাঁচাকে ফাঁকি দিয়া, প্রাণপাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িল, আর মার মুখে হাসি এসেছে; আর পাখীরা আমোদে মজিয়া গিয়াছে। হইল ভাল, এখানে থাকিয়া কষ্ট পাইত, এ তো বেশ হইল, বেশ মার কাছে থাকিবে, মার হাতে খাইবে। এখানে পচা পোকা খাওয়াইতাম, সোণার পাখীকে বিষ খাওয়াইয়াছি। মা গো, আর নির্য্যাতন করিব না। তোমার পাখীকে আস্তে আস্তে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। মা, তুমি তোমার পাখীকে হাতে বসাইতে ভালবাস। তোমার কোমল হাতে পাখীকে বসাইয়া দিব, মা, তোমার ধন তোমাকে দিয়া চিরসুখী হইব, এই আশা

করিয়া, সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জড়ে হরিদর্শন

(হিমাচল, সোমবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে চৈতন্যময়, জড়েতেই মাতিলাম, জড়েতেই মজিলাম। জড়াতীত হরিকে তবে আমরা কিরূপে পাইব? হরিদাস হইবে যে, জড়দাস হইল সে? কেন এ বিড়ম্বনা? হরিদ্বার বন্ধ করিয়া দেয় এই জড়। তীর্থযাত্রী সকলেই ফিরিল, কেন না জড়, অসার অপদার্থ, হরিদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। ঐ আমার সাম্‌নে হরি, মধ্যে জড় আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য নিবেদন যে, যাহাতে একাকার নিরাকার হইয়া যায়, এ চক্ষু যাহাতে সাকার দেখে না, ছোঁয় না, এই কর। তাহা না হইলে তোমার স্পর্শমণি নাম কি করিয়া হইবে? সোণার পাহাড়ে সোণার হরি দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। জলে সোণা চক্‌ চক্‌ করিতে লাগিল, তার উপর আমার হরি বিদ্যমান। ফুলের পাপ্‌ড়ি সোণা হইয়া গেল; সূর্য্যে সোণা, চন্দ্রে সোণা। কাহার সোণা? হরির সোণা, চিন্ময়ের চিন্ময় সোণা। আমার হরির রংএ জগৎ টুক্‌টুকে। তাহা হইলে আমার সব হইল। এখন এমন অসার পাথরের সংসার, তাহাও ভক্তপরিতোষ হইবে বলিয়া স্বর্ণময় হইয়া গেল। এত চেষ্টাতেও উপদেশ সফল হয় না। যে জড় বুদ্ধি, তা থাকিতে চিন্ময় বোধ তো হইবে না। প্রকৃতির ভিতরে, মা, তোমায় ভাল করিয়া দেখি। আমাদের কাছে জড়ের জড়ত্ব

যেন আর না থাকে। ঊর্দ্ধে শক্তি, বামে শক্তি. চতুর্দ্দিকে শক্তি, মৃত জড় আর নাই। নির্জ্জীব, পচা, দুর্গন্ধ জড় আর তোমার কৃপায় রহিল না কিছু। সকলে হরিনামে হিরণ্ময় হইয়া যাইতেছে, আমাদের প্রিয় হরির নামে মাটি সোণা হয়, এ যদি দেখিতে পাই, আর দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অলৌকিক হয়। আমাদের জড় তনুকে সুবর্ণ, জড় সংসারকে সুবর্ণ করিব. সমস্ত জড়ের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া শুদ্ধ এবং যথার্থ সুখী হইব, মা, দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নিত্য বস্তু

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ৩রা আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

প্রেমময় হরি, নিত্যকালের হরি, কে আমার নিত্য, কে অনিত্য, আমি যেন তাহাই ভাবি। আমার পৃথিবীতে কাজ নাই, সংসারে কাজ নাই। গুরো, কৃপা করিয়া আমাকে, কে আমার নিত্য, আর কে অনিত্য, বুঝাইয়া দাও। হরি, আমার নিত্যধন, তোমাকে প্রেম করিলে আমার মরণ নাই। তোমার সহিত চিরকাল থাকিব, ইহার চেয়ে আমি আর কি চাহিব ? পিতঃ, সন্তানকে তুমি নিত্যধন দিয়া সুখী করিতে চাও, আমরা অসারেতে এত প্রেম দিতে চাহি কেন ? নির্ব্বোধ বুদ্ধি মনে করে, এই বুঝি চিরস্থায়ী। মিথ্যা মিথ্যা পাঁচ দিনের আলাপে কি দরকার আমার ? আমি কি বাজারে জিনিষ কিনিতে আসিয়াছি ? আমি আসিয়াছি মহাজনের দেশে যাইব বলিয়া ; পথে দুই ঘণ্টা গাঁজা খাইলে কি হইবে ? নিত্য স্ত্রী, নিত্য পরিবার নিত্য দল আছে কি ? যদি না থাকে,

তুমি তাহাই হও। তুমি আমাকে নিত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ। আমি যদি ইহা আমার ধর্ম্ম, ইহা আমার কর্ত্তব্য বলি, এটা কেবল মায়া ঢাকিবার কৌশল। আমার যাহা, তাহাই নিত্য, আর যাহা আমার নয়, ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়, তাহা অনিত্য। আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, বুদ্ধের বুদ্ধি লইয়া বাতাসের সঙ্গে প্রেম করিব—যে বাতাস এই আছে, এই নাই ? হরি, সকল বস্তুতে নিত্য আছে। আপনার সংসারের ভিতরে নিত্যধর্ম আছে, আবার উপাসনার ঘরে অনেক অনিত্য আছে। (উপাসনা যদি চলিয়া যায়, এই ভক্তিভাব যদি উপে যায়, এই মাতৃরূপ-দর্শন যদি কাল না হয়।) নিত্য করিয়া লইতে পারিলে সকলই নিত্য। কতক্ষণ লাগে, মা, সংসারকে নিত্য করিতে ? তোমার সংসার করিয়া দিলে নিত্য হইল। আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিলেই তোমার হইয়া যায়। কিন্তু মরা মানুষ তাহা চায় না। ভক্তদের মধ্যেও অনেকে তাহা চায় না। ধ্রুব-মন্ত্র-সাধনের ব্যাঘাত এই। নিত্য ছুঁইব, অনিত্য ছুঁইব না। সামান্য কর্ম্মের ভিতরে নিত্য ফল আছে। যাহা আছে, আর পরে চলিয়া গেল, সে স্বপ্নের সঙ্গে, মা, এ জন্মে যেন সম্বন্ধ না হই। নিত্যবন্ধো, চিরবন্ধো, দয়া করিয়া এবার, নিত্য কি, বুঝিতে দাও। তুমি বলিয়াছ, চিরকাল কাছে থাকিবে। সংসারের কেহ তো এমন কথা বলে না। সে আদর আর কে করে, কেবল তুমি কর। তুমি কি না কুড়ি ত্রিশ বৎসর পালন করিলে বলিয়া আদর চাও না। আর তোমার কথাটা যদি আর কেহ বলে, তাহা হইলেই সে নিত্য হইল। সকল বস্তুর ভিতর থাকিয়া নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিতে দাও। নিত্য কালের যোগ যেন তোমার সঙ্গে রাখিতে পারি। যাহা কিছু অসার, তাহার ভিতর থাকিয়া, প্রেম ভক্তি নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিয়া, তোমার সহিত নিত্য বৃন্দাবনে চিরসুখে

থাকিব, মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দিবারাত্র হরিকীর্ত্তন

(হিমাচল, বুধবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে প্রণতসখা, তোমার তো ইচ্ছা যে, অনন্তকালের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাও। কালের দেবতা, কালে ক্রীড়া করে দুই দিনের জন্য। কালাতীত দেবতা খেলা করেন চিরদিনের জন্য। নাথ, পুষ্করিণী হইতে টান নদীতে, আবার মাছ যখন বড় হয়, তাহাকে ফেল তখন সমুদ্রেতে। কখন তাহাকে ছোট হইতে দাও না। ক্রমেই সে অনন্তের দিকে চলিল। পাঁচ মিনিটের উপাসনা ক্রমে সুখের লোভে দশ মিনিটে, ক্রমে আবার দুই ঘণ্টায় দাঁড়াইল। তবু সে সময়ে বদ্ধ। নয় সমস্ত দিন তোমার উৎসব করিলাম, রাত্রি ১১টার পর তো থামিল। লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎসবেও তো সন্তুষ্ট হইল না। তখন মন বলে, আমার দেহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? যত শক্তি অন্তরে, ইহারা তো সকলে তোমার সন্তান। আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদয় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, অনলস হইয়া, দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরিকীর্ত্তন কি আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একটা, চক্ষের দল একটা, কাণের দল একটা এই রকম ক'রে গোটাকতক দল করিয়া, কেন দিবানিশি যাহাতে হরিনাম কীর্ত্তন হয়, তাহারই বন্দোবস্ত হয় না?

যে হরিনাম কাণে লাগিয়াই আছে, সেই হরিনাম শুনিব। গা-ময় হরিনাম করিয়া দাও। ভিতরে সমস্ত প্রকৃতিটাকে হরিনামের করিয়া দাও। প্রকৃতি সর্ব্বদা অমৃতবচনে আমার ভিতরে মধুরস্বরে হরিনাম করুক। সে তো খারাপ নয়, অবিশ্বাসিনী নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু কীর্ত্তন করিব। তোমার এই যে শক্তিগুলি, এরা তোমার খুব ভক্তের অনুগত। এই কীর্ত্তনের দলটাকে যদি নিযুক্ত করি, তাহা হইলে নিত্য গৃহে হরি-কীর্ত্তন হয়। মানা করিলে ইহারা শুনিবে না। মা, আমার পয়সা নাই, কীর্ত্তনেকে নিযুক্ত করিতে পারি না। তুমি যদি টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া দাও, সমস্ত দিন রাত্রি হরির নাম কীর্ত্তন হয়। তাহা হইলে দেহটা ভরিয়া যায়, আর আমার দুঃখ যন্ত্রণা সব চলিয়া যায়। এই পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বলিতেছে। মনের যত কিছু শক্তি, সব হরি হরি বলিতেছে। এমন তেজের সহিত বাজাতে কাহাকে দেখি নাই, এমন গান কোথাও শুনি নাই। কাজ করি, আর যাহাই করি, দেহ মন দুইটা নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম করে। হরিনাম-সম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলস্য আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া, যেন ভক্তপুরীতে সর্ব্বদা হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্ত্তন করে ; যার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহ মনে ছড়াইয়া দিতেছে, সমুদয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য! মিলিয়া দুই ভাইয়ে, দেহ মনে, হরিগুণ-কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছে, এই দেখিয়া, চিরকালের জন্য যেন আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বেহুঁস ভাব

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনের সহায়, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, বুদ্ধিমিশ্রিত ধর্ম্মকে আর বিশ্বাস হয় না। যে উপাসনা করে, অথচ চারি দিকে তাকায়, সে কি বিশ্বাসী? যে সকল বিষয়ে বুঝিয়া চলে, সে কি তোমার লোক? মত্ততা ভিন্ন হরিভক্ত ঠিক হওয়া যায় না। শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, মানিয়াছি। একটু এদিক ওদিক যে তাকায়, সে ধূর্ত্ত, সে চতুর। যেমন খাঁড়াখানি পড়িবে, আর কোন দিকে তাকাইব না, অমনি আত্ম-বলিদান হইল। দয়াময়ি, পাঁচ কথা মানিতে গেলেই, পূজাদেবী যিনি, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান। বলেন, এ তো বড় শঠ! চারিদিক বজায় রাখিয়া তো চলিতেছে! প্রেমময়, এ সাজ্যাতিক সুখ্যাতি যেন তোমার ভক্তের কখন না হয়। এরূপ পুরস্কার নিয়ে যে আমোদ করে, সে তো সয়তানের প্রজা। মার কোলে আছি, মা যদি আগুনে ফেলে দেন, আচ্ছা ; তখনও তো কোল ছাড়া হই না। একটা বেহুঁস করিবার কিছু খাওয়াইয়া দাও এ হিমালয়ে—যে হিমালয় যোগের গাঁজা খাওয়াইয়া দেয়, প্রেমের ধুতুরা খাওয়াইয়া দেয়, এই হিমালয়ে ধর্ম্মমাদক-সেবনের যে খুব রীতি, এখানে পাথর ছুঁইলে সংসারের জ্ঞান চলিয়া যায়। লজ্জা ভয় দুইটাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সংসার ছাড়িয়া, শ্মশান লইয়া মহাদেব যোগী তোমারই হইয়া যান। অতএব, ঈশ্বর, যদি সেই পবিত্র স্থানে আনিয়া থাক, আমরা ফিরিয়া যাইব এখান থেকে, সে ফল না খাইয়া? আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? যে ফল খাইলে একেবারে ধর্ম্মেতে, যোগেতে, প্রেমেতে উন্মত্ত হইব, সেই ফল লইয়া যাইব। আর এখন এ বয়সে,

দুই আর তিনে পাঁচ, ভাবিতে পারি না। তুমি এখন বেশ বুঝাইয়া দিতেছ যে, কেবল বলা 'হরি হরি', আর বেহুঁস হ'য়ে গড়াগড়ী। সংসার করিব বেহুঁস হইয়া। উপাসনা করিতে বসি বেহুঁস হইয়া, বেড়াইতেছি বেহুঁস হইয়া। সে দিন হিমালয়েতে যে মহাদেবের যোগ-বাগান থেকে কি খাওয়াইয়া দিলে, সে দিন থেকে খাইতেছি, দিতেছি, কি করিতেছি, জানি না, মজায় আছি। কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল রাখিয়া দাও আমাদের, হে হরি। হরির দিকে যে জ্ঞান, সে জ্ঞান খুব পরিষ্কার যেন থাকে। হরি, তোমার কাজে খুব জ্ঞান থাকিবে; কিন্তু বেহুঁস। গান করিতেছি খুব বেহুঁস হইয়া, কিন্তু তাল মান ঠিক আছে। যোগী ভক্তেরা তো এই বলেন। একজন বিনীতহৃদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছে যে, ঐ বেহুঁস করিবার একটি ফল দাও। অপ্রমত্ত যোগ ভক্তির পথ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, বেহুঁস হইবার রাস্তায় চলিয়া যাই; গিয়া অষ্ট প্রহর তোমাতে মত্ত হইয়া, চিরকালের জন্য শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নির্ম্মল চক্ষু

(হিমাচল, শুক্রবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে সত্য, এখন তো নিত্য ধন না বুঝিলে আর উপায় নাই। বাল্যকাল গেল রসরঙ্গে, বৃথা মায়ায়। এখন জ্ঞান আসিল, এখন তো ভুলিলে চলিবে না। পিতঃ, তোমার ছেলেদের চক্ষে পীড়া হইয়াছে। পিতঃ, মুক্তি বল, যোগ বল, সবই চক্ষে। যে অপবিত্র দর্শন

করে, নরক দর্শন করে, তাহার কিছুতেই ভাল হয় না। যাহা দেখিতে যায়, তাহার ভিতরে একটা অপবিত্র অমনি দেখিয়া বসিয়াছে। চক্ষু যদি হলুদের মত হইয়া যায়, সকল বস্তুতে হলুদের রঙ দেখে। তোমার কাছে যে যোগরঞ্জন নামে ঔষধ আছে, তাহা দিয়া আমাদের চক্ষুর পীড়া আরাম করিয়া দাও। নিত্য বস্তু, সত্য বস্তু, পবিত্র বস্তু তাহা হইলে সকল স্থানে দেখিব। ঐ অঞ্জন চক্ষে না লাগাইলে, কিছুতেই সত্য বস্তু দেখিতে পাইব না; পর্ব্বতের ভিতরে আসিয়াও সেই নরক দেখিব, ফুলের ভিতরেও অপবিত্রতা দেখিব। এমন কি আমরা নির্ব্বোধ হইয়াছি যে, জানিয়া শুনিয়া আমরা সারকে অসার দেখিব? তেমন এক হাতুড়ী যদি পাই, তবে তো বাদাম ভাঙ্গিয়া শাঁস খাইতে পারি। যোগাঘাতে খোশা ভাঙ্গিয়া গিয়া, শাঁস বেরিয়ে পড়িবে। যে বস্তু ছুঁইব, কট্ করিয়া চাবি খুলিবে, দেখিব, ভিতরে তুমি বসিয়া রহিয়াছ। তাহা না হইয়া চারিদিকে কেবল পাহাড়, নদ নদী, গাছ ফুল; যোগী বিশ্বাসী ভিন্ন ইহা কে দেখিবে? এ বয়সে চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া দাও, পিতঃ। নির্ম্মল চক্ষে বিনা আয়াসে খুব দেখিব। চক্ষু যখন সুশিক্ষিত হইল যোগেতে, তখন তো তাহার চেষ্টা করিতে হয় না, পরমহংস হইয়া দুধটুকু ছাঁকিয়া লইবেই লইবে। এত বুদ্ধি, এত জ্ঞান, তবুও বলিতেছি মায়াকে সত্য। এক ফুঁ দিয়া সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দিল, চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল, ব্রহ্মময় সকল ভুবন! সকল বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া গেল। হরিভক্ত নিত্য হরিকে মানিয়া, নিত্য বস্তু লাভ করিয়া সুখী হইলেন। নিত্য না দেখিলে, অনিত্য কি করিয়া বুঝিব? সুন্দর না দেখিলে, কি করিয়া বলিব যে, অন্যগুলা কদাকার? দেখাইয়া দাও, পিতঃ, তুমি যে নিত্য। একেবারে তোমার ভিতরে ঢুকিয়া লীন হইয়া যেন যাই। অসার অনিত্য বস্তুতে প্রেম না রাখিয়া, তুমি নিত্য হরি, তোমাকে দেখিতে

দেখিতে চক্ষু নির্ম্মল হউক। দিব্যচক্ষে চারিদিকে তাকাই; কেবল মাতৃ-রূপই দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগসলিলে নিমগ্ন

(হিমাচল, শনিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক;
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে সন্তাপনিবারণ, ভক্তেরা তোমাকে শীতল বলিয়াছেন। তুমি খুব শীতল যোগের সলিল, শান্তির জল। যোগেতে কেহ গরম হয় না; কিন্তু সকল গরমি কাটিয়া যায়। প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাপিত হৃদয় শীতল হয়। পাপেতে মানুষ জ্বালাতন হয়। গরম লোহা যেমন জলে দিলে ঠাণ্ডা হয়, তেমনি সমস্ত সংসারকে যোগের জলে ডুবাইয়া দিলেই, অমনি একেবারে জুড়াইয়া যায়। হরি হে, বুঝে বুঝে তুমি এমন শীতল হইয়াছ। পৃথিবীতে ভয়ানক গরমি; টাকার, ষড়রিপুর গরমি চারিদিকে। এমন যে পাপেতে পাথর ফাটিতেছে। হরি, প্রাণ জুড়াইয়া দিলে তুমি। একবার গায়ে হাত দিলে, আর অমনি সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল। আগুনে কেন পুড়িবেন ভক্তেরা? একটি বার ক'রে সকলে উপাসনার সময় তোমার শান্তিজলে স্নান করে, আর সমস্ত দেহ মন জুড়াইয়া যায়। যোগটা ভাবিলেও যেন আরাম হয়। যেমন ডুব দিলাম, কোথায় চিন্তা, কোথায় সংসার। অগাধ জলধি মাঝে হরিভক্তিসাগরে গেলাম ডুবিয়া, অতলস্পর্শ, নাবিতে নাবিতে কত প্রাণ ডুবিয়া যাইবে। সেই এক উত্তপ্ত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ সাহারা; মানুষ পাপে,

ভাবনায়, রোগে, শোকে পুড়িতেছে। আর এ কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি! চারিদিকে শত শত পদ্মফুল—হরিপাদপদ্ম। তাতে ভ্রমর মধু পান করিতেছে। কৈ চিন্তা? ক্ষতবিক্ষত শরীর জুড়াইয়া গেল। এই কি, হরি, তোমার যোগজল, এই কি তোমার শান্তিজল? যদি দয়া করিয়া মানুষ জন্ম দিয়াছ, তবে শান্তিজল যেন কখন না ছাড়ি। তোমার এই যোগরূপ শান্তিসলিলে ডুব দিয়া, গাত্রজ্বালা, মনের জ্বালা, আত্মজ্বালা, সংসারের পাপের যন্ত্রণা জুড়াইয়া দিই। তোমার শ্রীপাদপদ্মের ভিতরে ঢুকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাই। আর আগুনে, কি পাপের, কি সংসারের আগুনে, পুড়িব না। যোগের জলে ডুবিয়া তাহাই পান করিব, তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিব, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রতিশোধ

(হিমাচল, রবিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমের আলয়, হে শান্তিনিকেতন, নববিধানে এক নূতন আনন্দ জগতের হইল। যাহা ছিল না, তাহা আসিল। কেবল নূতন সাধন নয়, হে ঈশ্বর, নূতন সুখও আসিয়াছে। এই সুখ খুব ভোগ করিতেছি তোমার প্রসাদে। মনের ক্লেশ, শরীরের ক্লেশ, তাহার ভিতরে অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত খুলিয়া গিয়াছে, তাহার ভিতরে বসিয়া আছি। শরীরও নাই, মনও নাই। সূক্ষ্ম আত্মা হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিতে পারিতেছি, আছি মাত্র। সুখে আছি, দুঃখে নয়। ধনে আছি, দরিদ্র নয়। একটা

কেবল দুঃখ, অতি ভয়ানক, হৃদয়বিদারক, তাড়াইতে পারিতেছি না। পিতঃ, কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর—লোকে শুনে না এ সুখের কথা। নবীনানন্দ, নব সুখ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, ইহা মানুষ বিশ্বাস করে না। কেন? আমি তো কাণাকে চক্ষু দিতে পারিলাম না, কালাকে শুনাইতে পারিলাম না, বুজরুকি দেখাইতে তো পারিলাম না, তাই, হে হরি, নববিধানে বিশ্বাসের ভূমি খুলিল না। একজনের সুখ অন্যে বুঝিল না। একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এত সুখ! এত সুখ! কেহ তাহা শুনিল না। বলে, কই তোর ঈশ্বর দেখা যে যায় না, যোগও হয় না। বিশ্বাস পাওয়া গেল না, ঠাকুর, বিদ্বান্ সমাজে। কথা বলিলে কিছু হয় না। কথা ঢের, বই ঢের, তাহা কেহ চায় না। দৃষ্টান্তের অভাব; তাহাই চাই। পৃথিবীকে উপদেশ দিয়া কেহ কখন বাঁচাইতে পারে না। তাই কথাগুল, উপদেশগুল, লেখাগুল কোথায় উড়িয়া গেল। দুর্ব্বল মানুষ বুঝিতে পারে না। আর একজন সুখ পায়, তাহা কেহ স্বীকার করিতে চায় না, সায় দেয় না। কেবল কি, ঠাকুর, এ সুখের সংবাদ লইল না? ঠাকুর, এমন তুমি, এমন তোমাতে সুখ, সেই ঠাকুর এমন সুন্দর বৃন্দাবন সাজাইলে, কেহ এল না, প্রজা জুটিল না। দুই ঘর প্রজা আসিয়াছিল, উঠিয়া গেল। তোমার মন্দিরের কাছে পাঁচ ঘর প্রজা বসাইলাম, দূরে উঠিয়া গেল। বলে, ভূমি শক্ত, বীজ ফেলিলে শীঘ্র গাছ ফুটে না। এই সকল ওজর করিয়া পালায়। কথা তো লইল না, বরং যাইবার সময় কষ্টকর কথা বলিয়া গেল। ঠাকুর, কেহ চায়, অপদস্থ হই; কেহ চায়, শরীর ভাঙ্গে, মন ভাঙ্গে। কেহ চায়, ধর্ম্মটা একেবারে লোপ পায়। কেহ চায়, হরি, আমার হরি, তোমার নাম কেহ না করে। তুমিও চ'লে যাও, আমিও চ'লে যাই, জগৎ আর বিরক্ত না হয়। দিন যায় না অপবাদ ভিন্ন, রাত্রি যায় না গালাগালি ভিন্ন। একজনের ক্ষুদ্র

প্রাণে আর ধরে না। একজন ক্ষুদ্র, আমার মত, এত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সইতে পারে না। অথচ লোকে তুষ্ট নয়। নূতন সংবাদ দিয়াছি কি না? তার বিনিময়ে কষ্টে প্রাণটা দিতে হইবে। কাহারও মন উঠিতেছে না। আপনার লোকদেরও বিশ্বাস হইতেছে না। বলে, এ ব্যক্তি পরম বস্তু পায় না। মিথ্যা অপবাদ গালি দিল, মাথায় লইয়া বসিলাম। চব্বিশ ঘণ্টার অগ্নিপরীক্ষা কিছুতেই থামে না। অগ্নি খাই, অগ্নি পরি, অগ্নিতে নিশ্বাস ফেলি, অগ্নিতে প্রাণত্যাগ আশ্চর্য্য নহে। ঠাকুর, ইহার জন্য কি আমি তোমার কাছে কখন কাঁদি? কখন বলি? সিংহের তেজ, শত লোকের অপবাদেও কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু, ঠাকুর, কথাটা তো রহিল। অপবাদ হইতে বাঁচাও, এ নীচ প্রার্থনা তো কখনও করি না। কষ্ট এলই বা। লক্ষগুণে যদি, মা, তুমি কষ্ট দাও, আমি কাতর হ'ব না। নীচ প্রার্থনা আমার নয়। যত পারে, বলুক না। আমার কাজ, সারা দিন বলিব, "ভক্তি চাই, বিশ্বাস চাই।" ফেরি করিব দ্বারে দ্বারে, খোদ্দের মিলে না। মাথায় পাথর মারে, বাটীতে লইয়া গিয়া জুতা মারে। বলে, যশ-কামনা ঢের। মা, কি প্রার্থনা, সত্য বলিব? একবার প্রতিশোধ লইতে চাই। পঁচিশ বৎসরের প্রতিশোধ লইতে চাই। আমার প্রদত্ত সংবাদ যেন সকলের বুকে প্রবেশ করে। মা, কেবল এই প্রতিহিংসা চাই যে, উহাকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া তোমার বিধানের আনন্দ উহার মুখে ঢালিয়া দিব; তবে মরিব। মা, আমাকে অমর করিয়া দাও। কেবল এই দেখি যে, আমার মা-নাম সকলে লইতেছে। তাহা হইলে আর দুঃখ কি? গালাগালি তো আমার ভাত ডাল। এত যে যোগ-ক্ষেত্রে খাটিয়াছি, তাহার পয়সা দেয় কে? গালাগালি দেয়, তা দিক্, মা, গালাগালি তো তোমার ভক্তের ভূষণ। তুমি সহ্য করিতে পার, তোমার ভক্তেরা কি তাহা শিখেন নাই? সকল

সহ্য করিব। উহাকে ছাড়িব কেন, উহাকে বাটীতে লইয়া যাইব। ও আমার বুকে লাথি মারিয়াছে, আমি উহার মুখে অমৃত ঢালিয়া দিব, এই চাই। মা, এই প্রার্থনা, যে নববিধানের সৌন্দর্য্যটা দেখিতে হইবে। যে কথাটী বলিয়াছি, তাহা মানিতে হইবে। নিরাকারকে দেখা যায়, ভালবাসা যায়, আর যে নূতন বৃন্দাবন হইয়াছে, তাহাতে সকলে মিলিয়া নৃত্য করা যায়। হে কল্যাণদায়িনি, এই প্রতিশোধ চাই। যিনি যত বিরোধী, তিনি তত যোগী হউন। মার নাম লউক, নৃত্য করুক, তাহার পর আমাকে মারুক। তাহা হইলে উহাদের দুঃখ তো যাইবে, মার নাম তো লইবে। কেমন জব্দ হইবে। একবার মার কাছে আনিতে পারি তো সাধ মিটে। বলি, কেমন, পৃথিবী, বড় যে ঠাট্টা করিয়াছিলে, ভক্তিকে যে অজ্ঞানতা বলিয়াছিলে, আর যে, পৃথিবি, নড় না? মা-নামে যে বড় জ্বলিয়া যাইতে। এখন কেমন? আর পার? বলিয়াছি তো, মা-নামের কাছে পরাস্ত হইতেই হইবে। এবার তো বুঝিলে, এই কাহিল লোকটা কি করিতে পারে, হরি সহায় হইলে। মা, যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিব। মা, এইটে জগৎকে দেখাইব যে, আমরা এক মাকে পাইয়াছি। আমরা সুখের নববৃন্দাবনে সকলে মিলে নৃত্য করিতেছি। মা আনন্দময়ি, এই বলি যে, এই সুখের মুহূর্ত্তটাকে কেহ যেন অবহেলা না করে। মা, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গ হইতে যে সুখের সংবাদ আসিয়াছে, সকলে যেন ইহা শ্রবণ করেন, আর অবিশ্বাস না করেন। মা, যত লোক আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, সকলকে যেন এই অমৃত পান করাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমিতে আমিতে মিলন

(হিমাচল, সোমবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে যোগেশ্বর, যোগীর বন্ধু, বিয়োগই যে মৃত্যু, তাহা ঠিক্। দেখিলাম, তোমাতে আমাতে বিয়োগ হইলে আমার মৃত্যু হয় ; ইহাও দেখিলাম যে আমাতে আমাতে বিয়োগ হইলেও আমার মৃত্যু হয়। এক দেহ ঘরে দুই বিরোধী, কেমন করিয়া মানুষের শান্তি হয়। ঘরে শান্তি না হইলে, কাহারও সঙ্গে শান্তি হয় না। এই দুইটা ঝগড়াটে লোক এক না হইলে, আমি তো কিছুতেই সুখী হইব না। হরি বিচার-পতি, তোমার কাছে অভিযোগ করি। এই যে লোকটা কেবল কলহ করে, ঘরে আগুন দিতে চায়, উহার কি শাস্তি নাই ? আত্মা কি আত্মার শত্রু নয় ? আর আত্মা কি আত্মার মিত্র নয় ? দুই ঠিক! এত দিনের পর উহা স্বীকার করিয়াছে যে, আর হরির ঘরে বিবাদ আনিবে না। এখন পশু মানুষ হইয়াছে, আগুন জল হইয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া এত দিনে উহার আক্কেল হইয়াছে। নীচের আমি আর উপরের আমির মধ্যপথে সন্ধি হইয়াছে। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হউক যে, দেবতা অসুরের যুদ্ধ থামিল। এখন আর কে কলহ করিবে ? নীচের আমি উঠিয়া উঠিয়া, হৃদয়ের কাছে আসিয়া, উচ্চ আমির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই এক হওয়াই যথার্থ স্বর্গ! একটা বিবেক, একটা তোমার কথা ; একটা হরির ঘর, একটা দস্যুর ঘর ; এ রকম আর দুইটা থাকিতে পারিবে না। এত দিনের পর দেখিতেছি, শান্তিরাস্তা খুলিয়া যাইতেছে। দুই সুর এক হইয়া হরির সুরের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। প্রেমময়, দুইজনকে এক করিয়া তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দাও। বিরোধ নাই, এক

হইয়া যাইবে। যোগীর তো, মা, এই সুখের অবস্থা। নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিরোধে তিনি তোমাকে ডাকিয়া থাকেন। কোন ভয় নাই যে, ঘরে দস্যু কি দুরন্ত পশু কিছু আসিবে। তাঁহার শত্রুকুল নির্ব্বংশ হইয়াছে। ষড়রিপুর এক ভাইও নাই। সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গরাজ্যটা নিষ্কণ্টক হওয়াতে, কি সুখই পাওয়া যায়! হরিকে লইয়া একেবারে নির্ভাবনায় থাকি। আমার সঙ্গে আমির মিল না হইলে কিছু হইবে না। কেহ আর তাহা না হইলে শান্ত হইতে পারিবে না। সকলের প্রাণে এই আশ্বাস বচন শুনাও যে, নববিধানের কল্যাণে শত্রুকুল বিনষ্ট হইয়াছে। মা আনন্দময়ীর শাসনে সমস্ত জগৎ নিরাপদ। যেখানে চলিয়া যাইতেছি, কোন ভয় নাই, অভয়ার আশীর্ব্বাদে অনায়াসে যোগ করিতে পারিব। এই যে ঘরাও বিবাদ, এটা যেন শীঘ্র মিটিয়া যায়। সমস্ত শান্তি কুশল হৃদয়রাজ্যে বিস্তার কর, শত্রুকুল বিনাশ কর। হৃদয়রাজ্যে নিষ্কণ্টকে তোমাকে লইয়া সুখী ও শান্ত হই, হে জননি, আমাদের আজ অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সুরের মিল

(হিমাচল, মঙ্গলবার, ১০ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক;
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতা, শান্তিদাতা, পৃথিবীতে দেখিতে পাই, মানুষ যত শান্তিপ্রিয় হয়, তত তাহার কাছে চীৎকার অসহ্য হইয়া উঠে। যত দিন মানুষ বাজার করে, ততদিন তাহার বাজারের গোলমাল লাগে না। কিন্তু যখন সে বাজার ছাড়িয়া বাড়ী যায়, তখন তাহার তো বাজারের গোল

কিছুতেই সহ্য হয় না। যত দিন সুরবোধ না হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র না জানে, সুরের বা তালের অমিল বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখন তাহার ভিতরে সঙ্গীত-শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিল, তখন তাহার সুর লয় বোধ হইল, তখন তাহার অল্প সঙ্গীতে অল্প অমিল দেখিলেই কাণে বড় লাগে। বিশ্রামের সময়, যোগের সময়, এখন আর কোলাহল কেন? ঈশ্বর, বাণিজ্যের রাস্তা তো ছাড়িয়াছি। এখন ঘরে বসিয়া, প্রধান সঙ্গীতবিৎ তুমি, তোমার গান শুনিব। বিদায় লইলাম সংসারের কাছে, সঙ্গীত শুনিব বলিয়া। এখানেও কেন আবার গোল? বন্ধুদের অশিক্ষিত সুরবিরোধী আওয়াজ-খানি যে আমার কাছে বজ্রধ্বনি। হরির কথা শুনিয়া, তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া, আবার ইহাদের পরামর্শ শুনিতে হইবে? নাথ, যদি তোমার সুরের সঙ্গে সকলের সুর মিলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের কাছে বসিয়া থাকিলেও ভাল। তুমি বলিতেছ, হাঁ, ইহারা বলিতেছে, না। অসহ্য বেলয় স্থান ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে অগ্নিসমান। থাকা যায় না, নাথ, থাকা যায় না। চুপ করিয়া বসিয়া, সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে এক হইয়া বসিয়া থাকিব। বলিব, ঠাকুর, বীণা না বাজাইয়া ইস্তক নাগাদ একটাও তো উপদেশ দিলে না। তোমার সকল বেদ যে ছন্দে লেখা। তুমি ক্রমাগত সুস্বরে তান লয় মানে আদেশ কর। আর যখন পৃথিবীর লোক আসিয়া উপদেশ দিতে থাকে, মনে হয়, যেন কি একটা জন্তু আসিয়া কর্কশ-স্বরে কি চীৎকার করিতেছে। যাহার পৃথিবীতে মার অমৃত স্বর শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই, সে গরীবের তো আর সহ্য হয় না। পৃথিবীকে যদি পরিত্রাণ দিবে, তো পৃথিবীর সুরবোধ করাও। দূর থেকে শুনিয়াই বলিব, ঐ মা বীণাপাণি আকাশ হইতে নামিতেছেন। তোমার কথা কি বলিব, তোমার ভক্ত নারদটা আগে থেকে গান গাইতে গাইতে আসে। সুরেতেই পরিচয় দেয় ভক্তেরা। তুমিও সুর করিয়া কথা কও, ভক্তেরাও

তাহাই করেন। একবার সুর শুনিলে বেসুর শুনিবার যো নাই। কি করিব, সংসারে থাকিতে গেলেই ইহা সহ্য করিতে হয়। হে প্রাণেশ্বর, বাগ্দেবী নাম ধরিলে কেন? গদ্যে কেন কথা কহিলে না? চীৎকার ক'রে, গোল ক'রে কেন উপদেশ দিলে না? যখন শুনিয়েছ সুর, গরীবের প্রার্থনা করিবার তো অধিকার আছে। আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই, আমি কাহাকেও উপদেশ দিতে আসি নাই। আমি মার গলায় আমার গলা মিলাইয়া দিব। আমি বাঁশি, তুমি সুর। তোমার সুর আমার কর্কশ সুরকে পুড়াইয়া দিয়াছে। আর যেন আমার বুদ্ধি, আমার সুর মনে মনে না ভাবি; কেবল তোমার বুদ্ধি, তোমার সুর বলিয়া তোমাকে প্রশংসা করি। তোমার কোমল কণ্ঠের স্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া, তোমার সঙ্গে আমাদের তেমনি মিলন হইবে, যেমন সরস্বতী ও সরস্বতী-পুত্রের মিল হয়, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লোহার স্বর্ণত্ব

(হিমাচল, বুধবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক;
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমাধার, হে নিষ্কলঙ্কপ্রভাব, লৌহময় কৃষ্ণবর্ণ আমরা স্বর্ণময় গৌরবর্ণ হইব বলিয়া, তোমার সূর্য্যোত্তাপে বসিয়া আছি। হে সত্যসূর্য্য, হে প্রেমসূর্য্য, আমাদের উপর তোমার তেজ ও কিরণ প্রত্যহ উপাসনার সময় প্রেরণ কর। এমন মূর্খ কে আছে, ঠাকুর, যে আপনার গা দেখিয়া আপনি, লৌহ কি, সুবর্ণ কি, তাহা জানিতে পারে না। গা দেখিলেই

বোঝা যায়, যে লোহা। ভ্রান্ত হইয়া মানুষ তাহাকে সোণা কি ক'রে বলিবে? এইটি লোহা; একটি কাল দাগ দেখিলেই, নাথ, বোঝা যায় যে, আমি তোমার নই। হাজার কেন ধ্যান, গান, প্রার্থনা করি না, পিতঃ, নৈতিক কলঙ্ক থাকিলে, খাঁটি সোণা হইলাম না। দৈনিক কার্য্যে অকলঙ্ক থাকিতে দাও। আর কলঙ্কটি ঢুকিলে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না; ঘরে শান্তি পবিত্রতা কিছুই থাকিতে পারে না। হরিস্বর্ণ আমার স্বর্ণ হইয়া যাক্। আমার হাতে হরি, চোখে হরি, কাণে হরি, মুখে হরি। কেমন করিয়া বুঝিব, নাথ, যখন দেখিব চারি দিকে হরিখণ্ড। কিন্তু যদি আমি একটা পাপ করিয়া ফেলি, অমনি যে নরকের দ্বার খুলিয়া গেল। অমনি বল, "যাও"। সাধু হইয়াও রেহাই নাই। আমি পাপী বলিয়া নির্দ্দোষীকে যদি দণ্ড দিই, তাহা হইলে আমার ইহকালে পরকালে তো গতি নাই। হরি, নিবেদন করি তব শ্রীপদে যে, সুবর্ণ হইতে যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে, সে সকল হইতে আমাকে দূরে রাখ। দয়াময়ি, যারা দুঃখ পায় আমাদের জন্য, যাহারা নির্দ্দোষ হইয়াও আমাদের দ্বারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষমা যেন আমরা পাই। আমি নিজ পাপ-বহনে অক্ষম। আমি নিরপরাধী গরীবকে বিনা দোষে দুঃখ দিব, ইহা ভক্তের হৃদয়ে বিষ, নরক। সে নরক ধুইলেও যাইবে না। সে চিরকালই রহিয়া গেল। নীতিতে এক হইব, সোণাতে এক হইব, তবেই তো তোমার সঙ্গে এক হইব। অন্যের দোষে যেন দোষী না হইতে হয়। এই জন্য, গতিনাথ, তুমি আশা, তুমিই উপায়। আর যেন জীব বৃদ্ধ বয়সে নূতন পাপ সঞ্চয় না করে। নরকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার কি প্রয়োজন? নাথ, সোণা করিয়া দাও। দীনবন্ধো, পৃথিবীর সমস্ত বিপদের মধ্যে নির্ম্মল থাকিয়া, তোমার স্পর্শে খাঁটি সোণা হইতে

পারি, একবার গরীব বলিয়া আমাদের মাথায় হাত দিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পুণ্যমূলক যোগ

(হিমাচল, বৃহস্পতিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক;
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে রসরঙ্গের হরি, অনেক কালের পরীক্ষায় বুঝিলাম, সিদ্ধান্ত করিলাম যে, মানুষ সহজে তোমার ভক্ত হইতে পারে, জ্ঞানী ও কর্ম্মীও হইতে পারে। একটু চেষ্টা করিলেই হয়। কিন্তু পুণ্যমূলক যোগধর্ম্ম এই দেখিতেছি, সার, অকৃত্রিম ধর্ম্ম। হে দয়াল হরি, বনেদটি একেবারে শক্ত হইলে বাড়ীটী কেমন হয়? আর ঐ যে ঘর সব লোকে করিতেছে, ওসব মায়ার ঘর, বৃষ্টির সময় পড়িয়া যায়, দিন কতক পরে কাঁচা গাঁথুনির ইঁটু বেরিয়ে পড়ে। যোগের বাড়ী কখন ইটের দ্বারা হয় না, নীরেট পাথরের ঘর। এক খানি পাথর খসিল না, কোটি কোটি বৎসরের ঘর। যোগীদের ভয় হয় না সেই জন্ত, কাঁচা ঘরে সকলেই কাঁদে। যোগঘরে যোগী বসিয়া কাঁদেও না, ভাবেও না। বলি সেই জন্ত, যে যোগের মূলে পুণ্য আছে, তাহাই দাও। অহঙ্কারকে একেবারে মাটি হইয়া গিয়া ভুলিয়া যাইব। স্বার্থপর হইবার যো থাকিবে না, কারণ আমিটাকে যে বিনাশ করিয়াছি। যোগের গৃহে প্রবেশের সময় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া লও, নিষ্কাম হইয়াছি কি না। তাহা না হইলে তো যোগী হইবার যো নাই। রিপু দমন হইল, মনটি সিদ্ধ হইল, প্রাণটি শীতল হইল, তখন যে যোগ হইল, তাহাতে কোন ভয় ভাবনা থাকে

না। প্রায় শুনিতে হইতেছে, নৌকা ডুবিল, মানুষ মরিল। ও কে মরিল? ও যে সাধু ভক্ত ছিল। তাহা হইলে কি হইবে, ও যে রাগী ছিল। মা, তাহাই বলি, এইরূপ পুণ্যমূলক যোগ ভিন্ন মানুষের নিশ্চিন্ত হইবার আশা নাই। মনকে খাঁটি করিয়া যোগে বসিলে আর বাকি থাকে না। প্রেমময়ি, অন্য কয় জন এ পথে, ও পথে যাইতেছে বলিয়া, কেন আমি তাহাদের পথে যাইব? দেখিতেছি, উহাদের নৌকায় ফুটো আছে। যোগের নৌকায় নীচে লোহা মোড়া। ডুবিবার মোটে ভয় নাই। অখাঁটি অসার সাধন পরিত্যাগ করিয়া, মায়ার ঘরে না থাকিয়া, পুণ্যময় যোগ সাধন করিয়া, যোগের ঘরে যোগেশ্বরীকে লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে থাকি, মা প্রেমময়ি, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্য হরি

(হিমাচল, শুক্রবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক,
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীননাথ, হে চিন্ময়, হরিনির্দ্ধারণ তত সহজ তো নয়, মানুষ যত মনে করে; যেমন পৃথিবীর মানুষেরা ভূত প্রেত অসার বস্তু মানে, তেমনি ধর্ম্মশীলেরাও হরির প্রেত ভূত বিশ্বাস করে ও মানে। প্রথম অবস্থাতে, হে পিতঃ, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পুতুল পূজা করে, পরে হরি পূজা করে। এই যে মধ্যের স্থানটি, নানা প্রকার স্বপ্নের খেলা, ভূত প্রেত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। পথিকেরা অনেক দিন থাকে এইরূপ রাজ্যে। পুতুল-পূজার সময় বোঝা যায়, এইটি পূজা করিলাম;

কিন্তু মনের ছায়াতে কি না হরির ছায়া মিশিয়া যায়, এই জন্য কেহ ধরিতে পারে না। যত দিন মানুষ ভ্রমমুক্ত না হইতেছে, তত দিন ভ্রান্তিতে পূজা করিবে। জীবন্ত দেব, লোককে কেমন করিয়া বুঝাইব, জীবনে কিরূপে সুখ হয়। পাথর ভজিয়া ব্রহ্ম পাইবে? যে দেবতা আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না, সে অন্যকে দিবে? এটা কেমন করিয়া ঠিক হইবে যে, প্রাণদাতা মোক্ষদাতা হরিকে আমরা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পূজা করিতেছি, আর মানুষ তবুও বলিতেছে, আমি নির্ম্মল হইতেছি না। একদিন হরিকে দেখিলাম, আর তাহার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন? হরির কাছে একটী ছোট প্রার্থনা করিলাম, আর নগদ পুণ্য ফল লইয়া উঠিলাম, ইহা যদি না হয়, তবে আমার পূজা ঠিক নয়, হরিকে আমি ঠিক করিতে পারি নাই, আমার পূজা ভুল। হে হরি, মানুষকে এই মধ্যপথ হইতে বাঁচাও। তুমি বলিতেছ, "জীব, কাহাকে ভজিতেছিস্? আমার যদি কলঙ্ক থাকে, যদি আমার পূজা করিয়াও মানুষ শুদ্ধ ও ভাল না হয়, তাহা হইলে আমি ভগবান্ নই।" তোমার কাছে মানুষ কাঁদিল না, অথচ বলিল, "দেখিলে, কুড়ি বৎসর কাঁদিলাম, আমার উপায় কিছু হরি করিলেন না।" সমস্ত দেবতারা বলিলেন, "না, কৈ, ও তো একবারও হরির কাছে প্রার্থনা করে নাই।"—কল্পনার হরিকে পূজা করিলে কি হইবে? ঘরের ভিতর মায়া রাক্ষসী আসিয়া সমস্ত প্রার্থনা উপাসনা খাইতেছে—প্রাণ বিয়োগ হইবে রাক্ষসীর হাতে, লক্ষ্মীপুরী থেকে, হরি, অলক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দাও। খাঁটি লক্ষ্মী হইয়া একবার সম্মুখে ব'স, দেখিয়া লই যে, পূজা করিলাম, আর রক্ত চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ঠিক মা লক্ষ্মী, কাছে এস। যখন এলে, সত্যেতে মন প্রাণ ঢেলে দিলাম। পরম পিতঃ, দুঃখীর প্রার্থনাটী শোন। এ বিষয়ে অনেকে ভাবেন না। যদি ব্রাহ্মগুলিকে অসত্য হইতে সত্য হরির দিকে টানিয়া আন, তাহা হইলেই তোমার 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নাম

যথার্থ পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে। হরি ঠিক হইলেই, এক দিনেই রাতারাতি হাজার হাজার মানুষ ভাল হইয়া যাইবে। কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি, এই বলিয়া মানুষ সংসারবনে ঘুরিয়া বেড়াক্, তাহার পরে আসিয়া দীক্ষিত হইবে। হা ঈশ্বর, কোথায় রহিলে? যথার্থ হরি আসিয়াছেন, এই বলিয়া ভারত জাগিয়া উঠুক। আমার ভাইগুলি, আমার অনেক দিনের প্রিয়তম ভাইগুলি দেখিয়ে দিন্ যে, তাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ হরির ঝণ্ডা উড়িতেছে। জীবন্ত হরি, জ্বলন্ত হরি, তোমাকে সত্য সত্য দেখিয়া, তুমি যে সত্য, ইহা বিশ্বাস করিব, ভ্রম মায়া হইতে মুক্ত হইয়া, তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া, আর ইচ্ছামত হরি নির্ম্মাণ করিব না, মা, আজ অনুগ্রহ করিয়া, তোমার জ্বলন্ত হস্ত আমাদের মাথায় রাখিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরি পরম ধন

(হিমাচল, শনিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক,
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে পরম ধন, যত দিন মানুষের ধনকে ধন বোধ হয়, তত দিন তোমার প্রতি মানুষের প্রেম বিভক্ত হয়, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, হৃদয়ের অর্দ্ধেক প্রেম দিয়া তোমাকে পূজা করে; আসল সাধন সেই সাধন, যাতে তুমি আর ধন এক হইয়া যায়। পিতঃ, বিরোধীদের সহিত কত দিন বলপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া থাকিব? এই দুইয়ের মধ্যে মিলন, আবার দেখি, দুই দিন পরে বিবাদ। ইচ্ছা হয়, ধনটা স্বতন্ত্র বস্তু না থাকিয়া, তোমার ভিতরে গিয়া লীন হইয়া

যায়, সমস্ত পৃথিবীর সোণা হরিসোণা হইয়া যায়, যত রত্নরাশি ব্রহ্মরত্ন হইয়া যায়। দেখিতে পাই, বড় বড় ভক্তদের প্রাণটাকেও সময় সময় সংসারে টানে। দেখি, ধনের অভাবে কষ্ট পায় লোকে। হরি, যদি তুমি হ'লে সোণা, রূপা, জমিদারী, তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া কেন মানুষ অন্য স্থানে যাইবে? যার মার চরণের নূপুরে শত শত, সহস্র সহস্র রত্নরাশি রহিয়াছে, সে আবার ধনের জন্য কাঁদিবে? ধন নাই কাহার বাড়ীতে? লক্ষ্মী নাই যাহার বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে মা লক্ষ্মী এসে বাস করিতেছেন, আমাদের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পূর্ণ, আমাদের বাক্সে সর্ব্বদা টাকা কড়ি। টাকার সমুদ্র—তার উপর জীবনতরী চালাইতেছি। মাতৃধনে অধিকারী যখন, তখন আবার ধনকষ্ট কি? লক্ষ্মীকে যখন বাঁধিয়া রাখিয়াছি ঘরে, তখন আমাদের আবার টাকার ভাবনা কি? যত সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তোমার। হে ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে আর ধনকে আলাদা ক'রে ফেলে দুঃখে পড়িয়াছে। যখন দুই চক্ষে দেখিব, দুই এক হইয়াছে —তখন ঐহিক পারত্রিক দুইই লাভ করিলাম। গোড়া পেলেই ফল পাওয়া যায়। একান্তমনে লক্ষ্মীকে হৃদয়ের ভিতর, পরিবারের ভিতর স্থাপন করিয়া, ধনকামনা, ধনকষ্ট একেবারে ভুলিয়া যাইব। হরিধনে ধনী হইব, ব্রহ্মধনে ধনী হইব, অসার বস্তুতে আর লোভী হইব না, পৃথিবীর সামান্য ধনে ধনী হইতে চাহিব না, হরির চরণধনে অধিকারী হইয়া নিত্য সুখে সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া, আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মার অন্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা

(হিমাচল, রবিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে যোগীর সম্বল, তোমার শান্তিনিকেতনের দ্বারে সমস্ত ভিখারীরা ক্রমাগত মনের দুঃখে চীৎকার করিতেছে—ভগবান্, মুক্তি দাও, শান্তিজল দাও, প্রাণ যায়, অন্ন দাও, ক্ষুধায় প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে, রজনীতে ক্রমাগত এই বিলাপধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এ দলের ভিতরে কি আমরা নাই? আছি। আমরাও তোমার ভিখারীদলের মধ্যে, ভিড়েতে আমরাও চীৎকার করিতেছি, কাঁদিতেছি। কিন্তু, আনন্দময়ি, তোমার অন্তঃপুরে তোমার প্রিয়তম সন্তানগণ জড় হ'য়ে তোমার সহিত খেলা করিতেছেন। দুঃখ বিলাপ ক্রন্দন, এ সকল তব দ্বারে কালও ছিল, আজও আছে, কালও হ'বে। আনন্দ, ভক্তি, প্রেম, উচ্ছ্বাস এ সকল তোমার অন্তঃপুরে। এখানে চক্ষু হইতে দুঃখের জল, ওখানে চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু। ঐটি তোমার লীলার স্থান। তুমি এদের প্রার্থনা শুনিতেছ, পরিত্রাণ করিতেছ। ওদের মজাইতেছ, তোমার প্রেমে। ভালবাস দুই দলকেই। হে যোগেশ্বরি, ঐ স্থানে বসিয়া, মা বলিয়া ডাকিতে চাই। আর যেন দ্বারে দাঁড়াইয়া, বস্ত্র দাও, শান্তি দাও, বলিয়া চীৎকার না করিতে হয়। অনেক দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিয়াছি, আর কেন? এখন খেলিব, নাচিব, ডুবিব, ডুবাইব, মাতিব, মাতাইব। এই লীলারসরঙ্গের সময়, যার জন্য এত কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব ক্রন্দন বিলাপ শেষ হউক। তোমার অন্তঃপুরের প্রশস্ত দালানে ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া, আমরা তোমার হাত ধরিয়া খেলা করি। এই সুখ দাও, দেবি। সকল

উপাসক তো তোমারই; কিন্তু বাহিরের উপাসক যাঁহারা, বড় দুঃখী তাঁহারা। একবার বল, "ভক্তদের কান্না কাটির দিন নাই, আর দ্বারে থাকিতে কাহাকেও দিব না।" হাত ধরিয়া ল'য়ে চল ভিতরে। যত মহাত্মাদের সঙ্গে মিলিয়া, শ্রীভাগবত শ্রবণ করি, প্রেমময়ীর ভারতলীলার কথা ভাল করিয়া শুনি। তোমার হাত হইতে কাড়িয়া খাবার খাইব; তোমার হাত ছিনাইয়া লইব, প্রার্থনা না ক'রে। হে দেবি, স্পষ্টস্বরে বল যে, সেই সময় ভক্তদের আসিয়াছে। আর মনে যে রাগ হইবে, তার সময় কই? তাহার ফুর্‌শোৎ কই। নাচিতেই দিন কাটাইতে হইবে যখন, তখন আর অবকাশ কই, নাথ, যে পাপ করিব? আর মনে হয় যে, সময় অল্প, দেখাটা কবে হইবে। সুতরাং ছাড়িয়া যাইবার আর যো কই? উপাসনা কি? খেলা করা। প্রাতঃকাল হইতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত খেলা করা। এ পাহাড়ে কেবল যোগেশ্বরীর খেলা। প্রেমস্বরূপ, তোমার হাতের রচিত এই সকল পর্ব্বত তোমার গম্ভীর লীলা প্রদর্শনের জন্য, তোমার ভক্ত যোগী সন্তানদিগের যোগ শিখাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। যে আসে, প্রশস্ত ক্রোড়ে হিমালয় তাহাকে স্থান দেন। এমনি তৈয়ার করিয়া তুলিলেন যে, গুরুচরণে বার বার প্রণাম না ক'রে কেহই থাকিতে পারে না। এই অটল অচল পর্ব্বত, যিনি সেই বেদান্ত উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি কত সংসারীকে উদ্ধার করিতেছেন, এমন গুরু পৃথিবীতে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ হিমালয় গুরু-ক্রোড়ে আমাদিগকে এত দিন স্থান দিয়া যোগ শিক্ষা দিয়াছেন। জয় জয় হিমালয়ের জয়। এ গুরুর চেলা হইব। চিরদিন ইঁহার শিষ্য হইয়া থাকিব। যত পাইলাম ধন, যেন তাহা চিরধন হয়। মনটা হিমালয়ে লাগিয়া গিয়াছে। যে গুরু দীক্ষাগুরু হইলেন, শিষ্য কি তাঁহাকে আর ছাড়িতে পারে? অতএব, হে যোগেশ্বরি, এই যে তোমার

অন্তঃপুরের যোগলীলা হিমালয় শিখাইলেন, এই সকল ব্যাপার চিরদিন সত্য করিয়া হৃদয়ে রাখিব। পাহাড় তো দোলে না, শিষ্যও টলিবে না। পাহাড় টলিবে না, শিষ্যও সংসারের ঝড়েতে টলিবে না। হে কল্যাণময়ি, এইখানে চিরকাল থাকিতে দাও। আর কলঙ্কের ঘরে কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না হয়। গিরিবাসী হে লীলাধারী ব্রহ্ম, চিরদিন তোমার এই সকল প্রেমের লীলা দেখিব। সিন্ধুক আজ বন্ধ করি। খোলেতে আজ পূরি টাকা কড়ি যোগের রত্ন, সমুদায় বাঁধি বুকের ভিতরে। হে ঈশ্বর, যোগী করিলে, তো চিরযোগী কর। যেখানে থাকিব, মনে হইবে, যেন খুব উচ্চ বৈকুণ্ঠধামের কৈলাসপুরীতে বসিয়া সুবাতাস সম্ভোগ করিতেছি, যত চিন্ময় পুরুষ নাচিতেছেন, ভাবে প্রেমে ঢুলিতেছেন, গায় গায় পড়িতেছেন। এইখানেই আছি, যাচ্ছি না। যাইব কোথায়? নিত্যানন্দের রাজ্য ছাড়িয়া যাইব কোথায়? কৈলাসপুরী আবিষ্কার হইল, ছাড়িবে কে? এই যোগিদলে রহিল প্রাণ, ইহকাল পরকালের জন্য। হে প্রেমস্বরূপ, যেখানে যাই ঐ গিরিবাসী, মহাদেবচরণে প্রণতি, দেবী প্রকৃতিদেবীর পদারবিন্দে প্রমত্ত। এস, দয়াময়, আনন্দের সহিত কাছে এসে তোমার ক'রে নাও চিরদিনের জন্য। হিমালয়ে যোগে প্রমত্ত হইয়া, মহাদেব নাম কীর্ত্তন, আনন্দ সম্ভোগ, পুণ্য সঞ্চয়—এই করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইতে পারি, কৃপাসিন্ধো, আমাদের সকলের অযোগী মস্তকের উপর হাত রাখিয়া, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার রাজ্যে চিরবসন্ত

(আম্বালা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, সংসার অসার, ইহা যেন আমরা বুঝিলাম ; কিন্তু ধর্ম্ম কেন অসার হইয়া পড়ে। ধন মান অনিত্য মানিয়াছি, কিন্তু উপাসনা, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, এ সকল কেন অনিত্য বস্তু হইয়া যায়। পিতঃ, ধর্ম্ম, দেখিতেছি, সার ও অসার দুই রূপই আছে। তোমার আশ্রিতদিগকে অসার হইতে দূরে রাখ। ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবঞ্চনা থাকিলে, মানুষের তো আশা নাই। ঠাকুর, তুমি কিনা নিত্য, যে ধর্ম্মে অনিত্য আছে, সে তোমার নহে। তোমার রাজ্যে শীত গ্রীষ্ম তো নাই, আনন্দময়ীর দেশে চিরবসন্ত। ওখানে যদি কেহ এক দিনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাকে নাকি সেখানে রাখা হয় না। তোমার দেবালয়ে যে বলে, "আজ ভাল উপাসনা হয় নাই, কাল যেমন হইয়াছিল", তাহাকে তখনি দেবালয় হইতে দূর করিয়া দাও। কেহ যে বলিবেন, "মার মুখে দিন রাত্রি আছে, মা সকালে হাসেন, রাত্রিতে কাঁদেন"—কোন মূর্খ এমন কথা বলে ? মা আমার আনন্দময়ী। সদাই হাসিতেছেন। এই জীবন থাকিতে থাকিতে, তোমার ঐ চিরবসন্তের রাজ্যেতে গিয়া যদি বাস করিতে পারি, তাহা হইলে একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাই। এই যে যোগরাজ্য, এখানে অষ্টপ্রহর নাচিলেই হইল, কুবেরের ধন যেন ছড়ান হইয়াছে সর্ব্বদাই, মার মুখের হাসি থামে না থামে না, গাছে ফুল শুকায় না শুকায় না, ফোয়ারার জল বন্ধ আর হয় না হয় না। চারিদিকে সুখের লক্ষণ ! যোগিজনের মনোলোভা শোভা, এই জন্য তিনি মার কোমল চরণ বুকে লইয়া, এই খানেই প'ড়ে থাকেন। ক্রমে ক্রমে দুঃখের দরজা একেবারে

বদ্ধ করিয়া দিয়া, তোমার দেবালয়ে বসিয়া, অনন্তকাল প্রেম ও যোগে ডুবিয়া থাকিব, মা, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার সকলে প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাগবতী তনু ভিক্ষা

(দিল্লী, শুক্রবার, ২০শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৫ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে গুণের সাগর, সাধু মন অসাধু তনু বহন করিতে পারে না, যেমন স্নান করিয়া পরিষ্কার করিয়াছে যে অঙ্গ, সে ময়লা বস্ত্র পরিধান করিতে চায় না। শরীর যদি পাপ অন্ধকারে মলিন থাকে, তবে মন কি ক'রে ভাল হইবে ? তোমার প্রসাদে যাহার মন একটু ভাল হইয়া থাকে, তাহার শরীর সুস্থ করিতে যে খুব চেষ্টা হইবে। শরীরের পোষাকটা মনের ভাল লাগে, যখন উহা মনের মত হয়। এই পা যদি কেবলই সংসারের দিকে যেতে চায়, এই হাত দুইটা যদি কেবল পাপ করিতে যায়, এই চক্ষু দুটির যদি কেবল নরকের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে এ সকলে আমার কাজ কি ? হে দীননাথ, ব্রহ্মতনুর স্রষ্টা, ভাগবতী তনু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুবা এ শরীরের দুর্গন্ধ লইয়া আর চলিতে পারা যায় না। অন্তরের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। জননীর সৌরভ সন্তানতনুতে দাও। তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিলিল, তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক্ হইল। এই জন্য, দেহপতি, তব পদে মিনতি যে, এই দেহকে তব কৃপায় শুদ্ধ করিয়া দাও। দেহকে যে লোকে ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছে। হে তেজোময়, তোমার

প্রসাদে এই দেহকে আমাদের আনন্দের বস্তু করিতে দাও। এই দেহ সমস্ত পবিত্রবস্তুর মিলনের স্থান হউক। যত শাস্ত্রের মিলনে দেহ শাস্ত্র হউক। চক্ষু কর্ণের বিরোধ শেষ হউক। তখন বলিব, চক্ষুযুগল কি সুন্দর, সকল বস্তুতেই হরি দেখে। পা দুইটি কেমন শুদ্ধ, কেবল পুণ্যেরই পথে ধাবিত হয়। কৃপা ক'রে দেহকে পবিত্র বস্ত্রের মত ক'রে দাও। মনের ভিতরে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার প্রতি বাড়িবে, তেমনি দেহ শুদ্ধ হইয়া যেন বিমল প্রভা বিকীর্ণ করে। দীননাথ, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন শীঘ্র শীঘ্র দেহ মনের বিরোধ মিটাইয়া, ভাগবতী তনু লাভ করি। এই দেহকে সাধু করিয়া লইব, তোমার পবিত্র চরণস্পর্শে দেহ মন দুটিকে খাঁটি করিয়া, তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া, চিরদিনের মত শুদ্ধ ও সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

এক হরিতে সমস্ত লাভ

(দিল্লী, শনিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৬ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের দেবতা, মানুষ হইয়া এত কাল আমরা দুই দিক বিধিমতে রাখিলাম। কিন্তু, নাথ, বুঝিলাম কি, দেখিলাম কি? পরিণামে না এদিক হইল, না ওদিক হইল। আমরা কেবল এই ভাবি— দুই দিক কি হয় না? পাপও একটু করিব, পুণ্যও একটু করিব। কতক টাকা দেবালয়ে দিব, আর কতক টাকা সংসারে সুরালয়ে দিব। ইহকালের ছটো অপবিত্র সুখও যাহাতে হয়, তাহা করিব, আবার বৈকুণ্ঠ

যাহাতে হয়, তাহাও করিব। যথার্থ ভাগবতকথা কি আমরা বুঝিয়াছি ? তুমি যাঁহাকে টানিয়াছ যুগে যুগে, তাঁহারই প্রাণ তুমি একেবারে কাড়িয়া লইয়াছ। তিনি বলেন, আমার প্রাণকে আর কিছুতে আকর্ষণ করিতে পারে না, হরিসুধা ব্যতীত। পরমেশ্বর, যে তোমার হয়, সে কি আর কখন অন্য কাহারও হয় ? সে যে জানে না অন্য কিছু। যে সতী হয়, সে কি কাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারে ? হরি হে, আমরা তোমার আশ্রিত, এখন এই চাই যে, মনটা এমনি তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি আনিয়া দিলেও মনকে টানিতে পারে না। হরির বাঁশি একবার বাজিলেই, সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া চৈতন্যবিহীন হইয়া ঐদিকে দৌড়িল। অন্যের কর্ণে ও সুর কিছু নহে। যেমন সুর তাঁহার কাণে লাগিল, শরীর মন কোথায় রহিল, একেবারে হরিচরণে গিয়া বসিলেন। দেখ, হরি, যে এই সকল কথা বক্তৃতার ছলে বলে, সে একজন কাপুরুষ নরাধম। কারণ, যে মিথ্যা মিথ্যা এত সকল কথা না দেখিয়া, না জানিয়া বলে, সে পাপ করে। হরি হে, জীবের মঙ্গল যদি চাহিবে, তবে এই রকম কর। যে বলে, "আমি হরিকেও ভালবাসি, আমাকেও ভালবাসি", তাহার কিছুই হয় না। আমরা ঢের দেখিয়াছি। মা, তোমার কত সন্তানকে এই করিয়া মরিতে দেখিয়াছি, তারা চায় দুই। সংসারের এই যে লীলা, খুব দেখিলাম। তোমাকে যিনি পেয়েছেন, তিনি তোমাতে সকলই পাইয়াছেন। হে দয়াময়ি, তোমার ছেলেরা কত কাল এই রকম দুই দিকে ঘুরিবে ? সকলই যে পাওয়া যায় ঐ চরণে। সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তোমার শ্রীচরণ পাইলে। এখন কেবল সর্ব্বদা দেখি যে, মনটা তোমার ভিতরে আছে। তোমার ছেলেগুলি তোমার পুণ্যসাগরে ডুবিয়া গলিয়া যাউক। দেখিয়াছি ভাল ক'রে, যে পাঁচ দিক করিতে গিয়াছে, তার শেষ ভয়ানক। আর যিনি তোমাকে চাইয়া সমস্ত

পাইয়াছেন, দেখিলাম, তিনিই দুইকে এক করিয়া, পরম সুখে সুখী হইলেন। হরি, তোমার দিকে মনকে টানিয়া রাখিয়া দাও। তোমার মত আর আমাদের কেহই নাই। অমন পিতা মাতা বন্ধু কেহ নাই। যখন অন্য বস্তু কিছু ভাল লাগে না, যখন অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে না, তখন একমাত্র হরিধনই সর্ব্বস্ব ধন মানুষের। চিরদিন যেন তোমার সেই ভক্তিযমুনার ধারে, তোমার সুন্দর বংশী শুনিয়া, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, তোমার শ্রীচরণে প্রাণকে বিকাইয়া রাখি, হরি, অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আশ্বাস বিতরণ

(দিল্লী, রবিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৭ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের অন্তরতম ঈশ্বর, আমরা যেখানে যাই-তেছি, যেখানে বসিতেছি, সে স্থান পুণ্যের সৌরভে কি সুগন্ধ হইতেছে ? আমরা কি আতরের মত হইয়া দৌড়িতেছি ? তোমার ভাগবততত্ত্বকথায় যে স্বর্গীয় সৌরভ, তাহা কি ছড়াইতেছি ? দীনবন্ধো, পাপী হই, আর যাহাই হই, তুমি আমাদের সাক্ষী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছ। জগতের লোকের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব আছে, তোমাকে আপন করে ; এই জন্য, হে বিশ্বেশ্বর, তুমি তোমার কতিপয় বিশ্বাসী সন্তানকে ডাকিয়া বলিয়াছ, ঈশ্বরবিদ্রোহীদের মধ্যে ব্রহ্মশান্তি দাও। হে পিতঃ, যুগে যুগে তুমি এক এক দল বিশ্বাসী প্রস্তুত করিয়া, তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ। তুমি নিজে দয়া করিয়া, এক এক দলকে তোমার নাম

প্রচার করিবার ভার দাও। তাহাদের তুমি রক্ষা কর, অনেক অলৌকিক ব্যাপার তাহাদের দেখাইয়া দাও, তোমার বিশ্বাসীদের সঙ্গে চিরসম্বন্ধ স্থাপন ক'রে। তোমার কথা শুনিয়া, তোমার বিশ্বাসিদল নানা স্থানে গিয়া পাগল হইয়া, তোমার কথা প্রচার করেন। যদি তোমার অনুগ্রহে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে আমাদের কার্য্যেতে সুগন্ধ বাহির হউক; আমাদের কথায় সুগন্ধ, শরীর মন হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া চারিদিক আমোদিত করুক। নাথ, যেন আমরা পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি, যাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না, তাহারা যেন তোমায় দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হয়; যাহারা তোমায় ভালবাসিতে পারে না, তাহারা যেন তোমাকে প্রাণ দিয়া প্রেম করিতে পারে। যদি আমরা মন দিই তোমাকে, তাহা হইলে, দীনবন্ধো, আমাদের কথা এমন নরম হইবে, আমাদের কাজ এত সুন্দর হইবে যে, আমাদের দেখে পৃথিবীর তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। হরির প্রেমলীলার সাক্ষ্য দিব, হরি আমাদের মধ্যে এই এই লীলা দেখাইতেছেন। এ কলিযুগের মধ্যেও হরিপ্রেমে মানুষ পাগল হইয়া যায়। আমরা দেখাই যেন দিন দিন, কাণা চক্ষু পাইয়াছে, কালা শুনিতে পাইতেছে। কৃতার্থ করিবে বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিতেছে। তোমাকে পৃথিবী মানিবে না? তোমার নববিধানের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমস্ত চরিত্র যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। ঈশ্বর, এ সকল দেখিয়া মানুষ কেন চুপ করিয়া থাকিবে? প্রেমের সুধা যাহা পেট ভ'রে খাইয়াছি, তাহা দশ জনকে খাওয়াই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নবদ্বীপ হইয়া হরিপ্রেমে মত্ত হউক। দীনবন্ধো, তুমি যুগে যুগে যাহা করিলে, ঘোর কলিযুগে তাহাই কর। আশ্রিত ভৃত্যদিগের মুখ তুলিয়া কথা কহিবার মত কর। বলিব, ছিলাম বড় দরিদ্র দীন, এখন হইয়াছি খুব ধনী। আগে

ভগবানের শাস্ত্র কিছু জানিতাম না, এখন প্রাণের ভিতরে অনাদি বেদ বেদান্ত শুনিতেছি। হে করুণাসিন্ধো, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সকল গূঢ় হরিকথা আমাদিগের ভিতরে আসিয়া শুনাইলে, সেইগুলি জগতে প্রচার করিয়া, সকলকে হরিপ্রেমে মাতাই। আরও তোমার প্রেমে মাতিব, মনে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, নির্ভয়ে চারিদিকে প্রচার করিব, সকলকে তোমার প্রেমে মত্ত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে আমরা পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ '

.দবসন্তানত্ব

(দিল্লী, সোমবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
৮ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে যোগেশ্বর, মানুষ আপনার দোষে আপনাকে কত নীচ করে। ছিল সে দেবসন্তান, ব্রহ্মতনয়, তার পরে সে হইল মানুষ, তার পরে জন্তু। তোমার ছেলে হ'য়ে মানুষ চতুষ্পদের সঙ্গে মিলিল। যে শরীরে দেবতাদিগের রক্ত চলিত, সেই শরীরে এখন কাম ক্রোধাদির রক্ত চলিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এত আত্মবিস্মৃতি মানুষের হয়? আমরা মনে করি, আমরা শূদ্র, কিন্তু, হরি, পুত্র কখন শূদ্র হইতে পারে না। এই পৃথিবীর পশুত্ব আসিয়া আমাদের ভিতরের ব্রহ্মতেজকে চাপিয়া দেয়। মানুষের রক্ত দেবতার রক্ত। যদি তোমাকে মানুষ ভালবাসে, সেবা করে, তবে সে ব্রহ্মতনয়ের ন্যায় থাকিতে পারে। মার মত মুখ ছেলের হয়, বাপের মত অঙ্গসৌষ্ঠব সন্তানের হয়। মানুষ এমনি ভু'লে

গেল যে, ইচ্ছা ক'রে গিয়ে বলে, আমি জন্তু। যে মানুষকে তুমি স্বর্গের সিংহাসনে বসাইবে, সেই মানুষ কি না শূকরের সঙ্গে মিশিয়া বিষ্ঠা খাইতেছে। যে মানুষ রাজকুমারের বিক্রম দেখাইবে, আজ সেই মানুষ পঙ্গু, অন্ধ, মৃতপ্রায়। ব্রহ্ম, ব্রহ্মকুলে কেন এমন ভ্রষ্ট আচার? জাতিচ্যুত হইয়া নীচে পড়িল কেমন ক'রে? হরি, তোমার মতন তেজশ্রী ছেলে হইয়া কে দেখাবে? মানুষ কাহার গর্ভে জন্মিয়াছিল, ভুলিয়া গেল। মানুষের জন্ম তো ভগবতীর উদরে। তোমাকে, মা, ভু'লে গেলাম? এখন পিতা মাতা বঞ্চনা, বংশ অস্বীকার! কেন না, তাহা না হইলে অসদ্ব্যবসায় করিতে পারিব না। সংসারের নীচ সুখের জন্য মানুষ পিতা মাতাকে অস্বীকার করে। কি ভয়ানক! মা, আমরা তোমাকে কখন অস্বীকার করিব না। যখন স্বর্গে ছিলাম, বাল্য ব্যবহার করিতাম, সকালে বৈকালে সাধু ভাইগুলির হাত ধরিয়া কত যোগের খেলা খেলিয়া, দেবরাজ্যের নিয়ম পালন করিতাম। এই পৃথিবীতে আসিয়া কোথায় গেল সে উচ্চ জীবন? এই সেই শরীর, এ রক্তের ভিতরে এখনও সেই হরি বিরাজিত। তবে কেন আর নীচ ব্যবহার এখনও? হে মাতঃ, দেশে যেমন তোমার পূজা আজ আরম্ভ হইল, হৃদয়ে তেমনি যথার্থ তোমার পূজা আমরা করি। সমস্ত মানুষ তোমার সন্তান। আজ আনন্দের দিন, তুমি যে চারিদিকে তোমার ভক্তদের মধ্যে তোমার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছ। আজ তোমার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া তোমার নিকট আসিলাম। যিনি বিপদকালের বন্ধু, তাঁহাকে কি অস্বীকার করিতে পারি? দেবীপূজা এ দেশে লুপ্ত হইল, আবার দেবীচরণ সকল সন্তানে মিলিয়া পূজা করিতে থাকুক। দেবি, দেবী বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি তারিণী, মোক্ষদায়িনী, তোমার চরণতলে মা মা ব'লে ভক্তির সহিত পড়িয়া থাকিব, আর শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া,

আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌহার্দ্য-মুক্তি

(কাণপুর, বুধবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১০ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমরাজ, শরণাগতবৎসল, ভক্তকে ভালবাসিতে, ভক্তের মান রক্ষা করিতে তুমি যেমন আছ, আর এমন কে আছে? তোমার মত বন্ধু আর কে আছে? বন্ধু হ'য়ে, দীনবন্ধো, ভক্তের সেবা দিবানিশি করিতেছ। বিশ্বাসীর চক্ষে পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাহাতে তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর দুঃখে তুমি বড় কাতর হও। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়িয়া আছে, বন্ধু নাই, যাহারা ছিল, ক্রমে ক্রমে ছাড়িল; তুমি গেলে তাহার সেবা করিতে। অবিশ্রান্ত সেবা কর। কাছে আসিয়া বসিয়া কত রকমে প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা, মাতা, মুক্তিদাতা বলিয়া পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি, ইহার ভিতরে অমৃত রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকায়, আমার ব্যারাম হইলে যেন তোমারও ব্যারাম হইয়াছে। জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয়স্বজন আছে, তাহারা সেবা করে, কিন্তু তাহাদের মুখ শুকায় না। তাহারা নিজেরা আলগা হইয়া সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে। ভক্ত বলিয়াছে, আমার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে না; ঈসারায় হরি তাহা বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হইতে নিজে কাছে

গিয়া বসিলেন। এ নববিধানের হরি যেন ভক্তের প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছেন। আমি যখন ক্ষেপি, উনিও তখন ক্ষেপেন। মনে মনে যোগবন্ধনে উনি এক হইয়া, বন্ধু হইয়া সেবা করেন। প্রেমেতে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হরি অধম হইয়াছেন, অনন্ত প্রেমের ভারে। আমার হরি, বাজারে কি পাওয়া যায়, তাহাই খুঁজিতে যান। বন্ধুতা বড় ভয়ানক জিনিষ। না দেখিলেও বাঁচি না, দেখিলেও মনের ভিতরের দুঃখ যায় না, সেবা করিলেও মন তুষ্ট হয় না। অধম নরাধমকে কি বন্ধুত্বে বরণ করিয়াছ? তবে আমার আর ভাবনা কি? কি লোকে অগ্রাহ্য করিল, কে দুটো শক্ত কথা বলিল, কে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কে এখন আমাকে তত ভালবাসে না, এসব কি আর আমার লাগে? হে প্রেমময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে হৃদয়ের বন্ধু মনে করিয়া সৌহার্দ্দ্যমুক্তি লাভ করিব ও তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া তোমার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে এক হইয়া যাইব। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শান্তি

(কাণপুর, শুক্রবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১২ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে অপার শান্তি, হে নিত্য কুশল, ভবসমুদ্রে শান্তিঘাট তুমি। জীবের জীবনতরী চারিদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই শান্তিঘাটে উপস্থিত হয়, যেখানে তুফান নাই, ঝড় নাই, যেখানে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সংসারের উত্তপ্ত জীবদিগকে শীতল করে। হে মধুরভাষী বন্ধু, যখন

সকলের কথা ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তোমার সুধামাখা কথা একটি একটি অমৃতবিন্দুর ন্যায় মনের ভিতরে পড়িয়া আরও শান্তি দেয়। হে শ্রীনাথ, তোমার শ্রী সংসারদগ্ধ চক্ষুকে আরাম দেয়। হে লক্ষ্মি, যদি আনিলে তব সন্নিধানে, জীবনকে ক্রমে ক্রমে শান্তিময় কর। তোমাকে দেখিলেই শান্তি হইবে, কথা তোমার শুনিলেই শান্তি হইবে, এমন অবস্থায় আনিয়া ফেল, তবে মানব জনম সফল হইবে; এই সাধন ভজন যাহা কিছু জীব করে, কেবল শান্তির জন্য। যখন প্রাণটা শীতল হয়, তখন মনের সাধে শ্রীমতীর গুণগান করে। যাহারা শান্তি পেলে না, তাহাদের উপাসনা মিথ্যা, ভজন সাধন মিথ্যা। সংসারের লোকদের মাথাগুলো যেন অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে। উপাসনাটা খুব মধুর কর। যদি শান্তি না পায়, তবে তোমাকে জীব ডাকিবে কেন, এত একতারা গেরুয়া লইবার আবশ্যক কি? এস, মা লক্ষ্মি, মাথায় হাত দিয়া খুব শান্তি দাও। শান্তি দিয়া জীবকে লোভী কর, আরও শান্তির জন্য। সকলের বুকে হাত দিয়া দেখিব, মা, তারা শান্তি পাইয়াছে কি না মাকে ডাকিয়া। যেন ঠিক প্রস্ফুটিত কমল ফুল! এমন যে, অন্য দশ জন যদি আসিয়া তাহাতে মাথা দেয়, তাহা হইলেও তাহাদের শান্তি হয়। শোকের জ্বালা নিবাইয়া দাও, আর, কমলা, সকল হৃদয়ে শান্তির কমল ফুল ফুটাইয়া দাও। চিত্ত-সরোবরে তোমার পাদপদ্ম ভাসিতেছে, এইটি দেখিব। ঐ চরণকমলস্পর্শে সমস্ত শরীর মনকে শান্ত করিব, আর শান্তিসলিলে ডুবিয়া মা মা করিয়া ডাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার সাধ মেটান

(কাণপুর, শনিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৩ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমের আকর ঈশ্বর, যেখানে প্রেম, সেইখানেই গভীর। যে প্রেম করে, সে যে অনেক চায়। সাক্ষী তুমি, মা, আমার। দিয়াছ অনেক, চাও-ও অনেক। তোমার লোভ, ব্রহ্মলোভ, কিছুতেই থামে না। ব্রহ্মের কিছুতেই আর সাধ মিটে না। কোথায় প্রাণের এক কোণে একটু প্রেম পড়িয়া আছে, সেটুকুও চাই। মার আমার আশ মেটে না। বড় ঘরের প্রেমিক যাঁহারা, এমনি লোভী তাঁহারা। ছোট লোক জীব বলে, সিকি ভাগ প্রেম দিলাম, আবার কি দিব? ঈশ্বর হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন যে, ওর এইটুকু দিতে কষ্ট, তবে সমস্ত কি করিয়া দিবে? তোমার যে অধিকার সমুদায় জিনিষের উপরে। আমাদের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে, তাহা তুমি না লইয়া ছাড়িবে না। মা, প্রেমের রহস্য কে বুঝিতে পারে? যেখানে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিতেছে, সেখানে কি একটু বাকী রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? দামোদর হাঁ করিয়া রহিয়াছে, কেবল গিলিতেছে। এই কুড়ী বৎসর যা কিছু পাইয়াছি, এনে দিয়াছি মার চরণে, তবুও মার "আরও দাও" "আরও দাও" কথাটী থামিল না। মার ভালবাসা কত অধিক। আধ মিনিট যদি মনটা অন্য দিকে যায়, মার মনে বড় কষ্ট। অথৈ প্রেম, চব্বিশ ঘণ্টায় ঘড়ি ধরিয়া দেখিতেছেন, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেল? মার প্রাণটা পড়িয়া আছে ছেলের কাছে। ছেলেটা বুঝিতে পারে না। সে ভাবিতেছে, উপাসনা করিতেছি, সাধন করিতেছি—সবই করিতেছি। আসিয়া দেখি, মা বিমুখ। মা বলেন, যে আধ মিনিট আমাকে ছাড়িয়া

থাকিতে পারে, সে আধ ঘণ্টাও তো ছাড়িতে পারে। মা, যাহারা তোমার চরণতলে পড়িয়া ভজন সাধন করিতেছে, তাহাদের এইটে আগে বুঝিতে দাও। সকলে ঠিক ঠাক বুঝিতেছে, বাহিরের লোক খুব সুখ্যাতি করিতেছে, বলিতেছে, এ খুব মাকে ভালবাসে, একবারও ছাড়িয়া থাকে না। কিন্তু তুমি জান বেশ, সে কি করে। এক মিনিট তোমাকে সে ছাড়িয়া গিয়াছিল ব'লে তুমি বিরক্ত। পৃথিবীর মার ছেলে যদি স্তনের দুগ্ধ না খায়, স্তনের টন্‌টনানি কত হয়। এত বড় স্তন, কতই মা ব্যথা পাইতেছেন। মন, মা যাহা চাহিতেছেন, সব মার চরণে দে। মা, এস, বস, সমস্ত নাও। তুমি প্রেমলোভী হইয়া যেমন চাহিতেছ, আমরাও যেন ব্রহ্মলোভী হইয়া তেমনি তোমাকে সমস্ত দিয়া তোমাকে লই। আর আধা আধি সাধন করিব না, যা আছে, সমস্ত তোমাকে দিয়া, তোমার সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিব, মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

স্বর্গদর্শন

(কাণপুর, রবিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৮০৫ শক ;
১৪ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে অনন্তপ্রেম, স্বর্গকামনা এখানেই, স্বর্গপ্রাপ্তিও এখানে। যে কামনা রাখে ইহকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে পরকালের জন্য, সে তোমাকে জানে না। হে পিতঃ, পিতৃভক্তদিগের মধ্যেও সাংঘাতিক একটি অবস্থা আসিয়াছে, যদি পবিত্র আত্মা আসিয়া দুরবস্থা দূর করেন, তবেই ভাল, নচেৎ দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবাদল দু'টি ছিল ভাল,

উচ্চতর স্থানে যাইতে হইলে আর যে লোক পাওয়া যায় না। বন্ধুবর্গ লইয়া কেবল এ পৃথিবীতে স্বর্গ-স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে আমরা বলি, অকালে মৃত্যু—যদি দিন কতক খুব কাজ কর্ম্ম দান ভজন ধ্যান করিয়া আর উঠিতে না পারে, তবে তার আর স্বর্গ নাই। আমরা তো আর আত্মপ্রবঞ্চিত লোক নই যে, ভাবী কল্পনার স্বর্গ প্রস্তুত করিব। এখানে ছেলেবেলা হইতে যেমন সকলে মিলিয়া সাধন ভজন করিতেছি, এখনও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে যোগরাজ্যে যোগ করিব। কিন্তু সংসার হইল প্রতিকূল। আর আমাদের লোক উঠে না। ভালবাসা বাড়িবে না। জীবনের সুগন্ধ তো বাড়িবে না। চরিত্র ভাল হয় না। যিনি স্রষ্টা, তিনিই প্রলয়কর্ত্তা। যার এক হস্তে অমৃতের পাত্র, কিন্তু অন্য হস্তে অসি আছে। ব্রাহ্মেরা আর উঠিতেছে না, কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী রহিল বাকী, দেখিল না। ভগবন্, বৃক্ষ আর ফল না দিলে তার দশা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই আমরা কয়েকটি মানুষ আছি. পৃথিবীতে আর এক দল আসিয়া এই স্থান দখল করিবেই করিবে। এখন যে সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতেছি, কর্ম্ম কাজ বড় অধিক হইবে না। অন্য অন্য দল পৃথিবীতে আসিতেছে, তোমার ভক্তদের কাজ লইতেছে। হরির বৃন্দাবনে খুব যাত্রী আসিল, কিন্তু এখন নরম পড়িল। এই দলের অকাল মৃত্যু—তাহারই পূর্ব্বাভাস এখন দেখা যাইতেছে। কোথায় অনাবৃষ্টি হইবে, না, প্রেমবর্ষণের ধূম বাড়িয়াছে। হে মাতঃ, পৃথিবী তোমার বৃন্দাবন দেখিবে দেখিবে ভাবিয়া, আর দেখিতে পাইল না। আমরা উচ্চমণ্ডলী হইয়া স্বর্গ তো দেখিতে পাইলাম না। দেখা যাইতেছে, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। আমি বলিতেছি—বাণী শুনিয়া বলিতেছি; বানিয়ে বলিতেছি না। রাশি রাশি কুবেরের ধন আসিতেছে, দেখিতেছি। এখনও লক্ষ লক্ষ গ্রামের লোককে খাওয়াইবার জোগাড়

রহিয়াছে। লোক কৈ? এই দুঃখ কি থাকিবে? বৃন্দাবনপতি, সেই মহাভাব, সেই ভক্তিভাব, সকলই সেই, কেবল বিশ্বাস করিয়া লোকে আসিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধো, এই বিশেষ নরক আসিয়াছে, তাহাই তোমার পা ধরিয়া বলি, একবার যদি এই ভয়ানক সাংঘাতিক ভ্রান্তিটাকে পবিত্রাত্মা আসিয়া দূর করেন, তবেই আমরা এ অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া, আরও কিছু দিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি। কত ডাকাডাকি, শরীর পাত হইল—তোমার ঘরে আসন পাতা—এততে যদি না আসে, তবে কি হইল? তোমার সূক্ষ্ম অটল আদেশ, তাহার উল্টা কখনও হইবে না। গরীব কয়েকজন লোক হাসিতে হাসিতে তোমার বৃন্দাবনে গেল, তার পর কোথায় গেল? এই সকল যোগের ঘরে তো কাহাকেও দেখিতেছি না। পৃথিবীতে এমন শুভক্ষণ আর কখন আসিবে? এ সময় আমাদের খুব মাতাইয়া দাও। আর কিছুদিন বাঁচিয়া খুব ভোগ ক'রে লই। বাগড়া দেয় কেন আপনার লোক? মা, তালে তালে নাচিতেছে. এমন সময় বেরসিক একটা কে কথা বলিল, আর তাল কাটিয়া দিলে যে, ঈশা মুষা এঁরা চটিয়া উঠিয়া গেলেন। গুটি পঞ্চাশ তেমন ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা সংগ্রহ করিত। ছাদ ফুঁড়িয়া মোহর পড়িতেছে, আর গৃহস্থ ঘুমিয়ে আছে। ব'লে ব'লে আর পারিনে, মা। দয়াময়ি, এখন বুকে পা দিয়া এ কয়টা স্বর্গ কোন রকমে দেখাইয়া দাও। নয় তো, যে কয়েকটি লোক দেখিতে চায়, তাহাদের দেখাও। পরে দেখিবে. এটা আমার ভাল লাগিবে না। হাতের কাছে রহিয়াছে, কেন এখন দেখিব না? এত টাকা কড়ি রহিয়াছে, কেন গরীব হইয়া থাকিব? ঢের সুখ আছে কপালে, ছাড়িব কেন? মা, মহালক্ষ্মি এমন সুখের সময় লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া না দিয়া, মা লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া, হাসিতে হাসিতে এই

বাকী কয়টা স্বর্গ দেখিয়া লই, মা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগনিদ্রা

(কাণপুর, শনিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক;
২০শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, যোগেশ্বর, তোমাছাড়া যদি আমার কিছু স্পৃহণীয় থাকে, তবে আমি ভক্ত থাকিতে পারি, কিন্তু খুব নিকৃষ্ট। কেবল তুমিই আস্তে আস্তে প্রেমের আকর্ষণে টানিবে মনকে, আমি তোমার মাতৃবক্ষে ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়া যোগনিদ্রায় থাকিব। কেবা বন্ধু, কেবা পৃথিবী, কিছুই তখন মনে আসিবে না। আর সেইটী যদি প্রকৃত যোগ হয়, তবে ইহকাল পরকালের কাজ গুছাইব। ঐ নিদ্রাতেই আস্তে আস্তে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব। ভক্তেরা কি মনে করিয়াছেন, লালসার আগুন বুকের ভিতরে জ্বালিয়া শান্তি পাইবেন? তোমাকে মানুষ ডাকিতেছে, অথচ এইটা চাহিতেছে, ওটা চাহিতেছে, এ কি রকম? যোগীর আবল্য, ঋষির মাদক-সেবনের ভাব, দয়া করিয়া এই অধম জীবদিগকে প্রেরণ কর। ঢের মাদক সেবন করিলে এ উত্তপ্ত মনকে শীতল করিতে পারিবে। যদি মনে রহিল লালসা, তবে যোগের শয্যায় শুইয়াও টাকার ভাবনা, সংসারের ভাবনা। দয়াময়ি, মনটাতে যদি কামনার আগুন নিবাই, তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে নিদ্রায় অচেতন হই, আর এক রাজ্যে যাইয়া পড়ি। সেখানে কিছুই নাই, কেবল আমি আর মা, মা আর আমি। পৃথিবীর সমুদায় স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। এখন চাই

কেবল যোগানন্দের শীতল জল। মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। যেমন উপাসনা হইতে বাহির হইল, অমনি মানুষ চারিদিকের আগুন জ্বালিয়া দিল। এ যোগধর্ম্ম ভক্তদলের মধ্যে আর একটু প্রবল করিয়া দাও। ভাই বন্ধু সকলে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বুকের ভিতরে খুব কামনার আগুন জ্বলিতেছে। যোগেশ্বরি, যদি একবার হরিনামের মাদক খাওয়াও, ঐ মুখ দেখিতে দেখিতে নেশায় ঢলিয়া পড়িয়া একেবারে অচেতন হইয়া যাই। ওরূপ দেখিতে দেখিতেই যোগী হওয়া যায়। জীবের শরীর মন গরম হইয়া গিয়াছে, ইহাতে তোমার লাবণ্যের একটু ছিটে দাও দেখি, অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া যাইব, আর পড়িয়াই ঘুম। ঐ হরিপাদপদ্ম বুকে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব। শ্রীহরি, সকল কামনা বিরহিত হইয়া, তোমার যোগেশ্বরীরূপে মোহিত হইয়া, যোগনিদ্রায় একেবারে ডুবিয়া থাকি, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সার ধর্ম্ম

(কাণপুর, রবিবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক ;
২১শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে জ্যোতির্ম্ময়, চারিদিকে কেবলই অসার, তন্মধ্যে আমি প্রধান অসার ; কিন্তু যখন ব্রহ্মপূজা হয়, তখন সকলই সার। স্বপ্নের সংসার কোথায় চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র পাপকলঙ্কিত জীব কোথায় যায় তখন। নাথ হে, এমন যে শুষ্ক কাষ্ঠ, ইহাও সার হইয়া যায়। যত ব্রহ্মাগ্নির ভিতর যাই, ততই আমরা সকলে পুড়িতে থাকি। এখনও আত্মার সুখ অপেক্ষা শরীরের সুখ বড় বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস তাড়াইয়া আবার ঘুরিয়া

আসে। কিন্তু যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়। জ্ঞান থাকে না তখন, আমি কোথায় আছি। এই তো আসল ব্রহ্মপূজা। সে সময় জীবের মনে থাকে না, 'আমি কি ছিলাম, কোথাকার লোক।' আস্তে আস্তে তোমার দেবত্ব আমাদের সকলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। ঐ জলে শুই, ঐ জল খাই, ঐ প্রেমসিন্ধুতে বিহার করি। এরূপে হরির প্রবেশ যদি জীবের মধ্যে না হয়, তবে ব্রহ্মপূজা আর হ'ল না। এ পাপের ভিতর হইতে, এই পশুতনুর ভিতর হইতে জীবকে টানিয়া তোল, স্বর্গের রথের মত কর। হরিসঙ্গে হরিভক্তদের লইয়া বক্ষের মধ্যে রাখিয়াছি। আমি যোগের প্রার্থী। যাহাতে আর পাঁচ রকম জ্ঞান না থাকে, একই দেখি, একেতে যুক্ত হইয়া যাই, এইটি কর; নহিলে বলিব, ব্রহ্ম ফাঁকি, পূজা ফাঁকি। কাঙ্গালের ঠাকুর যখন নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছেন, জননি, তখন সন্তানের আর নিরাশ হইবার কারণ নাই। প্রেমসাগরে ডুবিয়া লীন হইয়া যাই। যতদিন বাঁচিব পৃথিবীতে, হরিপদারবিন্দসুধাপানের যে আনন্দ, তাহা সম্ভোগ করিব, এই পাপদগ্ধ প্রাণকে শীতল করিব, অসার ধর্ম্ম সাধন করিব না, হরির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া, মা দয়াময়ি, আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সোণা হ'য়ে যাওয়া

(কাণপুর, সোমবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক ;
২২শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ)

দয়াল শ্রীহরি, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন তোমার নিকট থাকে, তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শান্তিবক্ষ, আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে ; কেমন করিয়া জীব হরির বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে, শরীর, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, আস্তে আস্তে কোন্ দিক দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর আসিবে ? তোমাকে দুহাত তুলিয়া ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়া দিয়াছ! আমি যদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়া বসি, তাহা হইলে আমি যে অনন্ত সুখে সুখী হইলাম। দেখ, নাথ, সুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম। হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের হরিময় করিয়া দেন। যদি এই দেহে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলাম, তবে বৈকুণ্ঠবাস হইল না। হরির ঘরে, হরির বুকের বারাণ্ডায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে আনন্দময়ি, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরিয়া বুকের মধ্যে রাখ। দেখিব, মা, চিরদিন কেমন রাখিতে পার ঐ রকম ক'রে। আর কান্না টান্না একেবারে থামাইয়া দাও। 'সোণা হইয়া যাইব' এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার স্পর্শমণি হরিতে লাগিয়া হরিময় হইয়া যা'ব। আশা করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই

হইল। মা গো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে, তোমার বক্ষোবৈকুণ্ঠে বসিয়া, ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া, অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া, সংসারের প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হইব না, এবং চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া কাঙ্গালদের আজ এ আশীর্ব্বাদ কর। [ক—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

কুচবিহাররাজ্য অধিকার

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক ;
৮ই নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দীনবন্ধো, আমরা তোমার নববিধানের প্রিয় ভক্ত, প্রেরিত, শ্রেষ্ঠ সাধক, প্রচারক। দীনদয়াল, আমাদের পক্ষে অদ্যকার দিন বিশেষ আনন্দের দিন। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কত বড় গাছ হইল ! কোথাকার জল কোথায় আসিল ! কাহার সঙ্গে কাহার মিলন হইল ! আমরা অনেক সহিলাম এই চার বৎসর, এই জন্য যে, আজ সিংহাসনে বসাইয়া তুমি তোমার সন্তানকে তোমার বিধি পূর্ণ করিতে আহ্বান করিবে। আজ হৃদয়ের আনন্দের দিন, ভাষা দুর্ব্বল, কণ্ঠ দুর্ব্বল, কিন্তু প্রাণের ভিতর বিশ্বাস করিতেছি যে, তোমার বিধি পূর্ণ হইল। আমি

* পূর্ব্বসংস্করণে এই প্রার্থনার হেডিং "রাজ্য অধিকার" ছিল, এই সংস্করণে "কুচবিহাররাজ্য অধিকার" দেওয়া গেল। এই প্রার্থনার তারিখ ছিল না। ৮ই নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ, কুচবিহার মহারাজের সিংহাসনোপবেশন উপলক্ষে, আচার্য্যদেব কমলকুটীরে প্রেরিতমণ্ডলী সহ এই প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার বিবরণ ১৮০৫ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে (২রা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত) অন্যরূপ দেওয়া আছে ; কিন্তু ভাবত একই প্রার্থনা। ধর্ম্মতত্ত্বের প্রার্থনাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

মার খাইয়াছি, অনেক সহিয়াছি, কিন্তু তখনি তোমার পদতলে সেই কন্যাকে দিয়াছিলাম, যখনি তুমি চাহিয়াছিলে। আমার কন্যা নয়, তোমার সমাজের কন্যা, প্রেরিত-দলের কন্যা। তুমি যখন বলিলে, চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না ;—বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে, বলিলে, আমি বেহারে অমৃত ঢালিব, আমি বঙ্গদেশে দুই শাখায় বিবাহ দিব, দুই প্রদেশ বদ্ধ করিব, কন্যা দাও, আমি দুই দেশের মিলন করিব ; আমি নবরক্ত দিয়া নব ইস্রেল এই বেহারকে নির্ম্মল করিব ; তুমি কাণে কাণে বলিলে, আর আমি মাথা দিলাম, দুঃখিনী কন্যা দিলাম—যে আমার ঘরে দুঃখে ছিল। কিন্তু আমি এক দিনের জন্য মনে করি নাই, সম্পদ মান ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার অনুজ্ঞা পালন করিলাম ; তুমি চাহিলে, আর আমরা কয়টি লোকে তোমার কন্যাটিকে এগিয়ে দিলাম অন্ধকারের মুখে। দুই দেশ এক হইল। মা, এই চার বৎসর সুখ অধিক পাই নাই ; কিন্তু আজ সুখের দিন, বিশেষ আনন্দের দিন। আজ, মা, এক কোলে রাজা, এক কোলে রাণীকে লইয়া, মাঝখানে ছোট রাজকুমারকে লইয়া, বেহার কোলে ক'রে বোস। আজ আমার পৃথিবীতে যা পাবার পাইলাম। কারণ আজ বিধান পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিবে। এই সমারোহের সময় কুচবিহারের উপর স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হউক! মা, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা মাতৃলীলা দেখিতে দেখিতে খুব বিশ্বাস করি, সকলে মিলিয়া ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া, তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। [মো—]

***

হে প্রভো, তোমার দাসবর্গের পক্ষে আজ একটি বিশেষ আনন্দের

দিন। আজ তুমি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বপন করিয়াছিলাম, আজ আমরা হাসিতে হাসিতে সংগ্রহ করি। এত বিঘ্ন, এত বাধা, এত বিপদ পরীক্ষা এত দিন বহন করিয়া, তোমার অগম্য বিধানের ফল লাভ করিয়া, আমরা একান্ত সুখী এবং কৃতার্থ হইলাম। গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় পূর্ণ হইল বলিয়া, আমরা তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। আমরা তোমায় বিশ্বাস করিলাম, তোমার আদেশে বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, তজ্জন্য আমাদিগের সুমহৎ পুরস্কার হইল। আমা-দিগের কন্যা চাহিলে, এবং আমরা বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। যাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর রাজ্য তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ কপর্দ্দকতুল্য। তুমি বলিলে, "তোমা-দিগের কন্যা আমাকে দাও যে, আমি নূতন ইজরায়েল বংশের শোণিত পুরাতন জাতির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। উভয় জাতির সম্মিলনে লক্ষ লক্ষ দুঃখভারাক্রান্ত লোকের মধ্যে জীবন ও আলোক আনয়ন করিব যে, আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য দান করিতে পারে।" আমরা তোমার কথা শুনিয়া, আমাদের কন্যা তোমায় অর্পণ করিলাম। এইরূপে দাসগণ তোমার সেবায় মিলিত হইয়া, অন্ধকারাবৃত দেশে গূঢ়রূপে কল্যাণ বিস্তার করিল। আজ তোমার ক্রোড়ে সেই কন্যা ও তাহার স্বামীকে লইয়া, তাহাদিগের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতেছ। আজ তাহাদিগের প্রজাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের আনন্দ তদপেক্ষা অধিক, কেন না আমরা তোমার বিধানের জয় দেখিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তি দ্বারা যে সুমহৎ সংস্কার আনয়ন করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর প্রবল বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোষমুক্ত করিলে, এজন্য আহ্লাদের সহিত তোমায় ধন্যবাদ দান করি। আজ

অন্ধকার রজনী চলিয়া গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার উদয় হইল, উজ্জ্বল নব দিন সমাগত হইল। আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হস্তে গুরুভার অর্পণ করিলে, তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হয় এবং চিরকাল তোমার অনুগত দাস থাকিয়া, প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে। তোমারই সমুদায় রাজ্য, হে প্রভো, গৌরব ও ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার, তোমার রাজ্য সমাগত হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। (ধর্ম্মতত্ত্ব)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবদেবালয়প্রতিষ্ঠা *

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০৫ শক ;
১লা জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ)

এসেছি, মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ ক'রেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার ক'রেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে! আজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার—১৮০৫ শকের ১৮ই পৌষ—এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ

---

* শেষ প্রার্থনা।

হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর ক'রে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মি, তুমি দয়া করিয়া, স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া, তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালম; এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌখীন মা। ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহার কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মার ঘরখানি সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মায়ের পূজা করিও না। মা তোমা-দিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর

সামগ্রী দিয়াছে! ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া, তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিশিষ্ট *

পরীক্ষা সুখের ব্যাপার

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ৩০শে কার্ত্তিক,
১৭৯৬ শক; ১৫ই নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, ধন্য তুমি! সকল পরীক্ষাতেই তুমি আমার আত্মার পরিত্রাণ এবং উন্নতি সাধন করিতেছ। কি আশ্চর্য্য তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব! আমার কথায় যদি লোকের সন্দেহ না হইত, আমার জীবন যদি কেহ বিচার না করিত, তাহা হইলে আমার পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরদর্শন হইত না। কিন্তু যতবার পরীক্ষিত হইতেছি, ততবারই, হে ঈশ্বর! তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া নির্ভয় হইতেছি। প্রতিবার পরীক্ষায় আনন্দের কথা বলিতেছি। ঈশ্বর, তোমার দয়ায় পরীক্ষা সুখের ব্যাপার হইল। ভাই, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র সকলেরই নিকট প্রতিদিন এই পবিত্র সত্যের পরীক্ষা দিতে হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ে বার বার পরীক্ষিত হইলে, মন বিরক্ত হইয়া যায়; কিন্তু যে পরীক্ষায়, হে ঈশ্বর, তুমি মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতেছ, তাহাতে আমার ভয় কি?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

* যে যে প্রার্থনা পূর্ব্বে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা এবং "সামাজিক ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮০৯ শকে, ৭৮নং অপার সারকিউলার রোডে, "বিধানযন্ত্রে" শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত) হইতে আচার্য্যদেবের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

প্রেম-পিঞ্জর

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষষ্ঠ ভাদ্রোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক ; ২২শে আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে আত্মন্! আজ তোমার শরীরে ব্রহ্মপ্রেমের আঠা লাগিয়াছে, তুমি হাত দিয়া আঠা দূর করিতে গিয়া তোমার হাতই জড়িত হইল। হে প্রেমময় ঈশ্বর, হৃদয়কে ধরিবার জন্য বেশ উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছ। এমন তেজস্বী আমি, এত আমার তেজ ছিল, এমন প্রকাণ্ড শরীর, ইহাকে তুমি ভূতলে ফেলিলে! ও আবার কি! তোমার হাতে যে একটী স্বর্গের পিঞ্জর দেখিতেছি। আমাকে ধরিয়া রাখিবে বুঝি! প্রাণেশ্বর, আমার সৌভাগ্য কত! এই যে আমার শরীরের উপর দয়ালের হস্ত পড়িল। মৃতপ্রায় পাখীকে ঈশ্বর স্বহস্তে ধরিলেন। আহা! হাতটী কেমন সুমিষ্ট! আমি এমন হাতে তো আর কখনও পড়ি নাই। বেশ হইয়াছে, ঈশ্বর! পাঁচ শত বার তুমি আমাকে ঐ হাতে ধর, আমার শরীর দিয়া কত রক্ত পড়িতেছে, দেখ। তখন কত বলিলাম, নির্দ্দয় ব্যাধ, আমাকে ধরিও না। ব্যাধের প্রাণ যে পাথর দিয়া বাঁধা। ব্যাধ আমার কথা শুনিল না। ব্যাধের বাণ আমাকে বিঁধিল। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিলে যে কি কষ্ট হয়, ঈশ্বর, তাহা আর কি বলিব ; তার উপর ব্যাধ মারিয়াছে, জ্বালায় অস্থির হইয়া তোমার হাতে পড়িয়াছি। আঃ! কি আরামই হইতেছে! দুঃখের শরীরে তোমার কোমল হস্ত! কত দিন আহার করি নাই, হে ঈশ্বর! তোমার সুমিষ্ট হাত পদ্মের ন্যায়, গোলাপ ফুলের ন্যায়, আমি বাঁচিলাম, সুখী হইলাম। কেহ বলে, পাঁচ হাজার বৎসর পরে পরিত্রাণ হ'বে, কেহ বলে, দাস্যভাবে, কেহ বলে, সখ্যভাবে, কেহ বলে, একাকী বৈরাগী হইয়া গেলে, কেহ

বলে, সকলের সঙ্গে গেলে মুক্তি, আমরা বলি, আমাদের প্রাণেশ্বরের হাতে পড়িলেই মুক্তি, পরিত্রাণ। জগতের রাজা দয়াময় কোথাকার জঙ্গলের একটী পাখীকে ধরিলেন। যতক্ষণ হস্ত-সংস্পর্শ, ততক্ষণ কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত সুখ, কত আনন্দ! দর্শন হইয়াছে, শ্রবণ হইয়াছে, এখন স্পর্শও হইল! ঈশ্বর, কেন আমাকে ধরিলে? তুমি ধর, আমি কাটি, তুমি বাঁধ, আমি ছিঁড়ি; কিন্তু এখন তোমার ঐ হাতের যে স্পর্শসুখ আস্বাদন করিতেছি, আমি আর যাইব না। আমি বলিব, আমার ডানা কাটিয়া দাও, আমাকে কাণা কর, খোঁড়া কর। আমি আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে যাইব না। আমি সংসার-জঙ্গলের কোথায় কি বিপদ দুঃখ, সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি। দয়াল, এখন তুমি আমাকে ছাড়িলেও, আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না।

ঈশ্বর, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তোমাকে লাভ করিয়া, এ সমুদায় ভ্রাতৃমণ্ডলী, উপাসকমণ্ডলীর প্রাণ শীতল হউক। তোমার নাম-কীর্ত্তনে, তোমার নাম-শ্রবণে, ইঁহাদের দুঃখ দূর হউক, দয়াময়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভিতরে নেও *

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক;
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

দীনবন্ধো, হে দয়াময় পরমেশ্বর, খুব দেশের ভিতর দিকে যাইতে

* আচার্য্যদেব কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুকে লইয়া কলুটোলার ভবনে বিশেষভাবে

পারি না কেন? নদীর ধারে তোমার দেশ। নদীর ধারে বেশ রাস্তা হ'য়েছে। এই ভক্তগুলি এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। পথটী বেশ পরিষ্কার। দেখি, যত ভক্ত যায়, এই পথ দিয়া চলে। দেশের ভিতরে কেহ এগুতে পারে না। নদীর স্রোতটা উল্টা দিকে আছে। মতলবটা বুঝেছ? এই পথের যেখান থেকে হউক না কেন, একখানা নৌকা ডাক্‌লেই পাওয়া যায়। দেখ, ব্যাপারটা কি? চল্‌ছিই চল্‌ছিই, দশ ক্রোশ পথ চলেছি, বাড়ী থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরে এসেছি; কিন্তু যাই ফিরিতে ইচ্ছা হইল, ঐ নদীর একখানা নৌকা ডাকিলাম, নৌকায় চ'ড়ে ছেড়ে দিলাম, আবার সেই জায়গায় আসিলাম। ভিতরের দিকে দুই একটা লোক যায়। অধিকাংশ লোক উপাসনার পথে চল্‌ছে বটে; কিন্তু ঐ নদীর ধারের পথে চ'লে যায়। দুই দিক কাছে রাখিবার জন্য নদীর দিকে ঘেসে ঘেসে যায়। গ্রামের ভিতর দিকে যায় না। নদীর ধারের রাস্তায় চল্লে, বুঝি, গম্যস্থানে যাওয়া যায় না। এই রাস্তায় চলিলেই ঐ নৌকার দিকে দৃষ্টি থাকে, বাড়ী থেকে চিঠি এলেই যাবে। আর মবুতে সব ঘাটেই নৌকা! আর যদি দশ বৎসর চলে, তবু ফিরে যাইবার বিলক্ষণ সুযোগ রহিল। তাহা না হইলে চল্‌ছে কেন এই পথে? ওগো যাত্রী সব, এদিকে ফের। স্বর্গরাজ্যের পাণ্ডা এসে ধরাধরি ক'রে টেনে নিতে যাচ্ছে; কিন্তু যাত্রীরা ঐদিকে এগুতে চায় না। একবার যদি ঐ স্বর্গের পাণ্ডা ঐদিকে নিয়ে যেতে পারে, আর যাত্রীরা বাড়ী ফিরে যেতে নৌকা পাবে না। হে কৃপাসিন্ধো, হে যাত্রীদের সর্দ্দার, আমাদিগকে নিয়ে চল না। এ নির্ব্বোধ পাষণ্ড মাঝিগুলি পয়সার লোভে যাত্রী ভুলিয়ে

উপাসনাসাধন আরম্ভ করেন। এই উপাসনা একমাস চলিয়াছিল। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী প্রতিদিনের উপাসনা লিখিয়া রাখিতেন। "দৈনিক উপাসনা" পুস্তকে কয়দিনের উপাসনা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে কলুটোলার প্রার্থনাগুলি গৃহীত হইল।

নিয়ে যায়। কয়টা বাজ্‌ল ? আর কবে তোমার রাজ্যের ভিতরে যা'ব ? বল না, হে ঈশ্বর, যদি অন্ধকার হ'য়ে পড়ে। দুষ্টমি দেখে দেখে তোমার কথাও বন্ধ হয়। কি করবে ? রোজ ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌ছ নিয়ে যাবে ব'লে ; কিন্তু যাত্রীগুলি যে তোমার সঙ্গে যেতে চায় না। তাদের একটু মন খারাপ হ'ল, অমনই আড় চোখে নৌকার দিকে তাকায়। এরা তোমার গান করে, তোমার উপাসনা করে, সব করে ; কিন্তু ঐ নৌকার দিকে দৃষ্টি ছাড়ে না। এই দৃষ্টিই তো সর্ব্বনাশ করিল। জগদীশ, আর এই দুষ্টমি ভাল লাগে না, রক্ষা কর, নিয়ে যাও তোমার দেশের ভিতরে। তোমার বাগানে গিয়ে কত ফুল দেখ্‌ব, কত ফল খাব, কত নূতন গান বেঁধেছি, তোমাকে শুনাব। আবার তুমি গান গাও, তোমার গান শুনিব। ভিতর দিকে নিয়ে যাও। প্রাণটা বড় দুরন্ত হ'য়েছে। একলা পেলে তোমার বড় কাজ হ'বে। যদি এই নদীর ধারের রাস্তায় চালতে দাও, তবে আমি সাধুই হই, আর যাহাই হই, নৌকার দিকে তাকাবই। বাড়ী ছেড়ে যেতে কে চায় ? এটা মানুষের মন—না, কার মন ? তোমার উপাসনা করিতে এসেছি ব'লে কি চুরির দায়ে ধরা প'ড়েছি ? শীগ্‌গির ধাক্কা দিয়া ঐ দিকে গলির ভিতর নিয়ে ফেল, একটা বাগানের দুই চারিটা ফল খাওয়াইয়া, ছেলেগুলকে ভুলাইয়া ফেল। পৃথিবীতে মোওয়া দিয়ে ছেলে ভুলাইয়া ফেলে। আমাদের মনের মত মোওয়া তোমার হাতে আছে। গল্প কর না, কোন মতে ঐ বাড়ী, ঐ নৌকা ভুলাইয়া দাও। বল, রাঙ্গা রাঙ্গা কাপড় দেবে—গল্প কর, উপন্যাস বল। বল—দেখ্‌, তোদের দেশ থেকে আমার এই দেশে কত ভক্ত এসেছে, আমি তাদের আমার বাড়ীতে রেখে এসেছি, তারা যা চায় তাই পাচ্ছে, তারা কেমন সুখী হ'য়েছে। তোদের দেশের লোকই তারা। তারাও আগে আস্‌তে চায় নি ; কিন্তু এখন তারা এসে কত সুখ ভোগ ক'চ্ছে। আমরা

তোমার মুখে ঐ কথাই শুনি। গল্প শুনতে ছেলেরা খুব ভালবাসে। বল না, আমার দেশে আরও এক দল ভক্ত আস্‌ছিল, পথের মধ্যে চোর ডাকাত তাদের মার্‌তে গিয়েছিল, আমি তাদের বাগানে ঢুকিয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছি। হে দীনবন্ধো, হাত ধ'রেই ফেল। আর ছাই দেরি কর কেন? শরীর মন পাপে গ'লে যাচ্ছে, কি হ'বে? ধর্‌লেই ভাল হ'বে। যদি তুমি ধর, আর যদি হাজার চিঠি বাড়ী থেকে আসে, তবু যেতে পার্‌ব না। তুমি ধ'রে নিয়ে কি কর্‌বে, তা ব'লো না। সব কথা কি সকলকে বল্‌তে আছে? নিয়ে তো চল এখন, তোমার রাজ্যের ভিতর। তার পর গ'ণে গ'ণে মার্‌বে, রক্ত প'ড়বে, পরে এক সের দুই সের রক্ত যখন প'ড়বে, তা দিয়ে তোমার শ্রীচরণ মাখিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। তুমি যখন বল্‌বে, অতিরিক্ত হ'য়ে গিয়েছে, তখন মনের আনন্দে হাস্‌ব। জগদীশ্বর, কি সব বল্লাম তোমার কাছে, গদ্য কি পদ্য, তুমি জান। কাজে কিছু ক'রে দাও। ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে, তোমার শ্রীচরণতলে এই কয়টা পাতকীকে বসাও, আর যাতে না পালাতে পারি। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে, চির আনন্দিত হ'য়ে, তোমার ঘরে থাকি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তিবাচন)

ভক্ত-পিঁপড়ে

হে দয়াময় পরমেশ্বর, এক রকম পোকা আছে, কাপড়ে যদি লাগে, হাজারবার ঝাড়িলেও পড়িয়া যায় না, এমনই কামড়াইয়া ধরে। তেমনই তোমার পাদপদ্মে অনন্যগতি পাপী পড়িয়া থাকিবে। এই যে সাধনের চাদরখানি দিয়াছ, তেমনই ভাবে আমাদের প্রাণকীট লাগিয়া থাকিবে। আর একটী দৃষ্টান্ত বল্‌ব? যেমন পিঁপ্‌ড়েগুলি মধুর ভাণ্ড আর ছাড়ে না। ও দয়াল, তোমার মধুভাণ্ডে কতগুলি ভক্ত-পিঁপ্‌ড়ে মরে গিয়েছে।

মধু মুখে ক'রে যেতে পারত, তবু গেল না। তোমার কাছে রস-লোভে এয়েছি, মরেই যাই না কেন? লোকে বল্‌বে, ঐ পিঁপ্‌ড়েটা ফিরে এল না। কতগুলি ভাস্‌ছে, কতগুলি ম'রে গিয়েছে। ঝাড়্‌লে পড়্‌ব না, তাড়াইয়া দিলে ফিরে যাব না। মধু নিয়ে ফিরে যাব না। ঐ পিঁপ্‌ড়ের বুদ্ধি যদি লই, ঐ রকম একাগ্রতা, মত্ততা যদি হয়, তবেই তো মজা। ডুবাইয়া দাও না। হে ঈশ্বর, সুধাপানে মত্ত হই। আমরাও তো তোমার রাজ্যের পিঁপ্‌ড়ে। তোমার রস খাব ব'লে এসেছি। উপযুক্ত সময়ে আশীর্ব্বাদ কর। সাধন ভজনের যাহা আছে, সব প্রকাশিত কর। একেবারে মাথামাখি রস মিশ্রিত হ'য়ে ডু'বে মরি। সাধনের বস্ত্রখানি কামড়াইয়া ধবি। হে দীনশরণ, কাঙ্গালের মা বাপ, গরিবদের উপায় ক'রে দাও। ঐ যে তুমি শুনবে, আর আমরা শুনাইয়া চ'লে যাব, ইহা আর ভাল লাগে না। এবার পাপ জীবনটাকে মার্‌ব। এবার মধুপানে প্রমত্ত হ'ব। তোমার কথা শুনিয়ে, তোমার ঘরের ভিতর বাঁধিয়া রেখে দাও। প্রাণটাকে চুরি ক'রে নিবে। ব'লে দাও, খুব সচ্চরিত্র হ'তে হ'বে। একবার গায়ে হাত বুলাইয়া দাও। একবার সেই রস-সাগরে ফেলিয়া দাও। হে আমাদের ঈশ্বর, আমাদের গতি ক'রে দাও। সমস্ত দিন সাধন ভজন করিয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকি। গুরো, আর যেন একটা বাতাস এসে উড়াইয়া না নেয়। গুরো, এবার সদ্গতি ক'রে দাও—গুরো, এবার সদ্গতি ক'রে দাও। গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, গুরুমন্ত্র সাধন করিয়া এবার বাঁচিব। আমাদের এই কলঙ্কিত মস্তকে তোমার মঙ্গল চরণ স্থাপন কর। তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মায়ের কান্না

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক ;
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে নিত্যানন্দ, প্রেমময়, ভক্তবৎসল, তোমার দর্শনে মনে শোক এবং আনন্দ-মিশ্রিত একটী ভাব হয়। চিরকাল হইবে, তাহা বলি না, এখন হয়। যদি তুমি মা হও, তবে মনে দুঃখও হয়, আহ্লাদও হয়। আমি পৃথিবীর ভাব লইয়া দুইটা কথা বলি, শুন। পরমেশ্বর, পৃথিবীর জননী যদি দেখেন, তাঁহার সন্তান দূরে দূরে বেড়াইতেছে, গা-ময় ধূলামাখা, পাঁচ জন লোক তাহাকে মারিতেছে—বেলা অনেক হইল, আহার হয় নাই, সেই দুরন্ত ছেলে আত্মহত্যা করিবার জন্য গলায় দড়ী দেয় আর কি—তখন মার প্রাণে কি হয়? খাওয়া হয় নাই, গরিব হইয়া গিয়াছে, এক সময়ে মার কাছ থেকে কত সম্পত্তি, কত সুখ ভোগ করিত, এখন সেই দুঃখী বেশে যখন সেই ছেলে মার বক্ষের সম্মুখে যায়, সেই মা চীৎকার করিয়া উঠেন। তুমি আমার মা, তুমি কাঁদ না—চিরকাল এই পৃথিবীটা আমাকে বলিয়া আসিতেছে; আমি বলি, তুমি কাঁদ। জননি, সম্মুখে কি করিয়াছ?—আসন পাতিয়া দিয়াছ ওদিকে দুধ জ্বাল দিতেছ, আল্‌-নায় কাপড় রাখিয়া দিয়াছ। ও জননি, বল না, আজ অমন করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছ কেন? আত্মার বুঝি চোখ দিয়া জল পড়ে না? স্নেহময়ী জননি, অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? ঘাড় যে হেঁট হইয়া গিয়াছে! বল না? বুঝিয়াছি—ঐ যে সন্তান আসিল না; কখন স্নান করিয়া আসিয়া, আসনে বসিয়া বাড়া ভাত খাইবে—ইহাই ভাবিতেছ। তুমি এমনই করিয়া রোজ বসিয়া থাক—আর ছেলেগুলি আসে না। একটা ছেলেও আসিল না? আবার যখন ঘাড় তুলিয়া

দেখ, ছেলেগুল মদ খাইয়া মরিতেছে, গলায় দড়ী দিয়া মরিতে যাইতেছে, তখন কি তোমার চোখের জল পড়ে না? ও! দুরন্ত ছেলেগুল! মার সম্মুখে মরিস্ না, মরিতে হয়, আড়ালে যা! যে মা তোর জন্য এত আয়োজন করেন, তাঁহার প্রাণে কেন এত দুঃখ দিস্? হে পরমেশ্বর, এই আমি—এই আমি তাহাই করি—সেই দুরন্ত আমি। মার চরণে প্রণাম করিয়া, কোথায় ঐ আসনে বসিয়া ঐ অন্ন খাইব, না, আমি মার চরণ ছাড়িয়া দূরে দূরে পলাইতেছি। "ছেলে এল না" "ছেলে এল না" ইহা বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছ তুমি! যত দিন যায়, তত কাঁদ তুমি। "কখন্ আসে? বেলা যে যায়, বেলা যে যায়; সন্ধ্যার অন্ধকার হইলে সেই ছেলে মরিবে।"—ইহা ভাবিয়া তুমি কাঁদ! তোমার প্রাণ এ সকল সহিতে পারে না। তুমি বলিতেছ, "আমি যাহাদের বুকে করিয়া রাখিলাম, তাহাদের এই দশা আমি দেখিতে পারি না।" আর, জননি, পৃথিবীতে যাইব না। আমার আদরের জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছ, এত আয়োজন করিয়াছ, আমি ঐ আসনে বসিব, ঐ ভাত খাইব, ঐ কাপড় পরিব;—আমার মার দেওয়া জিনিষ কি পড়িয়া থাকিবে? কি হইবে, বল দেখি। গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছ? পতিতোদ্ধারিণী জননি, তোমার জগতের কি উপায় হইবে, বল। তোমার ছেলেগুল ঝাঁকে ঝাঁকে মরিতে যাইতেছে। ঈশ্বর, তোমার বড় কোমল প্রাণ। এই জগৎটা সেই প্রাণকে আঘাত করিয়া আসিতেছে এত কাল! জননি, জগতের উপায় কি করিলে, বল। তুমি উপায় ভাবিবে, না, এই সব দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিবে? তোমাকে বুঝাইবে কে? তুমি আপনি আপনাকে বুঝাইতেছ। আপনি আপনার কথা বলিতেছ। আজ উপাসনার সময় একটী ছেলে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, জননী বলিয়া গান করিয়াছে,—অমনই মনে করিলে, আজ বুঝি ছেলেটা আসিল! একটু

আশার কথা শুনিয়াছ, আর মার প্রাণ কি না, অমনই ভুলিয়া গিয়াছ। তোমাকে আমরা ভাবি দিনের মধ্যে এক আধবার, আর সমস্ত দিনরাত তুমি আপনা আপনি বিড়্ বিড়্ করিয়া কত বলিতেছ। তুমি বলিতেছ, "আমি যাহাদের জন্য রাঁধিতেছি, বাড়িতেছি, তাহারা কেন আমার কাছে খাইতে আসে না? আমার ভাত খাইলে কি তাহাদের জাতি যাইবে?", হে ঈশ্বর, কেন যে তাহারা তোমার কাছে আসে না, তাহা তো তুমি আপনি বুঝিতে পারিতেছ। গোষ্ঠী শুদ্ধ লোক পাপী হইয়া আছি, তোমার কথার জবাব দিব কি? মনে মনে বলিতেছ, "তোদের জন্য এত যত্ন করিয়া এই সব রাখিলাম, ওরে, তোরা আয়, এই সব খাওয়াইয়া দি।" ছেলেগুলকে তোমার আসনে বসাইবে, আপনি হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিবে, তবে তো তোমার প্রাণে সুখ হইবে। পরমেশ্বর, তোমার ছেলেরা যদি তোমার এই সব না খায়, তবে কে খাইবে? আবার যাহার জন্য ভাত রাখিয়াছ, সেই কেবল তাহা খাইবে, আর একজন তাহা খাইতে পারে না। মেয়েগুলর জন্য যাহা করিয়াছ, মেয়েরাই খাইবে। ছেলেদের জন্য যাহা করিয়াছ, ছেলেরাই খাইবে। যত্ন করিয়া খাওয়াইবে। মা হইয়া পর হইলে, তোমার আপনার সন্তানদিগকে আবার নিমন্ত্রণ করিতে হইল! কেহ যে আসে না। কবে আসিবে বলিয়া বসিয়াই আছ। পাপ সর্ব্বনাশ করিল, সংসার খাইল। জননীর কাছে আর ছেলেগুল যায় না। আর কিছু তো উপায় নাই; মাতার স্নেহদৃষ্টি, শুনিয়াছি, সন্তানকে বশীভূত করে, একেবারে প্রাণ কাড়িয়া লয়। তোমার কাঁদ কাঁদ মুখ না দেখিলে, এই দুষ্টের, এই পাষণ্ডের প্রাণ বিগলিত হয় না। তোমার হাসি হাসি মুখ, আনন্দময়ী মা তুমি! তোমার এই দশা করিয়া রাখিয়াছি। আমার খুব আপনার লোক তুমি। সেই যে সেই ছেলে বেলায় খেলনা দিতে, খেলা করিতাম;

খাওয়াইতে, খাইতাম; এখন বুড়ো হইয়া তোমাকে মানি না। কত কালের আপনার বন্ধু তুমি! আমার ইহকালের পরকালের উপযুক্ত সামগ্রী তুমি। তোমাকে দেখিলে আহ্লাদ হয়, কিন্তু তাহার পর দুঃখ হয়। তুমি সৃষ্টি করিলে খাওয়াইবে বলিয়া, আর আমরা মরিতে যাইতেছি। মানুষ নও তুমি, আমি জানি; সেটা পৃথিবীর লোক একশত বার ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিয়া বলিতেছে কেন? কিন্তু তোমার যে মার প্রাণ। সকালে বল, রাত্রে বল, "যাহাদের জন্য এত করিলাম, ইহারা পাঁচ জন, ইহারা আসে না।" আসিব না কি? অমনি তোমার মুখে হাসি। এই যে কথাটী জিজ্ঞাসা করিল ছেলেগুলি, মার প্রাণ কি না, অমনি হাসিয়া ফেলিলে! হে প্রভো, দয়াল, সাজাইয়াছ, বেশ করিয়াছ। এখন বল, হাতটী ধরিয়া লইয়া ঐখানে বসাইবার কি করিয়াছ? গলায় দড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখ না! মা হইলেই বা, পৃথিবীতে যে মার বুদ্ধি নাই, সে দুষ্ট ছেলেকে মারে না; তুমি আমার মা, বুঝ শুঝ! বেশ করিয়া মার, কষ্ট দিয়া কাঁদাইয়া, আবার চোখের জল মোচন কর। আমরা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, মার প্রতি অন্যায় করিয়াছি। এখন কষ্ট টষ্ট দিয়া মনটা খুব ভাল করিয়া দাও; তাহার পর তোমার হাত থেকে অন্ন লইয়া খাইব,—না, তুমিই খাওয়াইয়া দিও, আবার আমরা খাইতে গেলাম কেন? দয়াল, তোমার প্রদত্ত সাধন ভজনের কষ্ট সহ্য করিয়া, শেষে যেন তোমাকে মা বলিয়া, তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পূর্ণ বৈরাগ্য

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক ;
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

দীনবন্ধো, দয়াময় পরমেশ্বর, সাধকহৃদয়ভূষণ, পাপীর একমাত্র আশা ভরসা, তোমার সন্নিধানে সাধক আর কি প্রার্থনা করিবে? কঠোর সাধনে ফেলিয়াছ, কি করিব, আরও কঠোর, গভীরতর সাধনে ফেল। বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাস, দয়াবান্ কি না তুমি! আমি গেলাম না তোমার ঘরে, তাই আমাকে লইয়া যাইতে তুমি আমার ঘরে আসিয়াছ। কি পাতকী আমি, তোমাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিয়াছি, আর কি না বলিতেছি, দাড়াও, আমি ঐ কাপড়খানা নিয়ে আসি, পয়সাটা নিয়ে আসি—আর তোমাকে দেখা দিতেছি না ভয়ে, সেই যে বাড়ীর ভিতর বসিয়াই আছি! তুমি বলিতেছ, কবে আসিবে সে? তুমি আরও গভীরতর প্রেমে মত্ত করিবে। এই পৃথিবীতে সুখের আশা রাখিলে, পুণ্য শান্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়, সব দিক বজায় রাখিয়া কি তোমায় পাওয়া যায়, ব্যাকুলহৃদয় শিষ্যকে বল। হে গুরো, সব মিলাইয়া কি আমাদের মত লোক সুখ পাইতে পারে? আমি যদি তোমাকে চাই, আমার উচিত যে, সব ছাড়িয়া তোমার কাছে থাকি। পৃথিবীর বন্ধুগণ প্রাণের বন্ধু হ'লেনই বা। তুমি বড়, না, তাঁরা বড়? তুমি যে আমার সর্ব্বাগ্রগণ্য। আমি আরও তোমার ভিতরে যেতে চাই—আরও আরামের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাও। বাড়ীর ভিতরের ঘরের আসনে বসিয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া, সকলে নৃত্য করিব, মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু মনে করিলে কি হইবে? তুমি বলিতেছ, গোলেমালে কিছু হ'বে না ; তাই তো বলি, দীননাথ, বিরলে

বসাইয়া তোমার প্রেমসুরা পান করাও। কাজ কি পাঁচ রকম সুখে? বৈরাগ্য যদি লইতে হইল, বাদ সাদ দিয়ে আর কি হইবে? মানুষ বুঝে না—সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কেন? তোমার মত সাধু আর এমন কে আছে? তবে অন্যের কাছে কেন যাব? তোমার কাছে ষোল আনা সুখ। তোমার কাছে ষোল আনা সুখ নেব, আর বাকি যত, ঐ প্রচারের হিসাবে সেই ছেঁড়া খাতায় জমা দেব। অনেক ক'রে কুঁড়ে ঘরটী প্রস্তুত করেছি, চারিদিক ফুল গাছে সাজিয়েছি, পৃথিবীর সব ছেড়ে, ছাদের উপরে পাঁচ হাত ভূমি নিয়েছি, এখানেও যদি সংসার আসিয়া বৈরাগ্যের ব্যাঘাত করে, আমি এমনই কেঁদে উঠ্‌ব যে, সে কান্নায় তোমার স্বর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। পূর্ণ বৈরাগ্যের জন্য একজন আবেদন করিতেছে। তোমাকে যেমন ভাল লাগে, আর কিছু তেমন ভাল লাগে না। কত পাপ ক'রে এলাম, তবু বেজার নও। যেমন তেমন অবস্থা হউক না, তোমাকে কাছে পাইলেই হইল। বন্ধু যেমন জানলা খুলে তাকাইয়া থাকে, তেমনই তুমি, কখন কোন্ কাঙ্গাল সন্তান আস্‌বে, নিরীক্ষণ ক'রে আছ। পাঁচ জন কৌশল ক'রে এসে যে তোমার জায়গায় উৎপাত কর্‌বে, এ সহ্য হয় না—এ বেনামী অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তোমার ভক্ত নাম নিয়ে এসে তপস্যার ব্যাঘাত করিবে, এ সমুদয় সহ্য হয় না। তুমি দয়া ক'রে এই দুই হাত স্থান দিয়েছ, সব কাপড় কেড়ে নিয়ে একটু বৈরাগ্য বস্ত্র দিয়েছ, সব খাওয়া বন্ধ ক'রে একটু সামান্য বৈরাগ্যের অন্ন খাওয়াইতেছ, সব জায়গা ছাড়াইয়া এই একটু জায়গা দিয়াছ, এটুকু তপস্যার স্থানে কেহ যেন বিঘ্ন কর্‌তে না পারে। আর হিসাব ক'রে ধর্ম্ম করা চলে না। যদি পাগল হই, স্বর্গে যা'ব, তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে। আধখানা ধর্ম্মের নৌকা ডু'বে গিয়েছে। ষোল আনা হৃদয় না দিলে,

তোমার ধর্ম্ম হয় না, তোমার কর্ম্ম হয় না। একবার শুকন, একবার প্রেমিক, একবার বিষয়ী, একবার উদাসীন, সকালে সুন্দর মুখ, বিকালে ম্লান, এরা কেহ স্বর্গে যায় না। বড় বড় সন্ন্যাসী বৈরাগী উপর থেকে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আস্‌ছে। ওদের ঐ দশা, তবে আমাদের কি হ'বে? এই সরু রাস্তার ভিতর দিয়ে যাব, গ'ণে ষোল আনা ভক্তি দিব। আধখানা বৈরাগী বৈরাগী কি? আধখানা প্রেমিক প্রেমিক কি? দুই পাঁচ আনা কম দিয়ে যে ফাঁকি দিয়ে যা'ব, তা' হ'বে না। যদি ঐ গাঁজাই খেতে হ'ল, দম টেনে ধুঁয়ো ছাড়ব কেন? যদি ঐ সুরা পান করিতে হয়, তবে একেবারে বেহুঁস হ'য়ে যা'ব। যদি সেই রক্ত দিতেই হ'ল, তবে আর মর্‌ব ব'লে ভয় কি? ম'রে তবে তো আমি তোমার হ'ব। ভালবেসে বল্‌লে, ছেলে, সব দাও—তবে তোমাকে সব দেব, এ আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার সুখেচ্ছা আছে, সব দেওয়া হ'ল না। আমি এত ভক্তি করি, এত উপাসনা করি, এত গান করি, হ'ল না। পরমেশ্বর, মত্ততাই সার, সুরা-পানে নেশাই সার। ঐ উঁরা স্বর্গে যান—আর আমাদের লোকগুল ভদ্র সুসভ্য বৈরাগ্যের বেশ নিয়ে কেবল সংসার করে। আমার আফিস, আমার টেবিল, আমার কলম, আমার দোয়াত, আমার কাগজ, আমার কাপড়, আমার বিছানা সব তুমিই হও। দু'খানা না আর থাকে, একখানা তুমি হও। আমার কাছে তুমি সেইরূপ হ'য়ে থাক—আমার বন্ধুদের কাছে তুমি সেইরূপ হ'য়ে থাক। দয়াময়, আমরা জানি, তুমি মূর্ত্তি হ'য়ে এস না; কিন্তু তুমি আমাদের কাছে কখনও উপাসনা, কখনও রন্ধন, কখনও কার্য্য, কখনও আলাপ হ'য়ে এস। আমাদের রক্ত মাংস সব তুমি। আমাদের খাওয়া দাওয়া সব তুমি হও। নৈলে দুই নৌকায় পা দিয়া ডুব্‌ব। খুব প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ কর—"তুই পাগল হ', তুই একেবারে স্বর্গে চ'লে যা।"

এমনই একটী আশীর্ব্বাদ ধাঁ ক'রে ফেলে দাও দেখি, তোমার স্বর্গে চ'লে যাই। এই আশীর্ব্বাদ কর, নাথ, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তসঙ্গে খেলা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক ; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে গুণের সাগর, এ কি সব খেলা? ভক্তদিগের সঙ্গে তুমি ক্রীড়া কর? এই কাছে, একেবারে খুব কাছে, তোমার পবিত্র অঞ্চল গায়ে লেগেছে, এই এক কথা; আবার দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ক্রোশ দূরে তুমি বসিয়া আছ। আবার তোমার ঘরে কত দরজা, এত দরজা কোন বাড়ীতে দেখি নাই।—বলিস্ কিরে! তারা বাড়ীতে গিয়ে কত জিনিস নিয়ে এল—কিন্তু তারা দেখ্‌লে, সব দরজাগুল চাবি দেওয়া, তারা ঘু'রে ঘু'রে চ'লে গেল—সৌভাগ্যশালী ভক্তেরা, আস্তে আস্তে ভিতরের দরজা খুলে কত খেলেন। হে প্রেমময় পরমেশ্বর, কোন দিন তোমার কাছে কেহ এ দরজা খু'লে যায়, কোন দিন ও দরজা খু'লে যায়। কোন দিন গানে, কোন দিন আরাধনাতে, কোন দিন ধ্যানে, কোন দিন গোটা চারি কথা ব'লে, কোন দিন নির্জ্জনে অবাক্ হ'য়ে তোমার ভক্তেরা তোমার ঘরে প্রবেশ করে। কোন দিন চিঠি লিখিয়া তোমার জওয়াব পাওয়া যায় না, কোন দিন চিঠি লেখা হয় নাই, চাকরি উপস্থিত। কোন দিন ছাতি ফেটে যায়, দুপুর বেলা চেঁচিয়ে অনেক কষ্টের পরেও তোমার সঙ্গে দেখা হইল না। কোন দিন উপাসনা করিতে বসিয়াই এক লক্ষ টাকা, তার সঙ্গে আবার কত সাল হাতী ঘোড়া।—চাই বল্‌লে হয়

কি, ঢুক্‌তে পারে না সব—কেহ বুঝ্‌লে না, তোমার ঘরের ভিতরের দ্বার কোন্ দিকে। একজন গেল দুই শ বার, সে বলে, পশ্চিম দ্বারে, আদতে পশ্চিমে দরজা নাই, কেহ বলে, পূর্ব্বে—মনটা যদি ভাল হয়, একটা না একটা দরজা দিয়া সহজেই প্রবেশ কর্‌তে পারে। তুমি জান—যদি ক্রমাগত এক দরজা দিয়া সাধককে আস্‌তে দেওয়া যায়, তার ব্যাকুলতা থাকে না, সে কেবল নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা—তুমি তো তেমন লোক নও। ওমা, এ দ্বারটা বন্ধ হ'ল যে! যদি মূর্খ হয়, ফিরে যায়, আর যদি ব্যাকুল হয়, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আর এক দরজা দিয়ে আসে; তুমিও একটু হাস্‌লে, সেও হাস্‌ল। একটু তৃষ্ণা হইল না, তুমি তাকে ঘরে যেতে দিবে কেন? আরও আকুলতা হ'ল, এবার দরজাটা খুল্‌লে। এটা শাস্তি দিবার জন্য নয়, তুমি খেলা কর। স্বর্গের দেবতারা, ভক্তেরা, সাধকেরা, ব্রহ্মপ্রাণীরা, তাঁহারা কি করেন? একবার তোমাকে হৃদয়ের এদিকে বসান, একবার ওদিকে বসান, একবার তোমাকে জ্ঞান দেন, একবার ভক্তি দেন, এক ফুল দিয়া পূজা করেন না। তুমি যদি দেখ, এই দিকে গেলে তৃষ্ণা হয় না—তুমি নাকাল কর। তুমি পাঁচ ঘণ্টা ছেড়ে, দশ ঘণ্টা ঘুরাও না কেন, পথ চলাটা তো আর শ্রান্তির বিষয় নহে; চল্‌তে চল্‌তে দু'টো পাখীর গান শুনব, বাগানের শোভা দেখ্‌ব—তুমি এরূপ খেলা কর্‌বে প্রাণবন্ধুর মত। আজ দরখাস্ত দিলাম, তোমার হস্তে নাকাল করবার জন্য। পায়ে পড়ি, নাকাল কর। একবার অন্ধকার দেখাও—শেষে যখন সেইটী পাব, বড় দামের জিনিস পাব। এখন একটু ইচ্ছা ক'রে বোকা হচ্চি। এ সময় তুমি যা কর্‌বে, মিষ্ট লাগ্‌বে। ভাল নাকাল কর্‌ছ, দয়াময়! কে এমন নাকাল করে—ভালবাস ব'লেই তো কর। অঙ্গ অবশ হ'য়ে যা'ক নাকাল হ'য়ে। হে প্রেমময়, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তিবাচন)

তোমার হাতে ময়দা মাখার মত, ভিজা মাটীর মত হ'য়ে থাকি, যাহা গড়্‌তে হয় গড়, উহু বল্‌ব না।—কয় জনকে মিল্‌তে দিবে না, পরস্পরকে একটু তফাত কর্‌বে কর, শেষে মিল্‌তে হ'বে। তুমি খেলা কর। কি কর, কার চুলের মুটো ধ'রে খানিক অন্ধকারের ভিতর, খানিক আলোকের ভিতর দিয়া নিয়ে যাও। কোন্ দিকে নিয়ে যাও, সে জানে না। মাঝে থেকে ভক্ত হাসেন, এই জঙ্গলের কাঁটা, এই বাগানের ফুল। তোমার খেলাই সার কথা।—গেঁথে ফেলেছ, এখন আর চিন্তা নাই, এখন প্রেম-জলে খেলাও, প্রেম-সমুদ্র তো, আর তেঁত জল নয়। হে দয়াময়, তোমার হাতে থাক্‌ব তবে, ঐ মিষ্টি হাতে—কিল মার, যে হাতে খাওয়াও। ঐ নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা (শাস্ত্রটা) শিখাও। না খেয়ে হউক, খেয়ে হউক, সুখে হউক আর দুঃখে হউক, তোমার ঐ ঘরের ভিতর যাব। কথাগুলি বলি, লোকে বুঝে না ; তুমি বুঝ, আর যে বলে, সে বুঝে, আর যাদের বুঝ্‌বার, তারা বুঝে। বুঝুক, না বুঝুক, নাকাল ক'রে লও। একটু ঘনিষ্ঠতা হ'বে। দয়া কর, তোমার সবগুলো যেন ভাল লাগে। দাও, তোমার ঘরে যেতে দাও। যে দরজা দিয়ে হউক, যে প্রণালী দিয়ে হউক, ঐ ঘরের ভিতর নিয়ে, পেট ভ'রে খেতে দাও। এ সময়ে তুমি যাহা দেবে, তাহাই চাই। যাহা দেবে, তাতে উপকার হ'বে। তোমার ঘরে নিয়ে, কত সৌন্দর্য্য, কত লাবণ্য দেখাবে, কত মিষ্ট কথা শুনাবে, খেলাই বা কত রকম দেখাবে। ঢের বাকি—আরম্ভ কর। গরিবদের একটু সুখ শান্তি দাও। একবার এস, দীননাথ, দয়ার সাগর, খুব তোমাকে দেখে প্রণাম কর্‌ব ব'লে ডাক্‌ছি। তোমার পবিত্র চরণ এই কলঙ্কিতদিগের মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ চরণতলে ব'সে, কেমন ক'রে তুমি ভক্তদিগকে নাকাল কর,

দেখ্‌ব, তাই হ'ব। সেই সব খেলার কথা পরস্পরকে ব'লে সুখী কর্‌ব। এই আশা ক'রে, তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সুলভসহবাস

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৭৯৭ শক ;
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

দীননাথ, দয়াময় পরমেশ্বর, আমাকে বসিতে দাও নিকটে—এ কি সহজ কথা ? আমি যতবার আসি, কেহ বারণ করে না, দরজা বন্ধ করে না। ছেলে বেলা শুনিতাম, তোমার ঘরে বড় বড় দ্বারবান্ দ্বার রক্ষা করিতেছে। নূতন শাস্ত্রে, বুঝি, সেই বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলেছ। দু'খানা ইট তো প'ড়ে থাক্‌ত ? অত বড় এমারত ভেঙ্গেছে, চৌকাঠ টৌকাঠ কিছুই প'ড়ে নাই ? ঘর ছেড়ে তোমার বাস করা কবে থেকে হ'ল ? পাপীগুলোর কাছে খবর দেগে, দেবালয় ভেঙ্গে গিয়েছে ! আগে শুনেছিলাম, খুব মস্ত বাড়ী—বড় মানুষের মত। ভয়ে ত্রাসে কম্পিত-কলেবর পাপীগুলো এসে বল্‌বে কি ? ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি—দূর হ'য়ে যা, এ রকমটা জান্‌তাম। এখন জানি, তোমার বাড়ী নাই। এটা গল্প, না, সেটা গল্প, বলে দিও। মহর্ষি ঈশা ব'লেছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার বাড়ী ছিল না মস্তক রাখিবার জন্য—তোমারও তাই ? তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। বাড়ী যদি থাক্‌ত, যেতে পার্‌তাম না, ভয় কর্‌ত। মাঠের মধ্যে তোমাকে পেলাম। যখন মনে করি, তখনই তোমার কাছে বস্‌তে পারি। না খুল্‌তে হয় দরজা, না কারও অনুমতি নিতে হয়। মাঠে মাঠেই, আকাশে আকাশেই, যেখানে সেখানে পেলাম। নকড়া ছকড়া ক'রে

ফেল্‌লে। সহবাসটা এমনই ক'রে ফেল্‌লে। তোমার নামে দেবতারা কাঁপে, আর পাপীরা তোমার কাছে ব'সে ব'সে আবার কথা কয়। তুমি বাড়ী ভেঙ্গে ফেল্‌লে। কেন ভেঙ্গে ফেল্‌লে? তার কারণ বল্‌ছ না। আমি তোমার গরিব ভক্ত, আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নাই। আমি ব'লে বেড়াচ্ছি, তোমার বাড়ী নাই। দীন দুঃখীর কাছে আপনার সহবাস পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে বিক্রী করলে। যেথানে সেখানে প্রভুর সঙ্গে দেখা হয়, তবে আর পাপ কর্‌ব কেমন ক'রে? এ সহবাস নয়, কাণমলা! আমি বলি, দেখা দাও না—তুমি বল, এই যে আমি তোমার সাম্‌নে, তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছনা? আমি বলি, এস না আমার মনের ভিতর—তুমি বল, মন খুলে দেখ দেখি, আমি তোমার ডাকিবার আগে এসে ব'সে আছি কি না? আমি বলি, আমার চোখের কাছে দেখা দাও না—তুমি বল, তুই বলিস্ কি? তোর চোখের কাছে ব'সে আছি, তুই দেখতে পাচ্ছিস্ না? অম্‌নি আমি আম্‌তা আম্‌তা করি। যে সে লোক আস্‌ছে, দেখ না! ঘর ভেঙ্গে দেখা দেবে ব'লে, যা খুসি, তাই করিলে। একটু চেষ্টা কর্‌তে হয় না। "তুই আকাশ দেখিস্ তবে আমাকে দেখ্‌বি না কেন? আমিই যে আকাশ।" এই তো সাধু-সঙ্গ। তোমার সহবাস যদি সুলভ হয়, তাহা আমার প্রিয় হউক, আর আমার দুর্গ হউক, আমি তার ভিতরে ব'সে বলি—জয় জয় দয়াময়! তোমার ভিতরে ব'সে তো পাপ দেখ্‌তে পাই না। মাঠের মত হ'য়ে পড়ে, আকাশের মত হ'য়ে পড়ে, জলের মত হ'য়ে পড়ে, কি কর্‌লে? এই সহবাসে সকলকে নির্ম্মল কর। দোহাই, পরমেশ্বর! তোমার অভয় সহবাসে থেকে নির্ভয় হই। তোমার সুনির্ম্মল সহবাসে থেকে পাপ ছাড়ি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

(শান্তিবাচন)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, হে আমার চিরকালের গতি! গতি কি

হইবে? যে ধন দাও, সব খরচ ক'রে ফেলি। একটা ভাঙ্গা বাক্স, কত ধন দাও, দু'দিন পর দেখি (কত লোকের চাবি লাগে, বাক্সটা ভাল না), আর দেখ্‌তে পাই নে। কত ধন দাও, যদি গণ্‌তে হয়, কত সরকার রাখ্‌তে হয়। এক লাখ টাকা, না, কোটী টাকা, এ যে ঢের, এর হিসাব নাই। পেতেও যেমন, হারাতেও তেমন। এ সহবাস ধন, এর কত দাম, এ সহবাস-ধন পেয়েছি, কত ভোগ করেছি, এ সহবাস-ধনও চুরি করে। এত দিলে, পাড়ার লোকে বলে, এরা এত রোজগার করে, তবুও এদের লক্ষ্মীছাড়া রকম চেহারা যায় না। যাই ডাকি, পিতঃ,—এঁ।—যাই ডাকি, বন্ধো,—এঁ। তুমি এইরূপে সর্ব্বদাই ভক্তকে উত্তর দিচ্ছ। "দুর্ল্লভ রতন" সাধ ক'রে কি তোমার এ নাম রাখা হয়েছে? সকল স্থানেই তোমার পুণ্যময় সহবাস, সুখময় সহবাস। টেবেলে প'ড়ে থাকে, বিছানায় প'ড়ে থাকে, যেখানে সেখানে—বরং কাগজ কলমগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখে, কিন্তু তোমার সহবাসের কেহ আদর করে না। পাপটী ক'রে এসে বস্‌ল, তুমি একটী কিল, কি লাথি মার্‌তে, শাস্তি দিতে—তার পর সহবাস। তা তো কর্‌লে না। দুঃখ পেয়ে এসেছে, বিশ ত্রিশ কলসী জলে স্নান করিয়ে কাছে বসালে। সহবাস বড় দুর্ল্লভ—কাছে গিয়ে বস্‌বে কার সাধ্য! এই দুরন্ত, বোম্বেটে, লেঠেল—এই আমার—এত সাধ্য হ'ল! সে কেবল অবহেলা করিবার জন্য! একটী বাক্স দাও, টাকাটা রাখি। যদি টাকা দাও, তবে বাক্স দেবে না কেন? তুমি টাকা দেবে, বাক্স ক'রে দেবে, তুমি চাবি দেবে। আমরা কিছু কর্‌ব না? আমরা বাবু হ'য়ে থাক্‌বো? পাপীরা কিছু কর্‌বে না? আমরা ভাই ভগ্নীদিগকে বল্‌ব, দেখ্, এই দেখ্, ওদিকে তাকাস্ নে, দেখ্, খুব মহাপাতকী আমি ছিলাম, বাড়ী থেকে ঘৃণা ক'রে সবে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, দেখ দেখি, সহবাসে কি হয়েছি! সহবাসে তোমার ছেলে মেয়ে

তোমাতে প্রমত্ত হ'য়ে যায়, তোমায় ছেড়ে যায় না। পথ চল্‌ছি, পথ চল্‌ছি, এই আবার কাপড় ধ'রে টান্‌লে, নামটা ধ'রে ডাক্‌লে। এম্‌নি ক'রে দুষ্ট ঘোড়াকে যেমন বেঁধে রাখে—তোমার সহবাস-রজ্জুতে বেঁধে রাখ। পরমেশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর। একটী নদী যোগাবে। দুই পাঁচ ঘড়ার কর্ম্ম নয়। এ দাগ কি যায় ঘটী ক'রে জল দিলে? দুই পাঁচটা উপাসনাতে কি এ দাগ যায়? না, দুই পাঁচ জালার জলে যায়? একখানি সহবাস-নদীর ভিতরে ডুবিয়ে রাখ। সেই নদীর জল লাগ্‌লে এ সব ধুয়ে যাবে। সাঁতার ফাঁতার দিয়ে, ডুবে টুবে কোন রকমে নির্ম্মল হ'ব। সহবাসটা নদী হ'ল আমরা যেন মলাযুক্ত মাছ হ'লাম। সহবাস-সাগরে এম্‌নি ক'রে ডুবিয়ে রাখ। খুব শুদ্ধ হই। জীবন ধরি শুদ্ধভাবে। তোমার ছেলে মেয়েদের শুদ্ধ কর। তা' হ'লে বদন ভ'রে তোমার দয়াল নাম ক'রে আমরাও কৃতার্থ হ'ব, দেশের ভাই ভগ্নীদিগকেও কৃতার্থ করিব। এই নাও আমাদের কলঙ্কিত মস্তক, তোমার শ্রীচরণপদ্ম ইহার উপর স্থাপন কর; এই দলটী ঐ চরণ-সহবাসে শুদ্ধ হবে, এই আশা ক'রে তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অন্ধকারের পূজা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

প্রেমময়, হে দীনবন্ধো, পরমেশ্বর, শুন না, বলি। খুব অন্ধকারের পূজা প্রার্থনা করি। দেখ, "হে ঈশ্বর, দীন দয়াল, আলোকের পূজা ঢের হ'য়েছে। অন্ধকারের পূজা কিরূপে করিতে হয়, শিক্ষা দাও।

পৌত্তলিকদের কালীপূজার বিধি আছে, তুমি জান। আমাদেরও এক প্রকার গোপনে কালীপূজার বিধি আছে। আলোক এই আছে, এই নাই; কখনও সুন্দর মুখ দেখ্‌লে, কখনও মুখ ঢাকা পড়িল। আবার ভক্তদের কখন কখন জ্যোতির্ম্ময়ের পূজা হয়। মনটা রগ্‌রগে হয়—যেন আলোকে নেয়ে উঠ্‌লাম; কিন্তু সংসারের যেমন অবস্থা, তাতে সর্ব্বদা তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপের পূজা সম্ভব নয়। অন্ধকারটী দেখ্‌লে, ঠিক যদি মনে হয়, আলো দেখ্‌ছি—সেই ঠিক সাধক। আলোকে দেখে দেখে অন্ধকার মধ্যেও দেখ্‌ব। একজন মহর্ষি গিয়েছিলেন জগন্নাথক্ষেত্রে, তিনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখেছিলেন, তার ভিতর যে কি সুন্দর সুন্দর রূপ! যদি আমাদের ভাল ক'রে বাঁচিয়ে দেবে—চোখ্‌ বুজ্‌লে অন্ধকার, তার ভিতরে যেন বলি, আঃ, এমন মধুর অন্ধকার তো দেখি নাই! গাঢ় হ'য়ে র'য়েছে, খুব কাল, এই অন্ধকারের পূজা—অন্ধকার-রস পান। যে দিন চাঁদ দেখাবে, সে দিনও সুখী; যে দিন অন্ধকার দেখাবে, সে দিনও সুখী। অন্ধকার ও নয়। অন্ধকার কি? দীনবন্ধো পরমেশ্বর! শক্ত সাধন বুঝি, কত দিন লাগ্‌বে? এই যে দুঃখ কষ্ট নিয়েছে ঐ অন্ধকারের ভিতর। খুব কষ্ট যন্ত্রণা, আর হাস্‌ছি—খুব প্রসন্ন হ'য়ে হাস্‌ছি। বৈরাগ্যের কষ্টটী, ঝুলিটী হাতে দিলে। সুখ দিয়েও হাসাচ্ছ, দুঃখ দিয়েও হাসাচ্ছ। খাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ, খাওয়ালে না। দিচ্ছ দিচ্ছ, দিলে না। যদি তোমার হ'য়ে গিয়েছে ছোঁড়াটা, তবে অন্ধকার কষ্ট নেবে না কেন? বৈরাগ্যের বেশ পরাও। কেন বলি না, সুখের পাড়ওয়ালা কাপড় পরিয়ে দাও, না, অন্ধকারের বসন পরিয়ে দাও। একটা আলো যদি দেখাও, দূর থেকে লোকে বল্‌বে—কৌতূহল। খুব অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কাছে রেখে দাও দেখি। খুব আলো জ্বাল্‌লে ঢের পোকা আসে; কে কি মনে আসে, কে জানে? হে দয়াল, হে

গুপ্তধন, হে কাল অন্ধকার, সুন্দর শোভান্বিত অন্ধকার, সুধাময় অন্ধকার, অন্ধকারের জীবন দেখিতে দাও। তা' হ'লে যেখানে থাকি, সুখ হ'বেই হ'বে—আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

(শান্তিবাচন)

দয়াল পিতঃ, ছুরি মার্‌লে, ছুরিকে চুম্বন কর্‌তে পারি, এমন কিছু ক'রে দিতে পার? কেহ কোথাও নাই, আকাশে প্রণাম করিলাম। শূন্যের মধ্যে—খুব অন্ধকার দেখিয়া হাসিলাম। বন্ধুরা মারিলেন, হাসিলাম, এমন কিছু করিয়া দিতে পার? তা' হ'লে যে সুখ দুঃখ সব এক হ'য়ে যায়। কাল, এই ঘোরান্ধকারের ভিতরে তুমি, এই যে তুমি, তোমাকে কেন বুকের ভিতর টানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। ওরে বাপ্‌রে, ঘোরান্ধকার ব'লে কেন আবার সংসারে পালিয়ে গেলাম না! ও অন্ধকার, আর এও অন্ধকার! এ অন্ধকার মধ্যে কেন ব'সে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। ওটা বুঝি মিথ্যা অন্ধকার, আর এ সত্য অন্ধকার। ও অন্ধকার কথা কয় না, যদি কয়, চেঁচিয়ে ভয় দেখায়। এ অন্ধকার কথা কন ভক্ত শুন্‌তে পান। এ অন্ধকারটা আবার আলো হয়। তাইতে বুঝ্‌লাম, অন্ধকারও নয়, আলোও নয়। শাদাও নয়, কালও নয়। খুব অন্ধকারের ভিতর নিয়ে যাও, আর বল দেখি, দু' হাজার বাতি জ্বলেছে কি না। কয়টা মরেছি, গোণ দেখি? কুড়িটা। কুড়িটা ফুল ফুটেছে কি না? কেহ তো বলে না, আর বৈরাগ্যের কষ্ট দিও না। দাও, দাও, আরও কষ্ট দাও, খুব মার খেয়ে ভাল হ'য়ে যাই। খুব অন্ধকার, খুব প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে, খুব অনুকূল দেখি। তবে বল্‌ব, দয়াল নামের জয়—জীবনতরী দয়াল নামের পাল পেয়েছে। দীনবন্ধো, আশীর্ব্বাদ কর। সুখও কিছু নয়, দুঃখও কিছু নয়, আলোও কিছু নয়, অন্ধকারও কিছু নয়—এইটী বু'ঝে

তোমার চরণতলে প'ড়ে থাকি। হে মধুময় ঈশ্বর, তোমার চরণপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চাষাদের বন্ধু

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ;
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে দীনবন্ধো, পরমেশ্বর, এ জীবনে কত দূর উন্নতি হয়, একবার বলিয়া দাও। আমাদের মত লোকের কত উন্নতি হয়, একবার বল না? তোমার কাছে বসিলে এত সুখ ভোগ করি; কিন্তু যেন একটা কি আছে প্রাণের ভিতর, কেমন একটা জন্তু ব'লে দেয়, "তোর উপাসনা ভাল হ'তে পারে; কিন্তু তোর জীবন আর ভাল হ'বে না।" একটা ভাল যন্ত্র দিতে পার? "কেন, কি করবে?" এই মনের ভূমিটা খুঁড়ে দেখ্‌ব, সেই জন্তুটা কোথায় আছে। এত ঐশ্বর্য্য—আর এ কি কম সুখ? হে ঈশ্বর, মনুষ্যজীবনে তোমার কাছে এমনই ক'রে উপাসনা করা, এ কি কম সুখ? আপনাকে আপনি চিন্‌তে পারি না উপাসনার সময়—এখন যা দিয়েছ, এ আমাদের পক্ষে অমূল্য রত্ন। এ জন্তুটা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কেন? বলে, "তোমার জীবনটা আর ভাল হ'বে না।" হে পরমেশ্বর! একবার খুঁড়ে দেখি, পশুটা কোথায় আছে—এমন লোক ভিতরে থাকিলে, যত ভাল ক'রে দাও না, আবার নরকে গিয়ে ফেলিবে। এমন সুন্দর ফসল হ'লো যে ধানের শোভা বেরিয়েছে—দেশ শুদ্ধ লোক তাকিয়ে রয়েছে, এ ধান খাবে; একবার এসে ধানের পানে চায়, কত সুখ পায়। ও পরমেশ্বর! ও পরমেশ্বর! আর বল্‌ব

কি—আবার ভিতর থেকে গজিয়ে উঠে কতকগুলি গাছ—পোকা ধরে—মাটীটা খারাপ, জমি খারাপ, বীজ ভাল—এ জমিতে চাষ করিতে এসেছ? ভাল ভাল ভাল! বেছে নাও নাই কেন? কত পাপের জড় রয়েছে দেখ, পরমেশ্বর! তুমি এ মাটীর চাষা হ'য়ে, মাটী খুঁড়ে একবার পরিষ্কার ক'রে ফেল। করবে? দয়াসিন্ধো পরমেশ্বর, ভক্তহৃদয়ের চাষা হ'য়ে এ কাজ কর না কিছুদিন? আমাদের জমিটা ভাল ক'রে দাও—আমরা না হয় পরে মাচা বেঁধে ব'সে থাকব, জন্তু তাড়াব। আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। তখন একটা ভাল ফল ফলতো না—তবে ঐ দেখছ, ভিতরের জড়গুলি যায় নাই! সমভূমি ক'রে প্রেমজল ছেড়ে দাও। ধানগুলো যে বেরোবে, তার নয় অর্দ্ধেক তোমাকে দেব, প্রথম ফল তোমাকে দেব—আর আনন্দের সহিত ভাত রেঁধে খাব। তুমি এতটা এনেছ ভাল ক'রে—আমি তো আমার মত বলছি না। তুমি নয় বড় লাঙ্গলটা ধর, আমরা নয় সঙ্গে সঙ্গে থাকি—একবার ভূমিটা শুদ্ধ ক'রে দিয়ে যেতে হ'বে। বৎসরকার দিনে স্ত্রী পুত্র সবাইকে ডাকিলাম, দেখি, ফসল হয় নাই। তার পর কি হ'বে? বলছি, হে পরমেশ্বর, মাটীর ভিতরটা শুদ্ধ ক'রে দাও। চাষা ক'রে রাখ, তোমার পদতলে তাই হ'য়ে থাকি। দয়াল প্রভো, জগতের দুর্ভিক্ষ হ'লো, ধান-জমি খারাপ হ'য়ে গেল। তুমি গরিবদের মাটীটুকু ভাল ক'রে নাও, একবার পরিষ্কার ক'রে নাও, এই চাষাদের কথা শুন। যদি ভূমিটা তেমন কর—যে বৃষ্টি হ'চ্চে, যে শুভ লক্ষণ দেখা দিচ্চে, যে বৈরাগ্যের সার প্রস্তুত হচ্চে—খুব দু'টী বেলা সাধন করব, তুমি যে চাষাদের বন্ধু, এ চাষাগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত করতে করতে লাঙ্গল চালাবে। তুমি কাছে এসে বসলে, ব'সে বললে, আমি তোমার বন্ধু। কত জান তুমি। দোকানি হ'য়ে কত রস খাওয়াও, আবার খাওয়াতে গিয়ে চাষাদের সঙ্গে ব'সে বল, খুব ভাল জিনিস

এয়েছে। গরিব কাঙ্গালদের মাটী ভাল হ'বে, এই আত্মার ভূমিটী বেশ সুন্দর হ'য়ে যাবে, রাশি রাশি ফল শস্য হ'বে, চাউল তরকারি হ'বে— আপনার উপকার, দেশের উপকার ক'রে নেব; তোমার পায় পড়ি, আশীর্ব্বাদ কর, চাষাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

(শান্তিবাচন)

হে প্রিয় পিতা পরমেশ্বর, হে দয়াল! দেখিলে দুঃখও হয়, দেখিলে হাসিও পায়; ধানের ক্ষেতে কতকগুলি বাবু চাষবাস কর্‌ছে। বাবুয়ানি-টুকুও আছে, লাঙ্গলও ধরেছে—মাটী কোদ্‌লায়ে কাপড়খানার খুট ধ'রে ধ'রে বাঁধছে, পাছে মাটী লাগে। হাগা ঈশ্বর, এ অবস্থায় বাবুর মত সুখপ্রিয় আসক্ত হ'লে কি চলে? আদর ক'রে চাষা ক'রে নিয়ে গেলে, গরু দিলে, লাঙ্গল দিলে। ওখানে কেন? এটী ভাল লাগ্‌ল না? হে পরমেশ্বর! এদের ব্যাপার দেখে হাস্‌ব, না, কাঁদব? দুঃখ হয়, এরা চাষ কর্‌তে এলো, একটা ধানও ফল্‌ল না। হাসি পায়, এখানেও এরা বাবুয়ানা করে! চাষা হ'য়ে স্বর্গে যা'ব, ঠিক তো? হে করুণাময়, ভাল বুদ্ধি হউক—চাষার সুখ জানি না, চাষার ব্রত জানি না! চাষার ব্যবসায়, আমরা চাষা। কেমন দুঃখী বিনয়ী হ'ব—পার্‌ব না, তো মর্‌তে এলাম কেন? পাছে গায় একটু কাদা লাগে—এখন কি আর কষ্ট ভাব্‌লে চলে? এমনই বেড়া দিয়া রাখিবে—ষোল আনা আদায় দিয়ে নিও— তুমি চাষ বাস কর, আর নিজে জমীদার হ'য়ে আমাদিগকে তুমি খাটাইয়া লও। আমরা প্রভু হ'তে আসি নাই, চাকর হ'তে এসেছি। বেশ ধানগুলো চেগে উঠ্‌ল, জল এলো, তবে তো আমাদের দুঃখ বিপদের ভাবনা নাই? দেখ সুখী চাষাদের—গরিব কাঙ্গাল বাড়ী গিয়ে যে শাকান্ন খাবে—মুখখানা চাষার মত হোক্, মুখটা কিন্তু ষোল আনা চাষার

মত হয় নাই। যে চাষার একখানা কুঁড়ে ঘর, আর একখানা লাঙ্গল—সে চাষার কেন দুঃখ হ'বে? সেই দিনের প্রতীক্ষায় প'ড়ে আছি—চাষার পক্ষে সেই দিন ঠিক। যে কাঁদিতে কাঁদিতে বীজ ফেলে, সে হেসে হেসে শস্য সংগ্রহ করে। ঐ চরণতলে পড়িয়া থাকি, চাষার ব্যবসায় শিখি; দিন কতক দুঃখ করিব, তার পরে ধর্ম্ম পুণ্যের সুখ সম্ভোগ করিব। এখন সেই ক্ষেত্রটী ছেড়ে যাব না, খুব পরিশ্রম করব, খুব সাধন করব। শেষে খুব আনন্দে ধান পেয়ে খুসি হ'ব, এই আশা ক'রে, সব ভাই ভগ্নী মিলে, তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অচিন দেবতা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, পরমেশ্বর। কেবলই এই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি কে? আমি বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, হে পরমেশ্বর, কেন না, আমি বলিয়াছি যে, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি বুঝিলাম, আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমি যে মনে মনে ভাবিতাম, আমি তোমাকে চিনি, আমি তোমাকে জানি—আমি যথার্থই তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বলিয়া দাও, তুমি কে? আমি এদিকে তাকাইতেছি, ওদিকে তাকাইতেছি, মুখের পানে তাকাই, চোখের পানে তাকাই, তোমাকে চিনিতে পারি না। আমার কাছে এসে ব'সেছ, কত বছর, আমার ঘরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রে কত টাকা রেখে যাও; কে তুমি? আমার মন আঁকু

বাঁকু করে। তুমি ঈশ্বর, তুমি বিশ্বপতি, কিছুই হ'ল না, এ শব্দে নির্ব্বাচন হয় না। আমি ভুল করিয়াছি, একটা ভুল হ'য়ে গিয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী ব'লে জানিতাম আপনাকে—কেন আমি বলিলাম, আমি তোমাকে চিনিয়াছি, একটা নাম তোমাকে দিতে পারিলাম না। এখনও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। কে তুমি? আমার কে হও? আমার কে হও? বল না, ঈশ্বর? আমাকে এত ভালবাস কেন, এমন ক'রে টান কেন তুমি? আমাকে সুখের সাগরে ডুবিয়ে দাও কেন তুমি? আমি বুঝ্‌তে কি পার্‌ব না, তুমি কে? ও ঈশ্বর! বলিয়া দাও না? আমি তোমাকে চিন্‌ব না, অথচ আমার চোক দিয়া ভক্তি-জল পড়্‌বে? আমি রোজ রোজ তোমার কাছে আস্‌ব, আর লোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌তে পার্‌ব না, কে তুমি! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি আমার পিতা মাতা, গতিনাথ,—এতে কি? এতে তো আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল না। তুমি খুব ক'রে বল না—"তোকে সুখ দিতে এসেছি, মুক্তি দিতে এসেছি।" কিন্তু এতে আমার মনের আগুন নিব্‌বে না, নিব্‌বে না। তুমি আমার কে? তোমার সঙ্গে আমার কোন্ পুরুষে কি সম্পর্ক ছিল? এত ক'রে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল্‌বে না, আর এমনি ক'রে ভোলাবে? আমার জ্ঞান চূর্ণ হ'ল—আমি কি করিলাম এই পনের বৎসর? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তোমার সেবা পূজা অর্চ্চনা করা দূরে থাকুক, তোমাকে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেমন দয়াময় তুমি, কেমন ক'রে তাকাও, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল চুলের মুঠি ধ'রে ঐ বাগানের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। এই বুঝ্‌ছি—তোমার এক শ আট নাম হ'ল, দু' হাজার নাম হ'বে; কিন্তু তুমি আমার কে হও, কে এই কথার উত্তর দিবে? যখন তোমার নাম প্রচার কর্‌তে যা'ব, জগতের লোকগুলো বল্‌বে, কাকে প্রচার কর্‌ছিস্, আমি

কি বল্‌ব, ঐ যে তিনি—সেই—যাঁর পাপীদের শরীর মনের উপর বড় লোভ পড়েছে। আমি যে বড় মূর্খ, কিছুই জানি না। আমি তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না। দয়াময় তুমি, প্রেমসিন্ধু তুমি, যা আছ, তাই তুমি। তুমি ব'লো না, তোমার যা ভাল হয়, তাই কর। ব'লো না, বল্‌ছি। কি সম্পর্কটা আছে ভিতরে? পরিচয় দেওয়া হ'ল না। সম্পর্কটা বুঝি এখন জান্‌তে দিবে না? মূর্খ না হ'লে, বুঝি, সুখী হওয়া যায় না। আমার পুঁথিগুলো সব পুড়িয়ে ফেল্‌বে, আমার বাক্স ভরা সব বই পুড়িয়ে ফেল্‌বে? আমাকে মূর্খ ক'রে দিয়ে, তার পরে খুব সুখী কর্‌বে? জ্ঞানীরা শাস্ত্র প'ড়ে যে আনন্দ পায় না, তাই তুমি আমাকে দিবে। মা যেমন কোল থেকে ছেলে ছেড়ে দেয়—আবার লাফিয়ে কোলে উঠ্‌বে ব'লে—সেটা তোমাকে না বুঝ্‌তে পেরে, আরও ভক্ত হ'বে ব'লে। এমনই ক'রে মূর্খ ক'রে তফাৎ রেখে, তোমার ভক্তের প্রাণটা তুমি টান। লোকে আমাকে বলে, তুই তো গাধার চেয়েও নির্ব্বোধ, তুই যাঁকে বুঝিস্ না, চিনিস্ না, তবু তাঁর কাছে কেন যাস্? আর বলে, এটা হাঁ ক'রে মূর্খের মত, বোকার মত তাকায়। বলুক গে, আমার মূর্খ হওয়াই ভাল। কাজ কি আমার লেখা জোকায়, তোমাকে চিন্‌লাম না, বুঝ্‌লাম না—ও রূপের মাধুরী কিছু বোঝা যায় না।—বুঝেছি, এই অহঙ্কার সাপটা যেন ফোঁস্ ক'রে না উঠে। এই অগ্রগামী পণ্ডিতকে মূর্খ ক'রে রেখ। আমি চিন্‌লাম না, বুঝ্‌লাম না, মূর্খ হ'য়ে প'ড়ে রইলাম। এমন সুন্দর সামগ্রী ক্রমাগত দেখ্‌ছি, হায়, এর নাম জান্‌লাম না। দেখ, পরমেশ্বর, মূর্খ ক'রে প্রাণটাকে তোমার চরণের দিকে টেনে রাখ, এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

(শান্তিবাচন)

হে দয়াসিন্ধো, কল্পতরু, কত খেলাই জান; কিছু বুঝ্‌তে দিবে না,

আর এমন ক'রে প্রাণটা টান্‌বে ? যাঁর খাই, যাঁর চাকরি করি, তাঁকে চিন্‌তে পারি না, এ সব তোমার লীলা খেলা, এই জন্য মনে আনন্দ হয়। একটা একটা ঘূর্ণা জলের ভিতরে পড়া তো সহজ নয়।—ঐ যে বুঝ্‌তে দাও না, এর ভিতর মানে আছে। ঐ যে তোমার নাম আমাদের অভিধানে পাওয়া যায় না—আচ্ছা, তুমি যে দিন দিন অভিধান ছাড়াইয়া উঠ্‌ছ, তোমার দশা কি হ'বে ? একটু বিবেচনা কর, ভবিষ্যতে তোমার কি হ'বে ? ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তুমি।—আর শব্দে তোমাকে পাওয়া যায় না। ডোবায় ছিলাম, পুকুরে ছিলাম, নদীতে ছিলাম, এখন অগাধ সমুদ্রে—পাঁচখানি শব্দ আমাদের অভিধানে, কি নাম দিব তোমার ? খুব বাড়াবাড়ি করিলে। আমাদের জ্ঞানটা পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিলে।—কাকে ঘরে নিয়ে যা'ব ? কি ব'লে ডেকে ঘরে নিয়ে যা'ব ? তোমাকে কি 'হেঁগা' 'ওগো' ব'লে ডাক্‌ব ? তোমার নামটা শিখি নাই। হেঁগা ব'লে তোমাকে ডেকে নিয়ে যা'ব ? প্রাণ বল্‌ব ? ঢেউ বল্‌ব ? এক-টানা নদী বল্‌ব ? তুমি মানুষ খুন করিবার জন্য ব'সে আছ, তাই ব'লে ডাক্‌ব ? কি বল্‌ব, আমি জানি না। আমার প্রাণ আঁকু বাঁকু কর্‌ছে। আমার প্রেমটা বাড়িয়ে দাও, আমি উন্মত্ত না হইলে সুখী হইব না। খুব আমার ব্যাকুলতা না হ'লে, আমি বাঁচি না, এ আমার স্বভাব। আমি যখন খুব তোমাকে পেয়েছি, তখন বুঝি, কিছুই পাই নাই। যখন আমি খুব সুখী হই, তখন আমি বুঝি, আমি অত্যন্ত গরিব। তোমাকে জেনেছি বল্‌লেই যে আমি মরিব। কে তুমি ? কে ব'লে দিবে ? গুরু কৈ, কার সাধ্য ব'লে দেয় ?—প্রাণ ব্যাকুল হউক না, ঢের জান্‌তে হ'বে। একটু একটু উপাসনা ক'রে গেলে হয় না।—সমস্ত দিনটা ঘুরিয়ে নিচ্ছ। —বেনামি চক্রে ফেলে ঘুরাচ্ছ। নাম নাই, একটা চক্র! ঘুরিয়ে মার্‌বে ? হে আনন্দময়, তোমার আরও কত নাম এর পর বেরোবে।

অকুল সমুদ্র তুমি ; যেদিকে হাত দি, কতকগুলো প্রেমই উঠে, ভক্তিই উঠে, সুখ উঠে, শান্তি উঠে, হাসি পায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে ? তোমার নাম কি ? তুমি বল, তোর সে কথায় কাজ কি ? নাম দিয়ে তুই কি কর্‌বি ? তুই সুখ নে না। এম্‌নি ক'রে সাধককে ভুলিয়ে ফেল ; কিন্তু, এমন ক'রে যে মন ভুলায়, তাকে জান্‌তে হ'বে। এমন লোককে না জান্‌লে হ'বে না। নাম আর কি ? নামও যা, রূপও তা, গুণও তা। নামও জান্‌ব না, অথচ পূজাও কর্‌ব, তাই আমি বলি, নামটা দাও। ফাঁকি দিলে, ফাঁকির ভিতর পড়্‌লাম।—তোমার ফাঁকির উপরে আবার বুদ্ধি চালাবে কে ? কেবলই ভাব্‌ব, আমাদের আহ্লাদ-সাগর বন্ধু কেমন, তাঁর কাছে বস্‌লে কেমন আনন্দ হয়। তোমার চক্রে সর্ব্বদা ঘুরাচ্চ। তোমার এই হাতে পরিত্রাণ পা'ব, আশার সহিত ভাই ভগ্নী সকলে মিলে, তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গলবস্ত্র হ'য়ে প'ড়ে থাকা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ;
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, দয়াময় ঈশ্বর! "আবার কি বল্‌তে এসেছিস্‌? এই যে তোদের কত দিলাম। আবার কেন এয়েছিস্‌? আবার কি চাস্‌?" দেব! চাই বই কি, আমাদের কি হ'য়েছে ? যখন দাও হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে, তখন মনে করি, খুব হ'য়েছে—বাড়ীতে এসে দেখি, বুদ্ধি-সরকারকে ডেকে হিসাব ক'রে দেখি—এ টাকায় সংসার চলে না। হে কৃপাময়! তোমার কার্য্যালয়ে যতদিন কার্য্য করিতেছি, দুই চার

টাকা মাইনেতে আরম্ভ ক'রে, অনেক উচ্চপদ পেয়েছি; আগে মনে করিতাম, দপ্তরিগিরি ক'রে খা'ব। বড় দয়া ক'রে তোমার প্রকাণ্ড আফিসে একটী চাকরী দিলে। তার পর বৎসরে বৎসরে মাইনে বাড়িয়ে দিলে। হে দয়াময় পরমেশ্বর! সেই মাঘ মাসগুলো, সেই ভাদ্র মাসগুলো, সেই পূজার সময়—আরও এই ঘরে ব'সে কত টাকা পেলাম। গাড়ী বোঝাই ক'রে আনিলাম। উপাসকের কাজ থেকে উঠিয়ে নিয়ে প্রেমিক করিলে, প্রেমিকের আসন থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভক্তের টুলে বসালে,শেষে বৈরাগী যোগীর উচ্চপদ দিলে; কিন্তু এখনও ধার হ'য়ে আস্‌ছে। হে পরমেশ্বর! এত টাকাতেও আমাদের চলে না। আমরা যখন আসি, ঢের ধার ক'রে এসেছিলাম। আর চাকরী কারও বাড়ীতে করি না, যাতে সংসারটা চলে, এমন ক'রে দাও। আমি দেখি যে, আমার দেনাগুলো শেষ হ'ল। আগেকার ঢের পাপ আছে, প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাক্, একটু মাইনে বাড়িয়ে দাও না। এমন সময়ে তোমার রাজ্যে খাওয়া পরা হ'ল না ব'লে, আবার যেন সংসারে ফিরে না যাই। তুমি কি দেখ্‌ছ না, আমাদের সংসার কি ভাবে চলে? তুমি দেখ্‌ছ না, কার মনে কি আছে? কে কি কর্‌ছে, কার মনে কি বাঘ ভালুক আছে, তুমি দেখ্‌ছ—তবে দাও, মাইনে বাড়িয়ে দাও। পরিবারের কেহ খেতে পায় না ব'লেই তো তুমি এনেছ। এ কয়টা দিন রেখে দাও। মনের ভিতর যা আছে, তা' দেখ্‌ছ, এক একটা চড়, লাথি মার—আমি কাঁপব, পৃথিবী কাঁপ্‌বে। আমরা যাই বল্‌ব, আমরা ভাল হ'য়েছি, অম্‌নি ঠাস্ ক'রে চড় মের। আপনারা খেতে পাই না, পরকে বিলাইতে যাই, এই কপটতা, এই বক্তৃতা দিবার অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ হ'ল।—লোকগুলো খানিক পরে দেখে, সব ফাঁকি। তুমি যেমন তেমন ঈশ্বর বুঝি! অন্যে যা করে করুক, তোমার সংসার ওরকমটা হয় না।—

অর্থাটি কি কিছু থাক্তে পারে? "আমি ভার নিয়েছি, বাঁচিয়ে দেব", তুমি যখন ব'লেছ, তখন কেবল গলবস্ত্র হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিব। ঐ গলায় বস্ত্র দেওয়াই সার কথা। যেমন জন্তুগুলোকে বলি দেয়, কল্পিত দেবতার কাছে—আমাদিগকে বধ ক'রে নব জীবন দাও। তুমি পার। এই নরনারীগুলোকে এনেছ কি কর্তে? পবিত্র সম্পর্ক কর্তে, সুখী কর্তে? তুমি সত্য নও? তোমার এই বিধান সত্য নয়? এগুলো কি? হাত দিয়ে ছুঁচ্ছি, ধর্ছি। স্বপ্ন হ'তে হয় না। বল্লে কেন, "তোরা আয় আমার কাছে।" লোকগুলো তোমাকে গালাগালি দেয়, তাই বল্ছি, আমি বল্ছিনে—উদ্ধার কর্বে যখন, একটী দাগ রাখ্বে না। তুমি উদ্ধার কর্বে না, তো আর কে উদ্ধার কর্বে? পাঁচটা দেবতা রেখেছি না কি? শেষ গতি তুমি। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্ছ, তোরা যে অবিশ্বাসী। বিশ্বাস ক'রে যে তোরা প'ড়ে থাকিস্ না। তুমি কি আধা-আধি ক'রে ছেড়ে দিবে? পরকালে ঢের হ'বে, এখানে যাহা হ'বে, তাই ক'রে দাও। আর সেই পুরাণো বদ্মাইসি—একটা বন্দোবস্ত ক'রে দাও—কাণ ম'লে দূর ক'রে দাও। কারও কথা শুন না, তুমি আর গালাগালি কম শুন নাই। ইঃ, ইনি আবার উপাসনা করিয়ে পাপীগুলোকে ভাল কর্বেন! এই আমাদের ভিতরের লোকেই গালাগালি দিচ্ছে। হে জগদীশ! পরিশুদ্ধ কর, পরিত্রাণ কর। তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

(শান্তিবাচন)

আর কেন ঈশ্বর! এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আর কত দিন আমরা এই প্রকার প্রলোভন মধ্যে পড়িয়া থাকিব? শীঘ্র দিক না সংসার বিদায়। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অসারের ভিতর পড়িয়া থাকিব কেন? বৈরাগ্যের পথে আনিয়া হাত ছাড়িয়া দিও না। এই পথে যেমন মানুষ

বাঁচে, তেমনি মরে। সুখের বাসনা, বিলাসপ্রিয়তা, একেবারে বিনাশ ক'রে দাও। আর বিলাস কি? তোমাকে নিয়ে থাকাই তো বিলাস। তোমার ঘরে গেলে যে সব পাই। ওরে দুরন্ত মন! ইচ্ছা ক'রে মর্‌বি? নির্ব্বোধ মন পৃথিবীর সুখে আসক্ত। ঐ পুরাতন জীবন—আরও একটু লোভ ক্রোধ—ঘুরে ঘুরেই মর্‌বে। ক্রমাগত ঘুরেই বেড়ায় কেন? বৈরাগী পরিবার ক'রে দাও। ভয়-নিবারণের কাছে এসে কি নির্ভয় হ'ব না? যে দিবা রাত্রি তোমার চরণে প'ড়ে থাক্‌তে পারে, সেই সাধু। আমরা বৈরাগী নই, সাধু নই, ঘোর বিষয়ী। তুমি ছাড়া আবার একটী কাজ চাই। ধন, মান, প্রাণ, সব তুমি হ'বে। থাকি না তোমার কাছে; পাষণ্ড ব'সে থাক্‌বে তোমার কাছে? অমন ক'রে তোমার কাছে ব'সে থাক্‌লে, আর কি পাষণ্ড থাক্‌ব? আবার কি আমি যা'ব ঐ গর্ত্তের দিকে? নৌকাখানা আবার ইচ্ছা ক'রে ঐখানটায়ই নিয়ে যা'ব? দুই দিন চার দিনই কেন রাখ না। তোমার কাছে কি একেবারে প'ড়ে থাক্‌তে পারি না? দুই পাঁচটা মুষ্টিযোগ পাঠিয়ে দিয়ে বেঁধে রাখ। খুব শুদ্ধ হই, খুব পবিত্র হই। এই কথাগুলো মুখে না ব'লে যাতে কাজে কর্‌তে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। তোমার ঐ খাঁটি চরণে, ভাই বন্ধুদের সঙ্গে পবিত্রভাবে থাকিব, বৈরাগ্যব্রত ছাড়িব না, কি শুভক্ষণে বৈরাগ্য আসিয়াছে জানিয়া—আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পূর্ণিমার প্রেমচাঁদ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৭ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ;
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে প্রেমময় পরমেশ্বর ! তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া পরিত্রাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য মিনতি করিতেছি। প্রেমরস পান করাইয়া, ত্বরায় যা'তে তোমার ঘরে লইয়া যাইতে পার, এমন উপায় কর। সকল আয়োজন্ করিলে, সাধকদিগকে কাছে আনিয়া ফেলিলে, এখন ক্রমাগত টানিয়া লও, সেই স্থানে লইয়া যাও ত্বরায়, আর ফিরিতে পারিব না। এই তো মানুষের রোগ, কতক্ষণ তোমার দিকে তাকায় ; কিন্তু যাই তোমার চক্ষুর ভিতর হইতে জাল বাহির হইতেছে, এমন সময় পালায়। হে প্রাণেশ্বর ! তোমাকে চিনি না ; কিন্তু তোমাকে মানি। তুমি যে আগে ধর না, আগে যে তাকাও তুমি,—তুমি যে তোমার জীবকে স্বাধীন ক'রে রেখেছ—ঐ তাকান প্রকাণ্ড পাষণ্ড হাতীর মত জোয়ানকে ধ'রে ফেলে। একবার তাকাতে আরম্ভ কর্‌লে আর রক্ষা নাই—ঐ স্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলে—কৈ সে পাষণ্ড—ওরে, এখন পাপাসক্তি কেন টেনে নিয়ে যায় না ? এমনই হাতী, অসুরের ন্যায় কতগুলো লোক তোমার কাছে বাঁধা পড়েছে—প্রেমদৃষ্টিতে বশীভূত ক'রে ফেল। এখানটা তত দৃষ্টি পড়ে না, ওখানটা বসি। তোমার দৃষ্টি বিহ্বল পাগল করে। চাঁদের আকর্ষণে পাগল হয়, সেটা তোমারই আকর্ষণ—অনেকক্ষণ ছাদে ব'সে তোমার পানে তাকাল ; সে কেন এখন এমন এলো মেলো কথা কয় ? আর কেহ বুঝ্‌তে পারে না—এই যে বিষয়ীদের সঙ্গে ব'সে আমোদ কর্‌ছিল, ছাদে বস্‌ল, আর গেল, মজাতে লাগ্‌লে। তার মন ভুলাবার জন্য কোন্ কথা কয়েছিলে ? কিছু করি নাই, তুমি কেবল

তাকিয়েছিলে। প্রেমচাঁদে পাগল করে—একবার মনের আকাশে প্রেম-চাঁদ উঠ্‌ল—ছাদে বোসে বোসে দেখ্‌তেই হ'বে পূর্ণ চন্দ্র—আবার তাকালে, আবার চক্ষুটা কেমন ক'রে এল—যাই, বাড়ী পালিয়ে যাই, মর্ চোখ, ঐ দিকেই তাকায়—আর যে চোখ ফির্‌ল না—ও যে আর কথা কয় না। ওর হাত পা সব হিম হ'য়ে গেল, ও হাসে কেন? ওর অঙ্গ অবশ হ'য়ে গেল কেন? নাথ! তোমার ভক্ত সন্তানের কি কর্‌লে—তুমি হাস্‌ছ, ও দৌড়ে উঠে ধর্‌তে যায়—জলে ডুব্‌তে চায় কেন? ও মনে কর্‌ছে, বুঝি, ওটা প্রেম-সাগর। হে প্রেমময়, কি হ'ল? এ কি অপরূপ রূপ? ওর মন বাড়ী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে—ওর প্রাণটী চুরি ক'রেছ—হৃদয়চোর! চাঁদ দেখিয়ে চুরি কর প্রাণ—একবার বাড়ী যেতে দিলে না। সংসার দু'টো কথা বল্‌ত, তুই পরিশ্রম ক'রে খা—ভুলিয়ে রেখে দিলে চাঁদ দেখিয়ে—ওগো, ওঠ্‌বার ক্ষমতা রইল না আর, যা'বে কেমন ক'রে—তোমার দুষ্ট প্রেমচাঁদ দেখিয়ে ভুলিয়ে দাও। বল্‌ব কি? আমাদের প্রাণটা চুরি ক'রে নাও—একবার কি ঐ চাঁদ দেখিয়ে পাগল ক'রে ফেল্‌বে? তা কি হ'বে? তা কি হ'বে? এ পোড়া চক্ষু তোমার কাছে ব'সে—সেই চাঁদ কি আমরা দেখি নাই? সেই যে আফিসে গেলাম,—ঐ কয়খানা বিল চুকিয়ে দিয়ে আসি—ও ঈশ্বর! আমরা তোমাকে ফাঁকি দিতে যাচ্ছি—ও ছুটি পেলেই মরে। দেখাও তবে প্রেমচন্দ্র। আর ছুটি নেব না—কাছে থেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিও—হৃদয়, প্রাণ আল্‌গা হ'য়ে গেল—হেসে ফেল্‌ছি কেন, জানি না—খানিকটা প'ড়েই রইলাম, যা খুসি, তাই কর। এমনতর যখন হ'ব, তখন তুমি আমার, আর আমি তোমার। আমি চাঁদ দেখে পাগল হ'ব—আমার স্বর্গ, আমার পুণ্য এই ভোঁ। আমি তোমার চরণ ধ'রে এই চাই—আমার ভোঁ কেটে যাবে কেন? কেন? আমার মত্ততা কম্‌বে

কেন? দেখাও তোমার চাঁদ,—একবার একবার দেখাবে, ও রকম আমি চাই না। ও রকম হ'লে চল্‌বে না, বিপদে প'ড়ে বল্‌ছি, অন্ধকার দেখে বল্‌ছি, মানুষ ডুব্‌ছে দেখে বল্‌ছি—কিছুতেই হ'বে না, না, না, না। দেখাতেই হ'বে সেই চাঁদ—সেই চাঁদ দেখিয়ে প্রাণ মন কেড়ে নিয়ে যাও। ভাঙ্গা চাঁদ, তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদ দেখালে হ'বে না, পূর্ণিমা দেখাও, একেবারে আকাশ জোড়া পূর্ণিমাখানি দেখাও। ঐ তোমার চক্ষের চাঁদই দুষ্ট পৃথিবীকে পাগল করে—অম্‌নি ক'রে আমাদের পাগল কর। সংসারটাকে জান্‌তে দিও না, গোপনে গোপনে প্রাণটা চুরি ক'রে নিয়ে যাও, সংসার জান্‌তে পার্‌লে বাধা দিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কাঙ্গালের ধন

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ;
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে দয়াময় পরমেশ্বর! যা বেদে নাই, পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, কোথাও নাই, তাই তুমি চাও ; কোথায় বা পাইব? তোমার যে সব চাওয়া, সে সহজ চাওয়া নয়। অন্য লোকে যা চায়, কোন রকমে যোগাড় ক'রে দেওয়া যায়, টাকা কড়ি দিয়ে সংগ্রহ ক'রে দেওয়া যায় ; কিন্তু তুমি যাহা চাও, কি রকমে আন্‌তে হয়, কোথা থেকে আন্‌তে হয়, কি মূল্য দিয়া আন্‌তে হয়, জানি না। সৃষ্টি ছাড়া জিনিস চাও কেন? যাহা আছে, তাই চাও—বাহিরে যেতে হ'বে না—যার কিছু নাই, নিঃসম্বল, সেই নিঃসম্বলের ঈশ্বর-তুমি। যে বল্‌লে, পুথি লিখেছি, তাই দিব। তুমি বলিলে, দূর হ'য়ে যা। রাজা,

উজীর, পণ্ডিত এল, তাদের তুমি নিলে না; একটী কাঙ্গাল এল, তাকে তুমি নিলে। কাঙ্গাল, দেখিতে কুৎসিত, যার কিছু নাই, যাকে সকলে পথ থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল—তুই যাচ্ছিস্ কেন, রাজা, উজীর, পণ্ডিত সব ফিরে এল—তাকে তুমি বল্‌লে, তুই আয়, তোকেই নেব। যোগী, ঋষি, তপস্বী, তাদেরও দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে, আর ঐ কাঙ্গালকে নিলে; কেন নিলে? সে যে বলেছে, আমার কিছুই নাই। তবে তো তুমি সুলভ হ'লে—তবে তোমাকে দুর্ল্লভ রত্ন কেন বলে?—না, হে ঈশ্বর! এ খেলা করছ তুমি—বরং তপস্বী হওয়া যায়, চল্লিশ বৎসর সাধন করা যায়; কিন্তু আমার কিছু নাই, এ কথা বলা বড় কঠিন। ধনী হওয়া সহজ, নির্ধন হওয়া বড় কঠিন। ধর্ম্মটা এই ক'রে দাঁড় করালে, আমার কিছু নাই, এ কথা বলা কঠিন। যে "কিছু নাই" বল্‌তে পার্‌লে, তাকে তুমি নিলে।—বল্‌লে, দেখ একবার বিচার, বড় বড় তপস্বীরা ফিরে গেল, ঐ কাঙ্গালটাকে নিলেন। কিছু নাই, তবে বুঝি খুব ধন হ'ল—অনেক পড়্‌লাম, তবে বুঝি কিছু পাওয়া যায় না—যদি বলি, আমি মূর্খ, তবে তোমাকে পাওয়া যায়; কিন্তু আমি আমাকে মূর্খ বল্‌তে পারি না, জিহ্বা জড়িয়ে আসে। আমার কিছু নাই, আমি মূর্খ, বল্‌তে পার্‌ছে না কেন? যা সকলেরই বোঝা সহজ, তা বুঝ্‌তে পারে না—এটা বল্‌তে পারি না। জগদীশ্বর! আমার কিছুই নাই—আমি গো-মূর্খ, ধর্ম্মের 'ধ' আমি জানি না, এ বল্‌লেই তুমি এখনই নেবে—একটু দেরি কর্‌বে না, তার সাক্ষী ঐ কাঙ্গাল। এখনই যদি কাঙ্গাল বল্‌লে স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে বল্ না, বল্ না। আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, বলা সহজ হ'ল। আমি কাজ করি, ক্রিয়া করি,-আমি পুণ্যবান্, বলা সহজ হ'ল। হে দীনবন্ধো, কি কর্‌লে তুমি—কাঙ্গালশরণ পরমেশ্বর! কাঙ্গালগুলিকে বেছে নিচ্ছ—তপস্বী,

ধর্ম্মাভিমানীদিগকে দূর ক'রে দিলে—কেন, পরমেশ্বর! আমরা কি কিছুই করি নাই? আমরা তো বই প'ড়েছি, কত কাজ ক'রেছি, উপাসনা ক'রেছি, প্রচার করিয়া কত দেশের উপকার করিয়াছি—আমরা তো গান গেয়ে বলি, আমরা দুঃখী কাঙ্গাল—কিন্তু প্রাণটা বলে না—অহঙ্কার গেল না। আপনার গালে চুণ কালী দিয়ে—কাঙ্গালদের পায়ের ধূল নিয়ে—দুর্ল্লভ-রতন ও কাঙ্গাল-শরণ নামের কিসে মিলন, দেখি। যে "আমার প্রাণ কাঙ্গাল" বল্‌তে পার্‌ল না, তারই পক্ষে দুর্ল্লভ তুমি, আর যে বল্‌লে, আমার কিছু নাই, আমি কাঙ্গাল, তার পক্ষে সুলভ তুমি; তবে আশীর্ব্বাদ কর—ব্রহ্মের প্রতি ষোল আনা মূর্খ হই। হে দয়ার সাগর ঈশ্বর! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে কাঙ্গাল হ'য়ে থাকি; জ্ঞানী ব'লে নয়, তপস্বী ব'লে নয়, মূর্খ হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে চ'লে যাই, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

(শান্তিবাচন)

হে প্রেমসিন্ধো! প্রেমময়! তোমার চারিদিকে কেবল কাঙ্গাল বেড়াইতেছে,—তোমার স্বর্গরাজ্যে আদর কেবল কাঙ্গালদের—কাঙ্গাল-সেবা। তোমার সঙ্গে কথা কয় কাঙ্গাল। তোমার যা কিছু ধন পায় কাঙ্গাল। তুমি বেড়াও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় কাঙ্গাল। তুমি কাঙ্গালদের সমাদর কর্‌লে। ধনী হওয়া, যোগী হওয়া শক্ত নয়, কাঙ্গাল হওয়া, বৈরাগী হওয়া বড় শক্ত। বাহিরে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই—মন যে অনেক জরির কাপড় প'রে ব'সে আছে। বাহিরের নির্য্যাতনের ভাব গ্রহণ করি, ভিতরে গিয়া দেখি, হে ঈশ্বর! বল্‌ব কি? ভিতরে ভিতরে কত বিলাস—সে আগে খেত বেগুন পোড়া দিয়ে, এখন পোলাও—সে আগে ছিল চাকর, এখন প্রভু হ'য়েছে, চার জনকে খাটাতে যায়; আমি তাকে চাকর কর্‌তে যাই—ভিতরে তার অহঙ্কার

—ভিতরে নবাবী—সেই বিলাসেই মরে। যার প্রাণ কাঙ্গাল হ'ল, তার সবই হ'ল। ধনীদের সঙ্গে ব'সে, জ্ঞানীদের সঙ্গে ব'সে কি হ'বে? কেন না ভিতরে ভিতরে দেখ্‌ছি, তোমার জায়গা কাঙ্গালদের জন্য উৎসর্গ হয়েছে—যে দিনে, যে মুহূর্ত্তে কাঙ্গাল দেখ্‌বে। বাহিরে কাঙ্গাল হ'লে কি হ'বে? ভিতরে কাঙ্গাল ক'রে দাও দেখি। ভিতরে গরিব কাপড় পরি। শরীরই কাহিল হ'য়ে যায়—আত্মার কি হ'ল? হে ঈশ্বর! দয়া ক'রে প্রাণকে তোমার কাঙ্গাল ক'রে নাও। দুঃখীদের যদি এত ভালবাস—বৈরাগ্যের মাইনে যেন এই হয়, প্রাণটা কাঙ্গাল —কাঙ্গালের মুখ দেখ্‌তে তুমি এম্‌নি ভালবাস—তুমি বুঝি ভুল না। ঐ কাঙ্গালটার কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে যাচ্ছ কেন?—কাঙ্গালের প্রতি পক্ষপাতী তুমি, কেন, হে ঈশ্বর? কাঙ্গালপ্রিয় এত হ'লে কেন তুমি? বাড়ী ঘর দ্বার, এত বই পুঁথি সাজিয়ে রাখি—এ লোকটা অনেক প'ড়েছে—অনেক নিয়ম করে, সৎ ক্রিয়া করে—একবার তাকালে না—আমার মুখে চূণ কালী দিলে—আর ঐ কাঙ্গালের কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে গেলে! হে কাঙ্গালপ্রিয়, তুমি বল্‌ছ, তোরা যে দিন কাঙ্গাল হ'বি, আমি তোদের টেনে নিয়ে যা'ব। তোমার প্রসাদে কাঙ্গাল যে হ'ল, সে বাঁচ্‌ল। কাঙ্গাল হ'তে না পার্‌লে আর নিস্তার নাই, মজা নাই; যখন তোমার এস্তেহার বেরিয়েছে, কাঙ্গালেরাই তোমার কাছে যেতে পার্‌বে, তখন কাঙ্গাল না হ'লে, আর কি আমাদের রক্ষা আছে? এম্‌নি মুখখানি ক'রে দাও, আড়ে আড়ে দেখ্‌ব, কাঙ্গালের পানে তোমার নজর প'ড়েছে—এবার কাঙ্গাল মুখ দেখে তুমি এলে। আর কিছুতে যদি মজ্‌বে না, এই প্রাণটাকে কাঙ্গাল কর। তুমি কাছ দিয়া চ'লে যাবে, আর এসে ব'সে পড়্‌বে;—তখন বল্‌ব, কাঙ্গালের আদর তুমি এত কর। দর্পহারী নামের মহিমা প্রকাশ কর। সকল

প্রকার অহঙ্কার, অভিমান চূর্ণ ক'রে, কাঙ্গাল ক'রে, তুমি ভালবেসে কোলে ক'রে নিয়ে যা'বে। সমস্ত বৈরাগ্য, কষ্ট-সাধনের যেন এই ফল হয় যে, কাঙ্গাল হ'য়ে তোমার চরণতলে প'ড়ে থাক্‌ব। অত্যন্ত গরিব হ'য়ে, ভীত হ'য়ে তোমার শ্রীচরণে প'ড়ে থাকিব, এই আশা ক'রে, সকল ভাই ভগ্নী মিলে, তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভবকাণ্ডারী

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৯ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ;
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, ভব-কাণ্ডারী পরমেশ্বর ! কৈ ঘাট ? আর তো দেখা যায় না। ঘাট ছাড়িয়া অনেক দূর যে নৌকা আসিয়াছে। এখন তো ঝড় উঠিলে কিনারা লাগাইতে পারিবে না নৌকা।—আর যে বাড়ী যাইতে পারিব না। এ কি ! কোন দিকে কূল দেখা যায় না—আমি ভব-সাগর পার হইব, বলিয়াছিলাম—পার হইব বলিয়া উঠিলাম। মেঘ যে ঐ দিকে ; মেঘ উঠিলে না ঝড় হয় ? বল না নাবিক ? ঐ যে স্থির ছিল জল—নৌকাটা টল্‌ছে যে—ভয় করে যে। আমি গরিব কাঙ্গাল। বিশ্বাস তো ক'রেছিলাম, তা' না হ'লে তোমার নৌকায় উঠ্‌ব কেন ? স্থির সমুদ্র যখন ছিল, তখন তো নাবিককে বিরক্ত করি নাই। হে ঈশ্বর ! মেঘ দেখ্‌লে কি সেই বিশ্বাস থাকে ?—যদি জল উঠে এক দিকে, আর এই নৌকা ডোবে—তাই যদি একটা বড় নৌকায় উঠাতে ! একটা ভাঙ্গা ছোট নৌকাতে উঠালে—তুমি আর কখনও কি পার ক'রেছিলে লোকদিগকে ? ভব-কাণ্ডারী ! দেখ দেখি, সন্দিগ্ধ

মনের বেয়াদবী—ব'লে কি, আর কখনও কি তুমি পার ক'রেছ? সন্দেহ করে তোমাকে, দেখ দেখি বেয়াক্কেল লোকের ব্যবহার। অবিশ্বাসীগুলো বিপদের সময় তোমাকে সন্দেহ করে, তুমি যে গ্রাহ্য কর্‌ছ না—ও তাই ভক্তগুলি এ রকম ক'রে নৌকায় উঠে। হেঁগো, তুমি পাড়াগেঁয়ে মাঝি, না, সহরের মাঝি? তোমার হাতে কখনও নৌকা মারা প'ড়েছিল? কোন্ গ্রামে বাড়ী তোমার? তোমার নাম কি? তোমাকে সবাই চেনে? তুমি পার কর্‌তে পার্‌বে তো? না, তুমি সেই আনাড়ি মাঝিদের একজন? ওদিকে তুফান, তুমি হাল ধ'রে টান্‌ছ, আর অবিশ্বাসীগুলোকে বল্‌ছ—ওরে, তোদের যদি বিশ্বাস নাই, তবে আমার নৌকায় উঠ্‌লি কেন?—ঐ ঝগড়া বিবাদ—ঐ যে পালখানা উল্টে যায়, পাল ছিঁড়্‌ল বুঝি—ঐ ও দিক্‌কার দুখানা নৌকা ডুব্‌ল, ঐ মাঝিগুলো বড় আশা দিয়ে নিয়েছিল,—এই চোখের কাছে ডুব্‌ল—ঐ মানুষটা ডুব্‌ল। পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! ও মাঝি! বল, এ সময় অভয় দাও—চারিদিকে অন্ধকার—দিন না রাত্রি? পূর্ব্ব কোন্ দিক, পশ্চিম কোন্ দিক? কোন্ পথে যাব? উত্তর পূর্ব্ব এ অকূল সাগরে জান্‌তে পার্‌বে কেন? ঐ নৌকা ডুব্‌ল—ওযে বড় বড় নৌকা ডুবে যায়। ভব-কাণ্ডারী! এমন ক'রে ধমক দিলে—ঝড়ের সময়, বিপদের সময় ত্যক্ত কর্‌ছে—"তুই আমার নৌকায় উঠেছিস্, তোর ভয় কি?" এবার গেলাম, আর কারও সঙ্গে দেখা হ'বে না - ওরে সে সময় বাড়ীর লোকগুলো ব'লেছিল, সংসার ছেড়ে ধর্ম্ম কর্‌তে যাস্‌নে। দেখ দেখি, অবিশ্বাসীদের—মোদ্দা খুব বিপদ; তাই তুমিই হাল ধর, আর যিনিই হাল ধরুন না কেন, তুফান থামে না। থামিবে আবার কি! তুমি হাস্‌ছ, তুমি হেসে বল্‌ছ, আমিই ঝড় তুফান তুলে দিয়েছি, খুব আমাকে ধর্‌বে ব'লে। কোথায়

বা খবরের কাগজ, কোথায় বা তাস খেলা—তুফান দেখিয়া, 'ও মাঝি, ও মাঝি' বলিয়া তোমাকে ডাকে। বিপদের মেঘ তুফান—ভাল ভাল বাবু কোথায় গেল? এখন সকলেই কাঙ্গাল—এ সময়ে সব মুখ শুকিয়েছে—ঐ তোমার পায়ের কাছে যাচ্ছে--সবাই আস্‌ছে—এবার রক্ষা কর—এবার বুঝি ডুব্‌ল। এ কি ডোবা? এ সাগর, ডুব্‌লেই মর্‌ব? পিতঃ! একটু একটু ভয় দিও—বেশ মজা ক'রে যাচ্ছি, তা' নয় গো—ভয়ের সাগর, সংসারের ঢেউ, পাপের ঢেউ, নৌকাখানিকে এম্‌নি ধাক্কা মার্‌ছে, পাল, দড়া দড়ী ছিঁড়ে ছার খার ক'রে ফেল্‌লে। কেবল প্রাণটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কর্‌ছে। ভব-কাণ্ডারী ঈশ্বর "কি ভয়, কি ভয়, কি ভয়" এই বলিয়া সাহস দিতেছেন। প্রাণনাথ! আমাদের যে আর কেহই নাই। এমন সুশ্রী নাবিক তো আর দেখি নাই—ঐ নৌকার ছইয়ের ভিতর দিয়া যখন মুখের দিকে তাকাই, তখনই দেখি, ঐ মুখ স্থির, প্রশান্ত—অমন মুখ যখন, তুমি ঢের ঢের পাপীকে তরাইয়াছ—অবিশ্বাসীদের কথায় বেজার নও। আমাদের বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে, তোমার বুক করে না। গরিব কাঙ্গালগুলো তোমার নৌকায় উঠেছে—আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, ব'লে দাও এই কথাটা। আর কি ভয় সংসারে, কি ভয় বিপদে, সকাল বেলা সব পরিষ্কার হ'য়ে যা'বে। দুঃখ বিপদে যেন অবসন্ন না হই, বিপদকালে প্রাণসখা ব'লে ডেকে যেন তোমাকে খুব ভালবাসি।

(শান্তিবাচন)

হে দয়াময় ঈশ্বর! ভয় নাই যে বলে, সেই মরে, আবার খুব ভয় আছে যে বলে, সেও মরে। দুই জনই মরে। নির্ভয় মরে, অত্যন্ত ভীরুও মরে। তবে কে বাঁচে জান? ভক্ত বিশ্বাসী, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে হৃদয়ের মধ্যে তোমার চরণপদ্ম ধ্যান করে, সেই বাঁচে। বিপদকালে

যে তোমার চরণ ভাবে, সে বাঁচে। যারা মনে করে, একটু সাধন হইলেই বাঁচিব, তার সব গুষ্টিশুদ্ধ মরে। একবার আধবার কীর্ত্তন ক'রে যাই, তাতেই বাঁচিব, একটু ভক্তির সহিত ডেকে নি, ওরাও মরে যায়—আবার তারাও মরে, যারা বলে, "গলাজল ডুব্‌লাম, ঐ ভাইটী মর্‌ল, আমরাও মর্‌ব।" হ'ল কি? সাহসী ডুবে, ভীরু ডুবে, ভব-সাগরে ডুব্‌ল। যে বলে কি ভয়, সেও ডুব্‌ল, যে বলে ডুব্‌ল ডুব্‌ল, সেও ডুব্‌ল। পিতঃ! বিপদ মান্‌ব—কার না বিপদে বিপন্ন হ'তে হয়? কিন্তু বিপদে ডরাব না। মাঝি শক্ত—বিপদে বড় ভয় মান্‌ব, কিন্তু তুমি যে শক্ত মাঝি। যদি ডরাব, তবে তোমার নৌকায় চড়্‌লাম কেন? আর কি মাঝি ছিল না? বিদ্বান্, পণ্ডিত, ভক্ত কত ছিল। তোমার মুখ দেখে টলেছিলাম, ঘাটটা আলো ক'রে রেখেছিলে। ঐ তোমার মুখ দেখে সাহস ক'রে, ভাঙ্গা নৌকা—তাইতে উঠ্‌লাম। অন্য নৌকা ঢেউয়ের ভিতরে যায়, এ নৌকা ঢেউয়ের মাথায় যায়। বিপদ মান্‌ব, কিন্তু মর্‌ব না। চোখ দুটো বুজে তোমার শ্রীপদ ধ্যান কর্‌ব। ত্রাহি, বিপদকাণ্ডারী!—তার ভিতরে ধ্যান আরম্ভ ক'রে দিব। সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ডাক্‌ব—একটী তুড়ী দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ উড়িয়ে দিব। মাঝির উপর বিশ্বাস ক'রে বেঁচে যাব—নইলে এ বিপদে মর্‌ব। খুব বিশ্বাসের চোটে ঢেউ-গুলিকে ভয় কর্‌ব না—আমরা পাঁচজন ভাই নৌকার ভিতর ব'সে কেবল হরিনাম কর্‌ব, কেবল হৃদয়ের ভিতরে ঐ পাদপদ্ম ভাব্‌ব, ঐ সুধা খাব। মোদ্দা, মাঝির পা দুখানি বুকের ভিতর রাখ্‌ব। বড় ঝড় বিপদে তোমা ভিন্ন গতি নাই। তুমি কি নৌকা ডুবাবে? না, নৌকা ডুব্‌তে দেখে নিশ্চিন্ত হ'বে? আরও খুব সাধন ভজন করি। মনটা বিশ্বাসসাগরে ডুবে যাক্। ভবসাগরের কাণ্ডারী! এস, এ সব বিপন্ন যাত্রীদের মস্তকের উপর তোমার নির্ম্মল চরণ রাখ। ঘোর বিপদ্ বাহিরে,

শক্ত বিশ্বাস ভিতরে—শান্তভাবে তোমাকে ভালবাসা দিব, তোমার অমৃত বচন শুনিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া, সকল ভাহ ভগ্নী ম[illegible] তোমার নির্ম্মল, অভয় চরণে বার বার প্রণাম কার।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তের সর্ব্বস্বধন

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! দেখ, মানুষের সেবা করিতে গেলে কি হয়, আর তোমার সেবা করিতে গেলে কি হয়। দেখ, যারা ছোট মানুষ, তাদের সেবা করিলে কি হয়, আর তোমার সেবা করিলে কি হয়। যত তোমার সেবা করি, যত তোমাকে লইয়া পড়িয়া থাকি, তত ভাল হয়—এর পর হয় তো এমন অবস্থা আসিবে, যখন তোমাকে এক মিনিট ছাড়িলে প্রাণ-বিয়োগ হইবে। যতই তোমার কাছে আসি, ততই তুমি প্রাণ টানিতেছ। বন্ধুগুলি তো তেমন নয়। তাদের সেবা করিলে তো প্রাণ তেমন প্রসন্ন হয় না। তোমার রাজ্য এক রকম, পৃথিবীর রাজ্য আর এক রকম। যখনই তোমার কাছে আসি, তোমার চরণ বালিস করিয়া তাহাতে মস্তক রাখি, স্বর্গের আরাম পাই। তোমার আপনার ঘর বাড়ী সকলই ভক্তের জন্য রেখে দিয়েছ। তোমার চক্ষের পানে যত তাকাই, ততই তোমাকে আপনার মনে হয় ; আর ভাইদের চক্ষু দেখিলে তেমন হয় না কেন? তুমি এক রকম শাস্ত্র শেখাও, তারা আর এক রকম শাস্ত্র শেখায়। তুমি আপনার হ'লে, তারা কেন আপনার হয় না? দয়াময় ঈশ্বর! এ সব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? পুথিতে

পাওয়া যায় না। তোমার যেমন স্বভাব মধুর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণ সুশীতল হয়, ভাই ভগ্নীদের স্বভাব তো তেমন নয়; তবে শেষে তোমাকেই কি ভাই ভগ্নী বলিতে হইবে? শেষে ঘর বাড়ী সব কি তোমাকে নিয়ে কর্‌তে হ'বে? বাপ, মা, পরিত্রাতা হ'য়েছ, আবার এ নামগুলিও কি তোমাকে দিতে হ'বে? ভবিষ্যতে কি হ'বে জানি না; কিন্তু এখন বাহিরে ভাই ভগ্নী না পাইয়া, প্রাণ আকুল হ'লে তোমারই ভিতরে যায়, সুখ শান্তির জন্য তোমারই কাছে যেতে হয়। ভাই ভগ্নীদের সেবা করিতে পাঠাইয়াছ, তাঁহাদের সেবা করিতেছি; কিন্তু সুখ শান্তির জন্য তোমারই দিকে তাকাইয়া থাকিব। চৌদ্দ বৎসর * কেন, যতকাল বাঁচিব, নিরহঙ্কার, নিরভিমানী হইয়া ভাই ভগ্নীদের পদসেবা করিব; কিন্তু আমি তো অতকাল অপ্রসন্ন থাক্‌তে পার্‌ব না, ভাই পেলাম না, বন্ধু পেলাম না, এই দুঃখ তো অতকাল সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। সমুদয় আশা পূর্ণ কর্‌তে হ'বে, নতুবা কল্পতরু নাম ধর্‌লে কেন? আমি ভাই ভগ্নী চাই, বন্ধু চাই, আশ্রম চাই, বৈরাগীর এ সবই চাই। যতদিন এ সব না পাইব, ততদিন তুমি হও আমার ভাই ভগ্নী, তুমি হও আমার সংসার, তুমি হও আমার পরিবার, তুমি হও আমার সর্ব্বস্ব। তোমাতে সব সুখের আশা মেটাই। ভক্তের কাছে জওয়াব দেওয়া সহজ নয়। সেই বাইশ ঘণ্টার দিকেই যত বিপদ, এত বড় দিনটা প'ড়ে থাক্‌বে সংসারে?—তোমাকেই সংসার ক'রে বসি, বৈরাগীর সংসার তুমি হও। হে স্বর্গের দেবতা! কাছে এসেছ যদি, ভক্তদের সর্ব্বস্ব হও। বন্ধু পেলাম না কোথাও, তবে তুমি কেন বন্ধু হ'বে না? ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন

* বনবাসী লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর সীতার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন, মুখ দর্শন করেন নাই। বিনীতভাবে ভাই ভগ্নীদের পদসেবা না করিলে, তাঁহাদের দেবত্ব বুঝা যায় না।

তুমি, তা কি জান না? একটু যদি পৃথিবী অসুখ দেয়, ভক্ত তোমারই কাছে আসবে। কখন্ কোন্ ভক্ত তোমার কাছে কি চায়, তার ঠিকানা নাই। আপনি আপনাকে টাকা কর, কখনও আপনি আপনাকে ভাই কর, বন্ধু কর, বাপ, মা কর। চাই তোমাকে, আর যাহা দাও, তাই দিও। ঐ চরণতলে পড়িয়া যাহা চাহিব, তাহা পাইব, সকল ক্ষোভ নিবারণ করিব, নর নারীর সঙ্গে পবিত্র যোগ সাধন করিব, 'দয়াময়, দয়াময়' বলিয়া খুব বিনয়ী বৈরাগী হইয়া তোমার কাছে সকল আশা মিটাইব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জগতের জন্য প্রার্থনা

(ব্রহ্মমন্দির রাত্রিকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, পরিত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বর! এই ব্রহ্ম-মন্দিরের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি। মন সর্ব্বদা কাতর হয় না জগতের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু একটুকু ব্যাকুল হইয়াছে। কবে, তোমার পৃথিবী তোমার সুখে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া সুখী হইব? আমাদের পরিবার অতি ছোট। অতি অল্প উন্নতি হইল এই দেশে। তথাপি যে কয়টী ভাই ভগ্নী পাইয়াছি, তাহাতেই সুখী হইয়াছি। যদি কেহ যোগ না দিত, তবে এমন মনোহর সুন্দর দৃশ্য কোথায় দেখিতাম। এই যে দলে দলে ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, ইহা কি

সামান্য শোভা? কবে জগৎ টলমল করিবে তোমার দয়াময় নাম কীর্ত্তনে? এখনও যে পৃথিবীতে অনেক কুসংস্কার রহিল। করুণাসিন্ধো, পরমেশ্বর! তোমার দয়া সকলের উপরে, পৃথিবীর মুখ ম্লান থাকিবে না, কেন না তুমি মঙ্গলময়। তুমি চিরকাল অসত্যকে পৃথিবীতে থাকিতে দিবে না। যাবে দুঃখ শোক, পাপ তাপ সমুদয় বিলুপ্ত হ'বে। দীনদয়াল! তোমারই ইচ্ছাতে, তোমারই নামের গুণে পৃথিবীর দুর্দ্দশা ঘুচিবে, পৃথিবী স্বর্গধাম হ'বে। একটু শীঘ্র শীঘ্র হউক, এই আশীর্ব্বাদ কর। যেন শীঘ্রই প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মের অন্ন নাই, এমন স্থান যেন কোথাও না থাকে, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে পৃথিবী সত্যধাম, প্রেমধাম, পুণ্যধাম হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দোষস্বীকার

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই মাঘ, ১৮০১ শক; ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম। তোমার কাছে মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্যতে সাধুস্বভাব সুনির্ম্মলচরিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি ঘৃণিত, ইহা যেন কথায় না বলি। ভবিষ্যতে যেন যথার্থ সাধু হই। এই হস্তদ্বয় যেন সত্যের, দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হৃদয়ের ভিতরে বিবেকের সিংহাসনতলে যেন সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে, সর্ব্বদা যেন পবিত্রতার

সূর্য্য উজ্জ্বল থাকে; প্রত্যেক ব্রাহ্মকে শুদ্ধচরিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ পুণ্য দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতরে আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা। ব্রহ্মতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতরে সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক। প্রাণকে সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র কর, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বসিয়া হুঙ্কার কর। তোমার বিজয়ভেরী শুনিয়া শত্রুকুল পলায়ন করুক। পাপের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিমুক্ত হউন। যেমন এক একটি করিয়া কাঁটা বাহির করে, তেমনি পাপ-কাঁটা-গুলি এক একটা করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, শরীর, মন, রসনা সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার অগ্নি মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার সমুদায় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার দিন। মা, পুণ্য দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাহ্মসমাজ পুণ্য চাহিতেছে। শিশুর মত, নির্ম্মলচিত্ত বালক বালিকার মত কর; প্রবঞ্চনা কি, জানিব না, সরলভাবে ব্রহ্মপদাশ্রিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আমাদিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্মচিন্তা করিতে দাও, তব প্রসাদে যেন নির্ম্মল হই, তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হইয়াছ কি না? মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না?

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিত্র নয়নে তোমার কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি তাকাইয়াছ কি না? তুমি ঈশ্বরসমক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

হে আত্মন্, তুমি কোন ভাই ভগ্নীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, শ্রীভ্রষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কি না? তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোমার কোন ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়াছ কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে, তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কখন অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, স্মরণ করিয়া দেখ। দোষ স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ভক্তিবিহীন হইয়া শুষ্ক পূজা, শুষ্ক আরাধনা করিয়াছ কি না? ঈশ্বরের কাছে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা ভাবিয়া দেখ।

হে আত্মন্, তুমি স্বর্গীয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ কি না? যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জঘন্য অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের অপমান করিয়াছ কি না? তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন প্রকার অনাদর করিয়াছ কি না? স্মরণ কর।

হে আত্মন্, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপযুক্ত বল, বুদ্ধি পরিশ্রম, অর্থনিয়োগ করিতে কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া, আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না? ধর্ম্মের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়াছ কি না? যদি না করিয়া থাক, নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর।

হে ধর্ম্মপ্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন বস্ত্র পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট অন্ন জল পাইয়াছ, যাহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সাধ্যানুসারে সেই পরিমাণে যত্নবান্ হইয়াছ কি না? যদি অনেক খাইয়া থাক, অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নাম-প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া থাক, যদি কেবল আপনার সুখসম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদি ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে আপনাদিগকে ঘোর অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর। ব্রহ্মের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

হে দয়াসিন্ধো, তোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, আমাদিগকে দণ্ড দাও ; হে স্নেহময়ী জননি, তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধচরিত্র কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শুভবুদ্ধি

(মঙ্গলবাড়ী, আর্য্যনারীসমাজ, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০খৃঃ)

হে রাজাধিরাজ হরি, আকাশে তুমি প্রেমকমলের উপর বসিয়া পৃথিবীর পানে তাকাইয়া রহিয়াছ। দেখ, আজ তোমার কন্যাগণ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তোমার বিনীত দাস তোমার শ্রীচরণতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তোমার দাসের মনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, এবং দাসের শরীরকে স্পর্শ কর, এই দাসের রসনা যেন তোমার সত্য রচনা করে, তাহার চক্ষু যেন তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়! তোমার দাস যেন তোমার অমৃতময় কথা শুনাইয়া, তোমার কন্যাগণের কল্যাণ সাধন করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। হে হরি, তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার প্রাণের বল ; আমি একান্তমনে তোমার উপর নির্ভর করিয়া, তোমার সমাগত কন্যাদিগের সেবা করি। হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দাসের মনোরঞ্জন কর, তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অখণ্ড ঈশ্বর

(বিডন্ পার্ক, বুধবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

আহা! হরি, তুমি দুর্ব্বল মনুষ্যের হাতে পড়িয়া এরূপ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িলে? তোমাকে শাক্ত, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মীরা চারি ভাগে বিভক্ত করিল। শাক্ত বলে তুমি শক্তি, ভক্ত বলে তুমি প্রীতি, জ্ঞানী বলে তুমি জ্ঞান, কর্ম্মী বলে তুমি কেবল কর্ম্মেতেই তুষ্ট। কিন্তু তুমি যে, হরি, এ সমুদয় গুণের আধার ; অতএব আমি তোমার এই সমুদয় সাধক-দিগকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি।

এস, ব্রহ্ম, ভারতের পুরাতন পরব্রহ্ম, আমাদিগের হৃদয়ে এস। তুমি ভক্তবৎসল, পতিতপাবন। আমরা পতিত, আমাদিগকে তুমি উদ্ধার কর। তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা, তুমি গুরু, তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমি ত্রাতা, তুমি বন্ধু, তুমি শান্তিদাতা, তুমি আমাদিগের সর্ব্বস্ব। তুমি পিতা মাতা হইতে প্রিয়, তুমি পুত্র হইতে প্রিয়, তুমি বিত্ত হইতে প্রিয়। তুমি সৎ, তুমি চিৎ, তুমি আনন্দ। তুমি সেই ঋষিদিগের করতলন্যস্ত আমলকবৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তোমাকে বিশ্বাসচক্ষে দেখি এবং ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠান *

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, বুধবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৮০২ শক ;
২০শে অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মনুষ্যকুলের জননি, শুভবিবাহ তুমি কৃপা করিয়া সম্পূর্ণ কর। তুমি এই দুই জনকে পবিত্রতার পথে, কল্যাণের পথে নিয়ত রক্ষা কর। দুই জন ছেলে মানুষ, সংসার কি, ইঁহারা জানেন না। কিরূপে সংসার

---

* কুচবিহারবিবাহের পরিণামানুষ্ঠান কিরূপে সম্পন্ন হয়, ১৮০২ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"গত ৫ই কার্ত্তিক (১৮০২ শক) (২০শে অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ) বুধবার এই পরিণয়ের পরিণামানুষ্ঠান ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বন্ধুবর্গসমক্ষে সম্পাদিত হয়। আত্মীয় মহিলাগণ ব্যতীত কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষিণী ইউরোপীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হইলে, আচার্য্যমহাশয় বলিলেন :—

'প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ্চ উপস্থিত নরনারীর বিবাহের সূত্রপাত হয়। সেই বিবাহ এবং তদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির জন্য আমরা এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি।

'ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং পরিচালিত করুন।'

"আচার্য্যের সম্মুখে উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, উভয়ের দক্ষিণ হস্ত শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধ হইল। উভয়ে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন :—

'আমি তোমাকে বিবাহিত পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে

চালাইতে হয়, তুমি শিক্ষা দাও। ইঁহারা পরস্পরকে ভালবাসিবেন

ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব ; এতদ্দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

'আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব; এতদ্দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

"হীরকাঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজা মহারাণীর অঙ্গুলীতে পরিধান করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন :—

'আমার প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয় তোমাকে অর্পণ করিতেছি, এবং এতৎসহকারে আমার পার্থিব সমুদায় সম্পত্তির তোমাকে অধিকারিণী করিতেছি। পবিত্র করুণাময় ঈশ্বর ধন্য হউন।'

"আচার্য্য তখন নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন :—

'করুণাময় ঈশ্বর, এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর এবং এমন করুণা বিধান কর যে, ইঁহারা সুখে এবং বিশ্বস্ততা সহকারে পতিপত্নীরূপে তোমার সেবায় একত্র বাস করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর, বিশ্বাস, প্রেম এবং ধর্ম্ম ইঁহাদিগকে অর্পণ কর এবং ইঁহাদিগের গৃহ শান্তি ও কুশলের নিকেতন কর।'

"অনন্তর এই বিশেষ প্রার্থনা হয়। (প্রার্থনাটী এই পুস্তকের ১৫৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

"সঙ্গীতানন্তর আচার্য্য এইরূপ আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন :—

'ঈশ্বর আমাদিগকে বর্দ্ধিত বিশ্বাস এবং হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দ সহকারে বিদায় দিন।'

(সকলে মিলিত হইয়া) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

বলিয়া একত্রিত হইলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া ইঁহারা প্রজাপালন করুন। রাজার বুদ্ধি, রাণীর বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে আসিবে। তুমি যদি বন্ধু হইয়া, পিতা হইয়া ইঁহাদের কাছে থাক, অতি বিস্তীর্ণ কুচবিহাররাজ্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে। হে প্রেমময়ি, একটী কথা শ্রবণ কর। আমার কন্যাকে তোমার প্রসাদে এত দিন লালন পালন করিলাম, তোমার প্রসাদে এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইঁহাদিগের যখন বিবাহের সূত্রপাত হয়, আমরা ইঁহাকে পিতৃভবনে রক্ষা করি; আজ ইনি এখানে উপস্থিত হইয়া আপন স্বামীর নিকটে যাইতেছেন। জামাতাকে বুঝাইয়া দাও, রাজাকে বুঝাইয়া দাও, আমার হাত হইতে এই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইঁহার দ্বারা তিনি উপকৃত হইবেন। মহারাজ মহারাণীর উপকার করিবেন, মহারাণী মহারাজের উপকার করিবেন, এইরূপে উভয়ে উভয়ের কল্যাণ বর্দ্ধন করিবেন। পুরুষের সাহস, দৃঢ়তা, সত্য, বিশ্বাস পতি পত্নীকে শিখাইবেন; স্ত্রীর বিনয়, লজ্জা, ভক্তি, ক্ষমা পত্নী স্বামীকে শিখাইবেন। স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া সুখে বাস করুন; তাহা হইলে আমার মন আহ্লাদিত হইবে, আমার বন্ধুদিগেরও আহ্লাদ হইবে। অতএব, হে মা, এই দুইটীকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও। মঙ্গলময়ি, স্নেহময়ি, মা লক্ষ্মি, এখানে দাঁড়াও। আপন আপন সংসার মধ্যে তোমাকে দেখিব, তোমাকে মাতা বলিব, এই আশার সহিত, ভক্তি বিশ্বাসের সহিত, সকলে বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সমস্ত কিনিয়া লও *

(মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ, শনিবার, ১১ই পৌষ, ১৮০২ শক ;
২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

সর্ব্বনাশ করিলে, হরি ! আমাদের দোকানদারী ফুরাইল। প্রাতঃ-কালে বাসয়াছিলাম দোকান সাজাইয়া ; কত বিদ্যা লইয়া, কত পুস্তক লইয়া, কত গান লইয়া, কত কীর্ত্তি লইয়া বসিলাম। মনে করিয়াছিলাম,' এই সকল বিক্রয় করিব। ধর্ম্মপ্রচারক আমি, সাধক আমি, কত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছি। এই সকল দিয়া পরিত্রাণ কিনিব, পরিবারকে খাওয়াইব। কিন্তু আমার সকল অভিলাষ বিদায় লইল। হরি, কি করিলে, সমস্ত কিনিয়া লইলে ? তবে সমুদয় ধর, স্ত্রী পুত্র ধর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রাতঃকাল †

হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার প্রসাদে গত রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিয়া, আমি এই নব দিবসে প্রবেশ করিলাম। আমাকে অদ্য কৃপা করিয়া তুমি পাপ-চিন্তা, পাপ-কথা ও পাপ কার্য্য হইতে রক্ষা কর, এবং এমত বল দাও, যেন আমি তোমার দাস হইয়া, তোমার কার্য্যে সমস্ত দিন কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকি।

---

* আচার্য্যের উপদেশ, ১০ম, "ক্রয় বিক্রয়" উপদেশের মধ্যে এই প্রার্থনা দ্রষ্টব্য।

† "সামাজিক ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা" (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮০৯ শকে প্রকাশিত) হইতে এই প্রার্থনা ও পরবর্ত্তী প্রার্থনাগুলি গৃহীত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের Theistic Annualএ (p 48) এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে—"সামাজিক ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, ১৭৯৪ শকাব্দ (১৮৭২ খৃঃ)। এই প্রার্থনাগুলির অধিকাংশ ইংরেজী আকারে ব্রহ্মানন্দ-রচিত Theist's Prayer Book পুস্তিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

সায়ংকাল

হে দয়াময় ঈশ্বর, অদ্য তুমি আমাকে নানা প্রকার রোগ, বিপদ ও পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ এবং অন্ন বস্ত্র ও জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমি অদ্য যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং দিন দিন আমাকে পুণ্যের পথে অগ্রসর কর।

পরিবার

হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমরা সপরিবারে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাও, আমরা তোমার পূজা করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমরা তোমারই পুত্র কন্যা, তোমারই দাস দাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া, আমাদের সংসারকে ধর্ম্মের সংসার কর। আমরা যেন তোমাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করি এবং সদ্ভাবের সহিত পরস্পরের সেবা করি। পিতঃ, তুমি আমাদিগকে ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কর এবং আমাদের সমুদায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপযুক্ত সন্তান হইয়া, আমরা এই পরিবার মধ্যে সর্ব্বদা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করি।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

কেহই আমাকে আশ্রয় দিল না, যাহার ঘরে গেলাম, সেই তাড়াইয়া দিল। হে ঈশ্বর, তুমি নাকি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাই এখন তোমার

কাছে আসিয়াছি। আমাকে দীন পাপী বলিয়া তুমিও কি দূর করিয়া দিবে? না, তাহা সম্ভব নহে। তোমার পথে লোকের পদচিহ্ন দ্বারা দেখিতেছি যে, যাহারা তোমার কাছে গিয়াছে, তন্মধ্যে কেহই ফেরে নাই। এ ভিখারীকে আশ্রয় দাও।

উভয় দিকে অশান্তি

জগদীশ, বুঝি, আমার দুই কূল গেল। আমি সংসারে সুখ না পাইয়া, ধর্ম্মেতে সুখী হইব, আশা করিয়াছিলাম; এখন ধর্ম্মসুখে বঞ্চিত হইয়া, আবার সংসারের উপাসনা করিতেছি। কিছুতেই সুখী হইলাম না; না ধন জন যৌবনে, না তোমার পূজা মননে। এ অবস্থায় আমি তোমার শরণাগত হইলাম। হে করুণাময়, আমাকে ধর্ম্মেতে সুখী কর।

ঈশ্বর সর্ব্বস্ব

আমার পিতা নাই, মাতা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র কন্যা নাই, ভাই ভগিনী নাই। আমার ন্যায় অবান্ধব নিরাশ্রয়ের সহায় আর কে হইবে? আমার যদি ত্রিসংসারে কেহ থাকিত, আমি তাহার মুখপানে তাকাইয়া এক প্রকার স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতাম। কিন্তু যাহার কেহ নাই, সে তোমার পদতলে না পড়িয়া আর কোথায় যাইবে? নাথ, তুমিই আমার সংসার, আমার পিতা মাতা, ভাই বন্ধু সকলই তুমি। তোমাকে যেন কখন না ভুলি।

বিচারপতি

হে রাজাধিরাজ, তোমার রাজ্যের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আমি অপরাধী হইয়াছি। দেখ, তোমার অবাধ্য বিদ্রোহী প্রজা তোমার বিচারসিংহাসনের সমক্ষে বিনীত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ, আমি ভয়ে কাঁপিতেছি, আমার পাপের সীমা নাই; এমন কোন পাপ নাই, যাহা অন্তরে করি নাই; দেখ, আমার অস্থি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গিয়াছে। হে বিচারপতি, তুমি আমাকে ভয়ানক দণ্ড দিবে, আমি জানি; কিন্তু, পিতঃ, দুঃখী সন্তানকে পরিত্রাণ কর।

গূঢ় পাপব্যাধি

হে আত্মার চিকিৎসক, অন্তরের গূঢ় পাপ কিসে যাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দাও, আর অন্তর্দাহ সহিতে পারি না। আমি কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ভিতরের সেই পুরাতন রোগ গেল না। তোমার প্রসাদে বাহিরের কার্য্য ও কথা অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু অসাধু চিন্তা ও পাপ কামনা যে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা একবার হৃদয়কে খণ্ড খণ্ড কর, এবং উপযুক্ত ঔষধ বিধান করিয়া, আমার সকল ব্যাধি প্রতীকার কর।

ঈশ্বর জীবন

মৎস্য জলে না থাকিলে কিরূপে বাঁচিবে? মৎস্যের পক্ষে জল যেমন, হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তুমি তেমনি, আমি তোমা ভিন্ন বাঁচি না। আমি যখনই তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে যাই, তখনই কষ্ট যন্ত্রণায় জ্বলিয়া

মরি। তোমা ছাড়া হইলে আমার চক্ষু অন্ধ হয়, আমার বুদ্ধি মূর্খ হয়, আমার উৎসাহ উদ্যম অবসন্ন হইয়া যায়। তখন ধনেও সুখ পাই না, সংসারেও সুখ পাই না, শরীর মন নির্জীব হইয়া পড়ে। হে প্রাণ, আমাকে তোমাতে চিরজীবী কর।

এক প্রভু

আমি পাঁচ জন প্রভুর দাস হইয়া মারা যাই। কখন ধন, কখন মান, কখন পিতা মাতা, কখন ভার্য্যা, কখন পুত্র কন্যা, কখন স্বদেশের সেবা করিতে যাই। মন সদা বিক্ষিপ্ত, হৃদয়ের প্রীতি অনুরাগ নানা বিষয়ে বিভক্ত। কোন প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হইল না, আমিও কাহারও সেবাতে সুখী হইলাম না। আমি এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, একমনে কেবল তোমার পদসেবা করিলে শান্তি পাইব। প্রভো, আমাকে তোমারই কর।

জগতের সৌন্দর্য্য

তুমি যদি মানুষকে খুব ভাল না বাসিতে, তবে জগৎকে এত সুন্দর করিলে কেন? কেবল যাহা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা সৃজন করিলেই তোমার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ হইত। কিন্তু যখন তুমি আকাশকে চন্দ্রতারকে সুশোভিত করিয়াছ এবং পৃথিবীকে নানাবিধ ফুল ফল লতা পল্লবে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, তখন যে তুমি আমাদিগকে নিতান্ত সুখী করিবে, মনে করিয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে সৌন্দর্য্যের আকর, এইটী স্মরণ করিয়া, আমি যেন তোমার প্রতি সদা কৃতজ্ঞ থাকি।

পুষ্প

হে দেব, একটী পুষ্প হাতে করিলে কেমন এক অপূর্ব্ব পবিত্র ও প্রফুল্ল ভাব অন্তরে সঞ্চারিত হয়। ফুল দেখিলেই তোমাকে স্মরণ হয়। ইহার লাবণ্যে তোমার সৌন্দর্য্য, ইহার কোমলতায় তোমার সুকোমল ভাব। তোমার প্রেমের এমন সুন্দর মনোহর নিদর্শন আর কোথাও নাই। হে প্রিয়তম, তুমি এমন সুন্দর কুসুমের রচয়িতা, আমি তোমাকে ভক্তিকুসুমে অর্চ্চিব।

আকাশ

আকাশ দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। কি উচ্চ! কি প্রশস্ত! কোথায় বা আদি, কোথায় বা অন্ত! হে অনন্ত, তুমি এই অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত, কোন দিকে তোমার শেষ দেখি না। তবে আমার ক্ষুদ্র মনের সাধ্য কি যে তোমাকে ধারণ করে। চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার তুলনায় বালুকণা হইতেও ক্ষুদ্র, তাঁহার কাছে আমি কে? তুমি এত বড়, আমি তৃণ অপেক্ষা অপদার্থ, তোমার মহিমাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।

ব্রহ্মানুরাগ

হে অনন্ত প্রীতি, আমার ইচ্ছা হয়, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। তুমি আমাকে যেরূপ প্রীতি কর, এমন আর কেহ করে না; আমার সুখের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য তুমি যেমন ব্যস্ত, এমন আর কেহই নহে। আমি তোমার কাছে থাকিলে যেমন সুখ পাই, এমন আর কোথাও

হয় না। এই জন্য, গুণনিধি, ইচ্ছা হয়, তোমার কাছে দিবারাত্রি পড়িয়া থাকি, এবং তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া হৃদয় জুড়াই। হে নাথ, এই ইচ্ছা পূর্ণ কর।

সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা

আমি তোমা ভিন্ন কাহাকেও গুরু বলি না। অমৃতের দিকে তোমা ভিন্ন আর নেতা নাই। আমি মনুষ্যকে কখন পরিত্রাণের গুরু বলিব না। কিন্তু তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার সাধু সন্তানদিগকে যেন সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দিতে পারি। যিনি ধর্ম্মের একটী অক্ষর শিখাইয়াছেন, যাঁহার দৃষ্টান্তে এক বিন্দু সাধুতা পাইয়াছি, তাঁহাকে যেন পরিত্রাণের সহায় জানিয়া, তাঁহার অমূল্য বন্ধুতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ হই।

ব্রহ্মানন্দ

আমার নয়নের আনন্দধারা কিছুতেই থামিতেছে না। হে প্রেমময়, তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার মুখের সুমিষ্ট কথা শুনিয়া, তোমার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া কত যে সুখ শান্তি আজ অনুভব করিলাম, তাহা আর কি বলিব? আমার অন্তরে আজ শত শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আমার নয়ন তোমার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, আর কোন দিকে ফিরিতেছে না। এই আশীর্ব্বাদ কর, সুখসিন্ধো, যেন চির দিন এইরূপ সুখ ভোগ করি।

পক্ষী

হে বিশ্বপতি, চারিদিকে পাখীরা কেমন রব করিতেছে। পাখীর সুমধুর স্বরে তোমারই স্তব স্তুতি শুনিতেছি। আহা! কেমন সরলভাবে ও সুমিষ্টস্বরে তাহারা তোমার গুণ গাইতেছে! নাথ, আমি কবে ঐরূপে আকাশবিহারীদের ন্যায় তোমার নাম দেশে দেশে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। আর তাহারা যেমন কাল কি খাইব, না ভাবিয়া প্রফুল্ল অন্তরে কেবলই গান করিয়া বেড়ায়, আমি যেন একান্তমনে সেইরূপ তোমার উপর নির্ভর করিয়া, তোমার সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকি।

ঈশ্বর সুলভ

লোকে তোমাকে দুর্ল্লভ বলে, কিন্তু ভক্তের নিকট তোমার পাদপদ্ম সুলভ, তিনি প্রেমভরে ডাকিলেই তুমি কাছে আসিয়া উপস্থিত হও। আমার ইচ্ছা হয়, হে ঈশ্বর, তুমি আমার পক্ষেও তেমনি সুলভ হও। আর বহুকাল কষ্টের সাধন সহ্য করিতে পারি না। তুমি আমাকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর, সহজে তোমাকে পাইয়া প্রাণ জুড়াইব।

নামাবলী

কি আশ্চর্য্য, দেব, আমি আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার পবিত্র নামাবলী অঙ্কিত দেখিতেছি। এ শরীর তোমার মন্দির, ইহার প্রত্যেক অস্থিতে তুমি বাস করিতেছ, ইহার প্রত্যেক শক্তির তুমি মূলাধার। তুমিই চক্ষুকে দেখাইতেছ, কর্ণকে তুমিই শুনাইতেছ; আমার প্রাণের প্রাণ তুমি। যে চর্ম্মে আমার দেহকে আবৃত করিয়াছ, উহাতে স্বহস্তে তুমি

তোমার দয়াল নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছ। এমন শরীরে, হে ঈশ্বর, যেন তোমাকে সদা দেখিতে পাই।

বারম্বার পতন

বার বার আমি পাপে পড়িতেছি, জগদীশ, ত্বরায় এ রোগের ঔষধ বিধান কর। তুমি কত বার কৃপা করিয়া আমাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উঠাইয়া এবং আমার শরীর মনকে তোমার পুণ্যজলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়াছ; কিন্তু আবার নিজ দোষে আমি বারম্বার সেই পঙ্কে ডুবিয়াছি। আর যেন, দীননাথ, এ দুর্ব্বলের পতন না হয়, তুমি এমন সামর্থ্য প্রদান কর।

অধৈর্য্য

পিতঃ, আমার মন বড় অধীর। সামান্য মনে করিয়া এ দোষের প্রতি কত উপেক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা দ্বারা আমার মহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি একটু বিপদে পড়িলেই অমনি অস্থির হইয়া নিরাশ হই, এবং সমুদায় ধর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করি। কত সময় আমার বিশ্বাস পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। কাতর অন্তরে তাই মিনতি করি, আমাকে অধৈর্য্য হইতে বাঁচাও।

অহঙ্কার

অহঙ্কার আমার সর্ব্বনাশ করিল। পতিতপাবন, আমাকে বিনয় শিক্ষা দাও, আর যেন অহঙ্কারের পথে গিয়া না মরি। আমি যেন

নিজের বিদ্যা বুদ্ধি মান ও পরাক্রমের উপর নির্ভর না করিয়া, আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমি সকলের পদধূলি হইয়া, প্রণত-মস্তকে চিরদিন যেন পদসেবায় নিযুক্ত থাকি।

প্রত্যাদেশ

হে অনন্ত দেব, পুরাকালে তুমি যেমন ভক্তদিগের সঙ্গে কথা কহিতে, গুরু হইয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে, এবং প্রভু হইয়া আদেশ করিতে, আমার প্রতিও সেইরূপ কৃপা বিধান কর। আমি আর লোকের বিভিন্ন মত এবং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মন্ত্রণা শুনিতে পারি না। সকলে নিস্তব্ধ হউক, হে সদ্‌গুরু, তুমিই কেবল অন্তরে কথা কও, আমি শুনি ও পালন করি।

দয়ার প্রতি বিশ্বাস

হে দয়াময়, তোমার প্রেমে আমি যেন কখন অবিশ্বাস না করি। দুঃখ বিপদে তোমার মঙ্গল হস্ত যেন আমার নিকটে প্রচ্ছন্ন না থাকে। তুমি যেমন সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া সন্তানদিগকে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও, সেইরূপ বিঘ্ন কষ্ট প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিনয় ও বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। তবে কেন আমি সঙ্কটে পড়িলে তোমার দয়ার প্রতি সন্দেহ করিব? হে পিতঃ, আমি যেন সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতে তোমারই অনুগত থাকি।

ঈশ্বর জননী

জননি, সংসারবনের মধ্যে আমাকে তোমার অঞ্চল ধরিতে দাও, আমার বড় ভয় হইতেছে। কত শত্রু চারি দিকে, অন্তরেও কত রিপু আমাকে বধ করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। আমি অতি দুর্ব্বল, তাহাদের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার কিছুমাত্র ক্ষমতা আমার নাই। নিরাশ্রয় অসহায় শিশুর ন্যায়, মা, তোমাকে ডাকিতেছি, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

পূজা ও সেবা

হে জগদীশ, আমার কেন এরূপ দুর্দ্দশা হইল? তোমার উপাসনায় মত্ত হইলে আমি তোমার কার্য্যের প্রতি নিরুৎসাহ ও উদাসীন হই, আবার তোমার কার্য্যে মত্ত হইলে উপাসনাতে তাদৃশ অনুরাগ থাকে না। এ রোগ হইতে দয়া করিয়া আমাকে মুক্ত কর। ভক্ত হইয়া যেমন তোমার পূজাতে আনন্দিত হইব, তেমনি যেন অনুগত ভৃত্য হইয়া তোমার আদিষ্ট কার্য্য-সাধনে সদা উৎসাহ-অগ্নিতে উদ্দীপ্ত থাকি। চক্ষে তোমার প্রেমমুখ দেখিব, হস্তে তোমার সুন্দর পদ নিয়ত সেবা করিব।

ঈশ্বর চিরসুন্দর

হৃদয়নাথ, আমার কাছে তুমি কখন পুরাতন হইও না। কত লোক, "অনেক দিন ব্রাহ্ম হইয়াছি, আর ধর্ম্মসাধন ভাল লাগে না" এইরূপ মনে করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পিতঃ, আমায় যেন সে বিপদে পড়িতে না হয়। পিতা মাতা কি কখন পুরাতন বলিয়া পুত্রের

বিরাগভাজন হইতে পারেন? যতই তোমার দয়া দেখিতেছি, ততই যেন তোমাকে ভালবাসি। তুমি চিরসুন্দর, তোমার সহবাসে নিত্য শান্তি। আমাকে তুমি চিরপ্রেমিক কর।

পরীক্ষা

হে অভয়দাতা, এ ঘোর পরীক্ষার সময় তুমি কোথায় রহিলে? পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলে আমাকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির পথ বন্ধ হইল। তোমার সত্য স্বীকার ও পালন করিতে গিয়া, আমি লোকসমাজে ঘৃণিত ও নির্দ্দয়রূপে উৎপীড়িত হইলাম। দেখ, এ সময়ে লোভে কিংবা ভয়ে যেন সত্যের পতাকা না ছাড়ি। তোমার জন্য যদি সর্ব্বত্যাগী ভিখারী হইতে হয়, তথাপি যেন কুণ্ঠিত না হই। হে দেব, এই মিনতি করি, যদি সত্যের জন্য মরিতে হয়, যেন আমার রক্তে তোমার পদ প্রক্ষালন করিয়া আনন্দে দেহ ত্যাগ করি।

ধর্ম্ম ও সংসার

তোমার মন্দিরে যখন পূজা করি, তখন আত্মা কেমন স্বর্গীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় যখন সংসারে প্রবেশ করি, তখন সে ভাব আর থাকে না। আবার পুরাতন বিষয়াসক্তি, অবিশ্বাস, জড়তা আসিয়া আমাকে অধিকার করে। কবে সেই দিন হইবে, যে দিন সংসারমধ্যেও তোমার পবিত্র আবির্ভাব দেখিয়া পুণ্যবান্ হইব, যখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখে তোমাকে দেখিব এবং ধনসম্পদে তোমাকে লাভ করিব।

অন্ধকার রজনী

এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে চারি দিক্ কেমন গম্ভীর ও নিস্তব্ধ। একটি জীবও দেখা যাইতেছে না, কাহারও স্বর শুনা যাইতেছে না। এই নির্জ্জন ও নিঃশব্দ স্থানে কেবল তুমি আছ, আর আমি আছি। হে ভূমা মহান্, এ অন্ধকারমধ্যে তুমি বসিয়া আছ, আমার হৃদয় তোমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। তুমি যেমন জ্যোতিতে আছ, সেইরূপ তুমি অন্ধকারে বাস কর। তোমাকে একাকী পাইয়া আমার মনের গুপ্ত পাপ স্বীকার করিতেছি, এবং গুপ্ত প্রেম দান করিতেছি ; ঐ পাপ তুমি দূর কর, ঐ প্রেম তুমি গ্রহণ কর।

স্বার্থপর ধর্ম্ম

আমি একাকী ধর্ম্মসাধন করিয়া স্বর্গে যাইব, তুমি এরূপ বিশ্বাস করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছ। তোমার স্বর্গীয় ধর্ম্মে এই শিখিয়াছি যে, সকলে মিলিয়া ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে একটি বিশুদ্ধ পরিবারে সম্বদ্ধ হইতে হইবে, এবং তোমার নাম গান ও পদসেবা করিয়া সকলে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পিতঃ, তোমার প্রেমামৃত পান করিলে, ভ্রাতা ভগিনীকে উহা পান করাইতেই হইবে। ব্রহ্মধন পাইয়া, অপরকে উহা বিতরণ না করিয়া, কে ক্ষান্ত থাকিতে পারে ? আমার ধর্ম্ম যেন স্বার্থপর না হয়। হে জগৎপিতঃ, আমার হৃদয়ে এমনি করিয়া তোমার সমস্ত পরিবারকে গাঁথিয়া দেও, যেন আমার মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও মঙ্গল চেষ্টা করি।

অনন্ত উন্নতি

কয়েক বৎসর উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে তোমার ধর্ম্ম সাধন করিয়া, আমি কেন, হে ঈশ্বর, নিরাশা ও আলস্যসাগরে নিমগ্ন হইলাম! এখন মনে হইতেছে, যেন আমার উন্নতির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এবং এ জীবনে আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। কেন আমার এরূপ হইল? আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন যে আমায় অগ্রসর হইতে হইবে, পরলোকে গিয়াও অনন্ত উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব প্রার্থনা করি, আমাকে চির উৎসাহী ও আশান্বিত কর। যাহা করিয়াছি, যাহা পাইয়াছি, তাহা সামান্য মনে করিয়া, দিন দিন যেন অধিকতর সাধুতা, প্রেম ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি। হে নাথ, আমার যৌবনকে কখন বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতে দিও না, আমার জীবন শীর্ণ না হইয়া যেন চিরবসন্ত সম্ভোগ করে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়

হে পরম গুরো, আমরা তোমার ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ে সমাগত হইয়াছি, সহায় হইয়া এই উচ্চব্রতসাধনে আমাদিগকে সমর্থ কর। এক দিকে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা, অপর দিকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা, এ উভয়বিধ ভ্রম হইতে আমাদিগকে তুমি দূরে রাখ এবং সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত কর। সেই সঙ্গে, হে দয়াময়! আমাদের হৃদয়কেও তোমার প্রেমে বিগলিত কর এবং শুষ্কতা ও অসদ্ভাব পরিহার কর। প্রভো, আমাদের সমুদায় বল ও উদ্যম তোমার বশীভূত হউক এবং তোমার অদিষ্ট সাধু কার্য্য সকল সমাধা করুক। আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার শিষ্য কর।

জীবনের লক্ষ্য

হে জ্ঞানদাতা, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দাও। আমি উপাসনা করি, সংসারের বিবিধ কার্য্য করি, এবং সময়ে সময়ে পরহিত সাধন করি; কিন্তু আমার লক্ষ্য স্থির নাই। তোমার রাজ্যে আমার বিশেষ কি কার্য্য, তাহা জানি না, সকল সময় ভাবিও না। এ জন্য আমার দ্বারা তোমার জগতের কোন বিশেষ ইষ্ট সাধন হইতেছে না, আমারও প্রকৃত উন্নতি ও শান্তি হইতেছে না। হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, কোন্ পথে চলিব, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিব, বলিয়া দেও, আর লক্ষ্যবিহীন থাকিতে দিও না।

অবিশ্বাসী মনের কল্পনা

কি আশ্চর্য্য, জগদীশ, যখন আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হই, তখন মনে করি, তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকি, কিন্তু মনে করি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে। আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, বোধ হয়, যেন তুমি আমাকে আর ভালবাস না। আমার এ কি ভয়ানক রোগ হইল! আমি নিজের কলঙ্কিত চক্ষে তোমাকে দেখিয়া, তোমার প্রতি দোষারোপ করি। পিতঃ, কৃপা করিয়া আমাকে এ রোগ হইতে রক্ষা কর।

বিদেশে যাত্রা

হে ঈশ্বর! আমি বিদেশে যাত্রা করিতেছি, এ সময়ে তোমাকে স্মরণ না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। কত কষ্ট বিপদ, কত

পাপ প্রলোভন পথে এবং গম্যস্থানে আমাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। দেখ, নাথ, যেন তোমার সন্তান সেই দূর দেশে তোমাকে না ভুলিয়া যায়। তোমার ঘর সর্ব্বত্র. আমি যেন সকল স্থানে তোমার কাছে থাকি।

আহারের পূর্ব্বে

হে দয়াময় পিতঃ, আমার শরীর-রক্ষার জন্য এই যে খাদ্য সামগ্রী তুমি স্নেহের সহিত আমাকে দান করিলে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞমনে তোমার চরণে আমি প্রণাম করি।

পাপ হইতে পরিত্রাণ

হে পতিতপাবন, আমি কোন্ পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিব? যখন বলি, পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর, তখন একটি নহে, অসংখ্য এবং নানাবিধ পাপ স্মরণ হয়। তুমি সাক্ষী হইয়া দেখিতেছ, আমার মন প্রায় সকল প্রকার পাপে কলঙ্কিত। অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, কাম, ক্রোধ, কপটতা, সংসারাসক্তি, অবিশ্বাস, নিরাশা আমার অন্তরে এ সমুদায় পাপ গূঢ় ভাবে রহিয়াছে এবং সময়ে সময়ে জ্বলিয়া উঠে। এ মহাপাপীকে, হে পরিত্রাতা, এ সব দোষ হইতে তব কৃপাগুণে মুক্ত কর, আর জ্বালা সহ্য হয় না।

যথার্থ প্রার্থনা

এক এক বার মনে হয়, এত প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তাহার তাদৃশ ফল কেন হইল না। তোমার প্রসাদে, হে নাথ, এখন ইহার হেতু বুঝিয়াছি। আমি ভাল করিয়া তোমাকে ডাকি না, এই জন্যই তোমাকে পাই না। অতএব তোমার কাছে আমার এখন এই প্রার্থনা, হে দয়াময়, আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেও। কপট ভাষা উচ্চারণ হইতে নিবৃত্ত কর; শূন্যমনে আকাশের অর্চ্চনা করিতে আর দিও না। কি ভাবে কোন্ কথায় তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা বলিয়া দেও। আমি যেন ব্যাকুল অন্তরে যথার্থ পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তোমার চরণ বক্ষে ধরিয়া প্রার্থনা করিতে পারি। নাথ, তুমি আমার হৃদয়ের ধন হও।

বৈরাগ্য

ইহকালের সুখেই চিরদিন মত্ত রহিলাম। হে অনন্ত দেব, পরলোকের সম্বল যে কিছুই হইল না। মৃত্যুর পরে আমার গতি কি হইবে, ভাবিতে গেলে কেবলই অন্ধকার দেখি। আমি পথিক, কিছু দিনের জন্য এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি, আমার যথার্থ ঘর পরলোক। তবে কেন আমি এখানকার অকিঞ্চিৎকর সুখে মোহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি? হে ঈশ্বর, আমাকে প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা দেও এবং অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত কর।

মৃত্যুশয্যা

হে দেব, আমার ইহকালের দিন ফুরাইল। ক্রমে আমি দৃষ্টিহীন হইতেছি এবং আমার বাক্য রুদ্ধ হইতেছে। একে একে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু সকলে চক্ষের জলে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট বিদায় লইতেছেন, আমার ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই পড়িয়া রহিল। যে দেহের জন্য এত যত্ন করিলাম, সেও আমাকে ছাড়িতেছে। কোথায়, গতিনাথ, এক বার এই মৃত্যুশয্যায় অসহায় পাপী সন্তানকে দর্শন দেও। এখন বেশ বুঝিতেছি, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। হে মৃত্যুঞ্জয়, তোমার অভয় চরণে আশ্রয় দেও এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার অমৃতনিকেতনে লইয়া যাও।

আনন্দময় ঈশ্বর

হে আনন্দের উৎস, তোমার কাছে আসিয়া কত দুঃখের কথা বলিব, মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার মুখচন্দ্র দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। আর কিছু বলিবার, চাহিবার রহিল না। তোমার দর্শনে সকল সাধ মিটিল, সকল আশা পূর্ণ হইল। আজ বুঝিলাম, তুমি ভক্তদিগকে কেমন প্রমত্ত কর, আর তাঁহারাই বা কেন তোমার এত বশীভূত ও অনুরক্ত হন। হে হৃদয়রঞ্জন, আমি স্থিরনয়নে কেবলই তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, আর কিছু চাই না।

সামাজিক
উপাসনাপ্রণালী *

[একটি সঙ্গীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইবে।]

উদ্বোধন

যিনি আমাদিগের স্রষ্টা পিতা পরিত্রাতা, তাঁহার পূজা করিবার জন্য আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ, সাংসারিক চিন্তা ও কামনা পরিত্যাগ কর, মনকে প্রশান্ত কর, এবং পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হও। এ মন্দির তাঁহার গম্ভীর এবং পবিত্র আবির্ভাবে পরিপূর্ণ, বিশ্বাস ও ভক্তিনয়নে তাহা প্রত্যক্ষ কর। সেই অনন্ত দেব, সেই সত্য শিব সুন্দর পিতার চারিদিকে বসিয়া, আমরা সকলে বিনম্রভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করি, তাঁহাকে ধ্যান করি ও তাঁহার নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করুন।

[সঙ্গীত]

—*—

আরাধনা

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

* "সামাজিক ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা" (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮০৯ শকে প্রকাশিত) হইতে গৃহীত হইল।

তুমি সত্য, সর্ব্বস্থানে তোমার জীবন্ত গম্ভীর সত্তা। সমুদয় বিশ্বের আশ্রয়স্থান তুমি, চেতন ও অচেতন তাবৎ পদার্থের তুমি মূলাধার। তোমাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি। তোমা ছাড়া সকলই অসার ও মিথ্যা। হে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর! তুমি আমাদের জীবন।

তুমি জ্ঞান, তোমার অপার জ্ঞান জলে স্থলে আকাশে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। চারি দিকে কেমন সুন্দর কৌশল, কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম! তোমার অসংখ্য জ্ঞানচক্ষু আমাদের উপর স্থির রহিয়াছে এবং আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পাপ দেখিতেছে। তোমার ঐ দৃষ্টির আলোক আমরা কিছুতেই ঢাকিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অন্তর্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী।

তুমি অনন্ত, তোমার আরম্ভ নাই, তোমার শেষ নাই। কালে তুমি নিত্য, দেশে তুমি সর্ব্বব্যাপী; তোমার উচ্চতা ও গভীরতা কে পরিমাণ করিবে? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব তোমার পদতলে সর্ষপকণার ন্যায়। তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, তুমি চিন্তার অতীত। তুমি ভূমা মহান্, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম।

তুমি শিব, তুমি মঙ্গল। এই জগৎ সহস্র মুখে তোমার দয়ার পরিচয় দিতেছে। পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতেছ এবং অন্ন বস্ত্র ও জ্ঞান ধর্ম্ম দিয়া আমাদিগকে সুখী করিতেছ। যাহারা তোমাকে মানে না, তুমি তাহাদিগকেও স্নেহ কর। দুঃখী পাপীদের তুমিই সহায়। তুমি দয়াময়, সন্তানবৎসল ও প্রেমসিন্ধু।

তুমি অদ্বৈত, তোমার দ্বিতীয় নাই। একাকী তুমি সমুদায় রক্ষা ও শাসন করিতেছ। অসংখ্য জীবের, অগণ্য আত্মার তুমি একমাত্র আশ্রয়-দাতা। চারিদিকে কেবল তোমারই নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

তুমি সকলের রাজা, সকলের প্রভু, তুমি আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল ও আশা ভরসা।

তুমি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, তুমি নির্ম্মলস্বভাব। তোমার ইচ্ছাই পুণ্যের আদর্শ। এমনি তোমার পুণ্যের তেজ যে, ইহার একটি কিরণ পাইলে পাপ হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; তোমাকে একবার ভাবিলে জীবন পবিত্র হয়। হে ধর্ম্মরাজ, তোমার ভয়ে পাপ পলায়ন করে, তোমার ন্যায়বিচারে পাপী কখন প্রশ্রয় পায় না, তোমার শাসনে দুষ্ট দমন হয়। তুমি পুণ্যের সূর্য্য, তুমি ধর্ম্মের আবহ ও পাপীর পরিত্রাতা।

তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত, তুমি শান্তির আকর। তুমি দুঃখীকে সুখী কর, তুমি তাপিত প্রাণকে শীতল কর, তুমি অমৃত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা পরিহার কর। তোমাকে দেখিলে, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিলে, তোমার নিকটে বসিলে হৃদয় জুড়ায়। তুমি সুখসিন্ধু, হৃদয়রঞ্জন।

হে দেব, আমরা সকলে তোমার শরণাগত হই, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তোমার উপর নির্ভর করি। তুমি আমাদের স্তবনীয়, তুমিই আমাদের সম্ভজনীয়। জগদীশ, আমরা তোমার বন্দনা করি। হে দীন-হীনের বন্ধু, সকল পরিবারের পিতা, পাপীর পরিত্রাতা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

ধ্যান

যাঁহাকে আমরা সকলে আরাধনা করিলাম, তাঁহাকে প্রতিজনে গোপনে ধ্যান করি। এই দেহমন্দিরে হৃদয়মধ্যে সেই অন্তরাত্মা সর্ব্বদা অধিবাস করিতেছেন। তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও প্রাণের প্রাণ। তিনি চিরকাল আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে

রক্ষা করিবেন, তিনি আমাদের অনন্ত জীবন। এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, তাবৎ বাহ্যিক ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া, একাকী নিমীলিতনয়নে নির্জ্জন হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করি। তথাকার অন্ধকার ভেদ করিয়া, হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রেমাসনে প্রেমনাথকে দেখিয়া পবিত্র হই, এবং তাঁহার অনন্ত সহবাসের উপযুক্ত হই।

[সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে ধ্যান করিবেন, পরে দণ্ডায়মান হইয়া * সমস্বরে এই প্রার্থনা করিবেন।]

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আচার্য্যের প্রার্থনা †

হে বিশ্বরাজ, তোমার সিংহাসনতলে প্রণত হইয়া, আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। যে পবিত্র মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছ এবং যদ্দ্বারা আমাদিগকে কত সত্য, পবিত্রতা ও সুখরত্নের অধিকারী করিয়াছ, সেই ধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া সর্ব্বত্র

---

* ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবাদিতে ও সামাজিক উপাসনায় এই প্রথা।

† ব্রহ্মমন্দিরে এইরূপ জগতের জন্য প্রার্থনা করার প্রথা; কিন্তু পারিবারিক উপাসনায় এই সময়ে ব্যক্তিগত বিশেষ প্রার্থনা হয়।

প্রসারণ কর। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক জাতিমধ্যে তোমার পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার জ্যোতি জ্যোতিষ্মান্ হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হে দেব, তোমার সমস্ত মনুষ্যপরিবারকে যাবতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, মিথ্যাধর্ম্ম, পাপ ও অপবিত্রতা হইতে রক্ষা কর, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক, ও শান্তি বিতরণ কর। আমাদিগের পরিবার, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, এবং স্বজাতীয় বিজাতীয়, ইহলোকবাসী পরলোকবাসী সকল আত্মার উপরে তোমার প্রসাদ অবতীর্ণ হউক; যাঁহারা আমাদিগের প্রিয় ও যাঁহারা আমাদিগের অপ্রিয়, সকলকে তুমি দয়া কর। হে নাথ, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ও স্থায়ী বন্ধনে সকল পরিবারকে এক পরিবারে আবদ্ধ করিয়া, স্বর্গীয় প্রেমরাজ্য জগতে স্থাপন কর।

(ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্)

[সঙ্গীত]

[বিবিধ গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা। *]

* বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক-সকলের পাঠের সুবিধার জন্য, ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে "শ্লোকসংগ্রহ" নামক পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নূতন সপ্তম সংস্করণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্লোকপাঠের পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরে, পরিবারে ও সাময়িক অনুষ্ঠানাদিতে সর্ব্বত্র প্রাতঃকালের উপাসনায় "ব্রহ্মস্তোত্র" উচ্চারিত হয়। সায়ংকালের উপাসনায় "মাতৃস্তোত্র" উচ্চারিত হইতে পারে। আচার্য্যদেবের সময়ে প্রাতঃকালীন উপাসনায় "ব্রহ্মস্তোত্র" হইত। "ব্রহ্মস্তোত্র" ও "মাতৃস্তোত্র" পরে সন্নিবিষ্ট হইল। শ্লোকপাঠের পর

শান্তিবাচন

যে দয়াময় ঈশ্বর এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের উপাসনা শ্রবণ করিলেন, তিনি উহা সফল করুন, এবং অদ্যকার বিশেষ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তিনি মন্দিরের উপাসকদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের পথে রক্ষা করুন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য শান্তি বিধান করুন।

প্রণাম

হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে তোমার চরণতলে আশ্রয় দাও। আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া, শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তোমার মুক্তিপ্রদ চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

(সর্ব্বশেষে একটী সঙ্গীত হইতে পারে)

উপদেশ হইলে, উপদেশানুযায়ী প্রার্থনা, নচেৎ বিশেষ প্রার্থনা হইয়া সঙ্গীতানন্তর শান্তিবাচন হয়। আজকাল অধিকাংশ স্থলে উপাসনায়, নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মতাসাধন এবং প্রকৃত নববিধানতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, শ্লোকপাঠের পর বা উপদেশের পর আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত প্রার্থনা পঠিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মস্তোত্রম্

—: * :-

নমোঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয় ।
অন্তর্য্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষয়ায় তে ॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিলকারণ ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধোঽধমতারণ ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে ।
করুণানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন ॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময় ।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে * নমঃ ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে ।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমো নমঃ
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ ॥
নমস্তুভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন ।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন ॥

* স-নি-প—চিরসখায় তে ।

নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে॥
নমঃ প্রস্রবণ প্রীতের্নমঃ পতিতপাবন।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণ প্রাণধনায় চ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন।
ভূমন্ ভবাব্ধিকাণ্ডারিন্ * ভবভীতিহরায় চ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশতে॥
নমঃ সদ্গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ।
সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বমূলাধারায়াস্তু নমো নমঃ॥
নমোঽস্তু সর্ব্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্ব্বসাক্ষিণে।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখস্নেহময়ায় চ॥
নমঃ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমো নমঃ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্ব্বোত্তমায় চ॥

* কাণ্ডারঃ—কেনিপাতঃ।

হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমো নমঃ।
নামান্যেতানি গৃহ্ণন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥
(নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ *)

ইত্যষ্টোত্তরশতনাম্না ব্রহ্মস্তোত্রং †
সমাপ্তম্।

* ব্রহ্মস্তোত্রের শেষে প্রার্থনা আছে ; স্তোত্রের শেষে প্রার্থনা সমীচীন, না, নাম ক'রে প্রণামই বিধেয় ? শুনিয়াছি, এ বিষয়ে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তিনি বলেন, "নামান্যেতানি গৃহ্ণন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর" এই শেষ শ্লোকার্দ্ধের স্থলে "নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য প্রণমামি পুনঃ পুনঃ" এই শ্লোকার্দ্ধও হইতে পারে। কিন্তু এই শ্লোকার্দ্ধের পাঠ প্রচলিত হয় নাই। তবে যে কেহ, ইচ্ছা করিলে, পাঠ করিতে পারেন।

† ব্রহ্মের অষ্টোত্তরশতনাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশমত ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব কর্ত্তৃক, ১৭৯৭ শকের ৭ই ভাদ্র, ভাদ্রোৎসবে (২২শে আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃঃ)—"বল বল, বল আনন্দে সবে। জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত অক্ষয়।" ইত্যাদি—সঙ্গীতাকারে পরিণত হয় এবং এই সময়েই এই নামমালা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক সংস্কৃতে ব্রহ্ম-স্তোত্ররূপে নিবদ্ধ হয়।

মাতৃস্তোত্রম্

—: * :—

জয় দেবি পরারাধ্যে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি।
জগদ্ধাত্রি মহাবিদ্যে মাতঃ সর্ব্বার্থসাধিকে ॥
ভবভারহরে সর্ব্বমঙ্গলে জগদীশ্বরি।
বিমূঢ়মতিজীবানাং পাপসঙ্কটবারিণি ॥
বরদে শুভদে লোকপ্রসূতে জীবিতেশ্বরি।
মানবানাঞ্চ দেবানাং চিরকল্যাণদায়িকে ॥
প্রসন্নবদনে বিশ্বজনয়িত্রি দয়াময়ি।
বিচিত্রগুণসম্পন্নে শিবে সন্তানবৎসলে ॥
নমো বিশ্বম্ভরে দেবি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারকারিণি
চৈতন্যময়ি বিশ্বাদ্যে মহেশি জগদাম্বিকে ॥
বহুরূপা নিরাকারা ত্বং হি ভুবনমোহিনি।
ভক্তমনোরমে যোগিমহাজনসুদুর্ল্লভে ॥
বিজ্ঞানঘনরূপা ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণি।
বাগীশ্বরি নমস্তুভ্যং জ্ঞানদে বদতাংবরে ॥

পরেশি পরমপ্রজ্ঞে শুভবুদ্ধিপ্রণোদিনি।
সুখদে মোক্ষদে প্রাণধনদাত্রি পরাৎপরে॥
রাজরাজেশ্বরি ত্বং হি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী।
গৃহাশ্রমেষু বিত্তেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতে॥
চরণাশ্রিতভৃত্যানাং ত্বং নিত্যসুখবর্দ্ধিনী।
নির্ব্বান্ধববিপন্নেষু বরাভয়প্রদায়িকে॥
বিশালভবদুস্তারে জননীনামসম্বলম্।
ঘোরমোহান্ধকারেষু দিব্যজ্যোতির্ব্বিকাশিনি।
পাপাভিহতভূতানাং ত্বং ত্রিতাপহরা শুভে।
ভগবত্যৈ নমস্তুভ্যং দূরাদ্দূরনিবাসিনি॥
নিশ্বাসে শোণিতাধারে প্রাণরূপেণ সংস্থিতে।
সর্ব্বব্যাপিনি কল্যাণি চিদ্‌ঘনস্বরূপে সতি॥
অতুল্যগুণশালিন্যৈ নমস্তে কলুষান্তিকে।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রি সর্ব্বজ্ঞে ত্বং সর্ব্বসাক্ষিরূপিণী॥
স্থাবরে জঙ্গমে নিত্যং শক্তিরূপেণ সংস্থিতে।
নিখিলপ্রাণিনাং পুংসাং ধনধান্যবিধায়িনি॥
নমস্তেঽখিলধারিণ্যৈ দিব্যরূপে বরাননে।
মুমুক্ষুসাধকানাঞ্চ তপঃসিদ্ধিপ্রদায়িকে॥
আনন্দময়ি মাতস্ত্বং ভক্তচিত্তবিহারিণী।
শোকদুঃখাপহারিণ্যৈ নমো ব্রহ্মসনাতনি॥

রুদ্রমূর্ত্তে মহাশক্তে দুর্ম্মদাসুরনাশিকে।
ভগ্নহৃদয়মর্ত্ত্যানাং ত্বং হি পতিতপাবনী॥
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপেণ সর্ব্বভূতে বিরাজিতে।
অনাদ্যে অম্বিকে অম্বে মাতর্লজ্জাস্বরূপিণি॥
জীবন্মুক্তস্য সিদ্ধস্য নিত্যানন্দপ্রবর্দ্ধিকে।
অন্তর্য্যামিণি যোগেশি ক্ষেমঙ্করি কৃপাময়ি॥
নমস্তেঽনন্তরূপিণ্যৈ অভয়ে ভুবনেশ্বরি।
অদ্বিতীয়ে দুরারাধ্যে পাষণ্ডদণ্ডকারিকে॥
দিব্যাঙ্গি দিব্যলাবণ্যে স্বরূপে চিত্তমোদিনি।
চিদাকাশস্বরূপা ত্বং সাধুহৃদয়রঞ্জিকে॥
জরামরণসংহর্ত্রি শঙ্করি প্রকৃতেঃ পরে।
তেজোময়ি পবিত্রাক্ষি নিষ্কলঙ্কস্বরূপিণি॥
অন্নদে পুণ্যদে মাতর্যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তিকে।
বেদাগমেষু তন্ত্রেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতে॥
বিশ্বস্তশুদ্ধচিত্তানাং বিপদ্ভীতিবিনাশিনি।
চিন্ময়ি প্রতিভাদাত্রি অমৃতানন্দভাষিণি॥
ত্বং হি জ্ঞানং বলং পুণ্যং শান্তিঃ সৌভাগ্যদায়িকে।
ত্বং হি মম ধনং প্রাণাস্ত্বং হি সর্ব্বস্বরূপিণী॥
নমস্তে জগত্তারিণ্যৈ ত্রাণকর্ত্রি সুরেশ্বরি।
ত্বং হি বেদো বিধিস্তন্ত্রং মন্ত্রো ভজনসাধনম্॥

ত্বন্নামস্মরণৈর্গানৈর্জীবন্মুক্তির্হি লভ্যতে।
বিতরাকিঞ্চনে দীনে মাতস্তে করুণাকণাম্॥
দেহি পদসরোজং মে নরামরনিষেবিতম্।
তব পাদারবিন্দেষু প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

ইতি শ্রীবিধানভারতে দ্বিতীয়োল্লাসে
মাতৃস্তোত্রং * সমাপ্তম্।

* ১৮৮০ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী "নববিধান" ঘোষিত হয়। এই বৎসরের আগষ্ট মাসে (১৮০২ শকের ভাদ্রোৎসবে), সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) কর্ত্তৃক বিরচিত "বিধানভারত" প্রথম উল্লাস প্রকাশিত হয়। পর বৎসর ১৮৮১ খৃঃ ১৩ই জানুয়ারী (১৮০২ শকের ১লা মাঘ) তদ্‌রচিত "জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, নিখিল জগতপ্রসবিনী" ইত্যাদি—মাতৃজয়গানে আরতি হইয়া ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হয়। এই বৎসরের জুলাই মাসে (১৮০৩ শকের ২০শে আষাঢ়) "বিধানভারত" দ্বিতীয় উল্লাস প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের "ইষ্টপূজা" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মাতৃস্তোত্র আছে। মাতৃস্তোত্রটী আরতির সঙ্গীতের অনুরূপ।

সম্পূর্ণ

শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

(ইংরাজী গ্রন্থাবলী)

True Faith	0	4	0
Essays—Theological and Ethical ...	1	0	0
Discourses and Writings	0	8	0
Lectures in India, Vol. I & II	6	0	0
Keshub Chunder Sen in England (Being Diary, Sermons, Lectures, Epistles in England)	3	0	0
The Book of Pilgrimages (Being Keshub's Diaries and Reports of Expeditions) ...	1	8	0
The New Dispensation, Vol. I & II ...	3	0	0
Prayers, Vol. I & II (out of print)			
Yoga—Objective and Subjective ...	0	4	0
The New Samhita	0	4	0
Jivan Veda (or translations from his Spiritual Autobiography)	0	8	0